বাংলাদেশ
এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা

চতুর্থ খণ্ড
পৌষ ১৩৯৩
ডিসেম্বর ১৯৮৬

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ
৫, ওল্ড সেক্রেটারিয়েট রোড (নিমতলী)
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

সম্পাদকীয় পর্ষৎ

১৩৯৩/১৯৮৬

সভাপতি : অধ্যাপক আবদুল মমিন চৌধুরী
সদস্য : অধ্যাপক আনিসুজ্জামান
অধ্যাপক সালার খান
অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ
অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম
অধ্যাপক সামছুল হুদা হারুণ
অধ্যাপক আজিজুল হক
অধ্যাপক এম. এম. ইসলাম

সম্পাদক

আনিসুজ্জামান

মূল্য : প্রতি কপি ২৫.০০ টাকা মাত্র

প্রকাশক : সাধারণ সম্পাদক,
এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ
ঢাকা

মুদ্রক : ওয়ার্ল্ড ইউনিভারসিটি সার্ভিস প্রেস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
নীলক্ষেত, ঢাকা।
ফোন : ৫০৯৫৩৭

www.pathagar.com

কাউন্সিল

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৮৬ ও ১৯৮৭

সভাপতি	: জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া
সহ-সভাপতি	: অধ্যাপক এ. কে. এম. নূরুল ইসলাম
	অধ্যাপক আবদুল মমিন চৌধুরী
	অধ্যাপক সফিউদ্দিন জোয়ারদার
	(১২ই নভেম্বর ১৯৮৬ তারিখে লোকান্তরিত)
	অধ্যাপক ওয়াদুদুর রহমান
	(৩০শে নভেম্বর ১৯৮৬ তারিখ থেকে)
কোষাধ্যক্ষ	: অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ
সাধারণ সম্পাদক	: অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম সম্পাদক	: অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

সদস্য	: জনাব মুস্তাফিজুর রহমান খান
	অধ্যাপক সালার খান
	অধ্যাপক আনিসুজ্জামান
	অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ
	অধ্যাপক সামছুল হুদা হারুণ
	অধ্যাপক আজিজুল হক
	অধ্যাপক এম. এম. ইসলাম
	অধ্যাপক পারেশ ইসলাম সৈয়দ মুস্তাফিজুর রহমান
	ডক্টর হাসনা বেগম
	ডক্টর শিরীন আখতার
	প্রফেসর সিরাজুল হক (ফেলো)
	প্রফেসর মফিজুল্লাহ কবীর
	(৮ই আগস্ট ১৯৮৬ তারিখে লোকান্তরিত)

www.pathagar.com

বৎসরে একবার পৌষ মাসে **বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা** প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য 'এশিয়ার মানুষ ও প্রকৃতি'—এ পরিধির ভেতর মৌল গবেষণামূলক প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি টাইপ করে দুই কপি পাঠাতে হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

সম্পাদক,

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

৫, ওল্ড সেক্রেটারিয়েট রোড, ঢাকা-১০০০, টেলিফোন ঃ ২৩৯৩৯০।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

আবদুল্লাহ্ আল-মুতী	:	প্রযুক্তি ও তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন	১
নজরুল ইসলাম	:	ভারতে কৌম থেকে আঞ্চলিক সমাজ-গঠনের প্রক্রিয়া-প্রসঙ্গে	১৩
আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া	:	বিলুপ্ত নগর বর্ধনকোট ও মোহাম্মদ বখতিয়ারের তিব্বত-অভিযান	৪৩
আবদুল মমিন চৌধুরী	:	বাংলায় ইসলাম-বিস্তারের পটভূমি	৫৮
ওয়াকিল আহমদ	:	আলাওলের আত্মকথা : দেশ ও কাল	৬৮
আবু তাহের মজুমদার	:	জোনসের ফারসী ভাষার ব্যাকরণের পরিমার্জনা ও মীর্জা শেখ ইতেশামুদ্দীন	৮৬
শওকত আরা হোসেন	:	খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন এবং বাংলার রাজনীতি	১০১
কেই শিরাই	:	জাপানী ভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য	১১৩
গ্রন্থ-সমালোচনা			
মুহাম্মদ আবদুল বাকী	:	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, 'বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ'	১২৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রযুক্তি ও তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন

আবদুল্লাহ্ আল্-মুতী*

আজ থেকে চার দশকের বেশি আগে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপুল ধ্বংসস্তূপের ওপর যখন জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীর মানুষ আর এক নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছে। সে স্বপ্ন ক্ষুধা আর ধ্বংসের বিভীষিকা থেকে মুক্তির, শান্তি আর নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার, পৃথিবী জুড়ে সকল মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের স্বপ্ন।

এই স্বপ্ন আজো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। অবশ্য সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে—তা অস্বীকার করার উপায় নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সারা পৃথিবীতে উপনিবেশবাদের বজ্রমুঠি শিথিল হয়ে এসেছে। অসংখ্য নবাস্বাধীন দেশের উদ্ভব ঘটার ফলে জাতিসংঘের সদস্য-সংখ্যা গত চার দশকে তিন গুণের বেশি হয়েছে। এসব নবাস্বাধীন দেশগুলিতে গত তিন-চার দশকে শিশুমৃত্যুর হার কমেছে, গড়পড়তা আয়ু, সাক্ষরতা, মাথাপিছু আয়, শিল্প উৎপাদন প্রভৃতি সূচক বেড়েছে।

এই অগ্রগতি তথাকথিত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বা 'তৃতীয় বিশ্বে' সমাজের কোন কোন অংশে স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হলেও এসব দেশের সব মানুষ অনাহার, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাৎপদতা থেকে আজো মুক্তি পায়নি। বরং উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে জীবনমানের পার্থক্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, আশির দশকে যদি ব্যাপক অর্থনৈতিক বিকাশ সম্ভব হয় তাহলেও এই দশকের শেষে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গড় মাথাপিছু আয় দাঁড়াবে শিল্পোন্নত দেশগুলির মাত্র বারো ভাগের এক ভাগ, সবচেয়ে কম উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে এই হার দাঁড়াবে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। এখানে উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘের মাপকাঠিতে সবচেয়ে কম উন্নত ৩৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশও পড়ে।

জাতিসংঘের জনকরা এক ঐক্যবদ্ধ বিশ্বের স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু পৃথিবীর ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে ব্যবধান আজো দুস্তর হয়ে রয়েছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত দেশগুলির মধ্যেই রয়েছে দুটি বিশ্ব ঃ উন্নত ধনবাদী দেশগুলি রয়েছে এক বিশ্বে; সমাজতন্ত্রী দেশগুলি অন্য বিশ্বে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ দেশগুলিকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে আরেক তৃতীয় বিশ্ব। উন্নত দেশগুলির জনসংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার মাত্র ২০ শতাংশ, কিন্তু তারা নিয়ন্ত্রণ করে সমগ্র পৃথিবীর প্রায় ৮০ শতাংশ

---

*আবদুল্লাহ্ আল্-মুতী, অবসরপ্রাপ্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার এবং সভাপতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির FINAS Foundation বক্তৃতা, ১৯৮৬।

www.pathagar.com

সম্পদ। তৃতীয় বিশ্বে বাস করে পৃথিবীর ৮০ শতাংশ মানুষ, কিন্তু তাদের আয়ত্তে মাত্র পৃথিবীর ২০ শতাংশ সম্পদ।

উন্নত বিশ্ব ও তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের (এবং তার অন্তর্ভুক্ত উপরিউক্ত সবচেয়ে কম উন্নত দেশগুলির) মধ্যে এই পার্থক্য অতি সাম্প্রতিক। মাত্র গত দু-তিন শতকের ব্যবধানে এই বিপুল পার্থক্য কি করে সৃষ্টি হয়েছে, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার নানা ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। বিভিন্ন দেশের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ, অতীত ইতিহাস, উপনিবেশবাদের প্রভাব প্রভৃতি নানা কারণ এর পেছনে দেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু আজকের দিনে এই বৈষম্যসৃষ্টির একটি কারণের কথা ক্রমাগতই বেশি করে উল্লেখ করা হচ্ছে—সে হল প্রযুক্তি। এই কারণটি আগামী দিনে মনে হয় ক্রমেই আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। পাশ্চাত্ত্যের দেশগুলি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছে প্রধানতঃ উৎপাদন-পদ্ধতিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে। উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও অনেকাংশে প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের মধ্য দিয়েই আসতে পারে।

মানুষের সভ্যতার বিকাশে প্রযুক্তি চিরকালই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সে প্রযুক্তি অতি প্রাচীন সমাজে শিকার বা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আগুনের প্রয়োগ হোক, কৃষি ও পশুপালনের প্রযুক্তি হোক, যাতায়াতের জন্য চাকা বা পালের উদ্ভাবন হোক অথবা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে বাষ্পীয় ইঞ্জিন বা কম্পিউটার প্রযুক্তির উদ্ভাবন হোক। এই প্রযুক্তি-বিকাশের ধারা সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়েছে। ইউরোপে রেনেসাঁসের মাধ্যমে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে উদ্ভাবন ও অন্বেষার বিকাশ ঘটে তার ফলে সতের-আঠার শতকের দিকে তত্ত্বীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে এক মেলবন্ধন সৃষ্টি হতে থাকে। তার মাধ্যমে প্রযুক্তি বিকাশের ধারা আরো ত্বরান্বিত হয়েছে—দেখা দিয়েছে শিল্প-বিপ্লব। উন্নত দেশগুলি নিজেদের দেশের এবং অনেক ক্ষেত্রে উপনিবেশ থেকে সংগৃহীত প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে এই প্রযুক্তির যোগ ঘটিয়েছে। আর সেজন্যই তাদের উৎপাদন-শক্তি দ্রুত বিকাশলাভ করেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ঔপনিবেশিক শাসনের কালে সরাসরিভাবে এবং পরবর্তীকালে পরোক্ষ-ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ হারিয়েছে, তার চেয়েও বড় লোকসান তাদের ঘটেছে বিশ্বের প্রযুক্তি বিকাশের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায়। একারণে তারা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত পিছিয়ে পড়েছে; এবং আজ উন্নত দেশগুলির সঙ্গে সমকক্ষতা অর্জন তাদের পক্ষে ক্রমাগতই কঠিন হয়ে উঠছে।

প্রযুক্তি ও উন্নয়ন

আজ এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, প্রযুক্তি আমাদের জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আছে। ঘরের সুনিপুণ রান্নার শৈলী, কলের বা টিউবওয়েলের পানি যেমন প্রযুক্তির অবদান, তেমনি নতুন জাতের ধান ও গম, টেলিভিশনের ছবি, ডিজিটাল ঘড়ি বা অতি আধুনিক শল্যচিকিৎসাও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফল। প্রযুক্তি আমাদের সমগ্র জীবনে এমন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করার ফলে প্রযুক্তিকে বিভিন্ন জনে বিভিন্নভাবে দেখে থাকেন।

www.pathagar.com

সচরাচর প্রযুক্তি বলতে আমাদের চোখের সামনে কিছু যন্ত্রপাতি, জটিল কল কারখানার ছবি ভেসে ওঠে। কিন্তু প্রযুক্তি যেমন যন্ত্রপাতি, তেমনি উৎপাদনের পদ্ধতি ও কলাকৌশল, অর্থাৎ প্রযুক্তি যেমন হয় বস্তুগত, তেমনি হতে পারে বুদ্ধিগত—ব্যক্তির জ্ঞান ও কুশলতায় নিবদ্ধ।

প্রযুক্তির ধরন যাই হোক, তা সর্বত্রই মানুষের মেধা ও শ্রমের ফসল। এই সৃষ্টির লক্ষ্য হল মানুষের কর্মকুশলতা-বৃদ্ধি। সে কর্মকুশলতা প্রযুক্ত হতে পারে কোন প্রাকৃতিক বস্তুকে প্রয়োজনীয় পণ্যে রূপান্তরিত করতে, পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায়, অধিক সম্পদ সৃষ্টিতে অথবা সামাজিক রূপান্তর সাধনে। যেহেতু প্রযুক্তি মাত্রেরই উপযোগ্য মূল্য রয়েছে, অর্থাৎ তাকে কোন কাজে প্রয়োগ করা যায়, তাই সচরাচর সব প্রযুক্তিরই কম-বেশি পরিমাণে বস্তুগত ও অবস্তুগত দুটি দিকই রয়েছে। বস্তুপ্রধান প্রযুক্তির মধ্যে যেমন পড়ে পণ্যদ্রব্য (যথা হাড়ি-পাতিল বা হাতঘড়ি), তেমনি পড়ে এসবের উৎপাদনযন্ত্র (যথা কুমোরের চাক বা ঘড়িনির্মাতার যন্ত্রপাতি)।

উৎপাদনের সঙ্গে প্রযুক্তির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী, কাজেই প্রযুক্তির অগ্রগতি ছাড়া কোন দেশের বা জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অগ্রগতির কথা চিন্তা করা যায় না। এমনকি মানুষের সমগ্র সভ্যতা-বিকাশের ইতিহাসকে প্রযুক্তি-বিকাশের প্রত্যক্ষ ফল বললেও অত্যুক্তি হয় না। আগেই বলা হয়েছে, প্রযুক্তি শুধু যন্ত্রপাতি নয়, সেসব যন্ত্রপাতি প্রয়োগের কলাকৌশলও, আর প্রয়োগের কলাকৌশল ছাড়া যন্ত্রপাতি অকর্মণ্য। শুধু তাই নয়, প্রযুক্তি গড়ে ওঠে একটি সামাজিক পরিমণ্ডলে, সমাজেরই প্রয়োজনে। এই প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে মানুষ যেমন তার উৎপাদন-পদ্ধতির বিকাশ ঘটায়, তেমনি সেই উৎপাদন-পদ্ধতিও মানুষকে, সমাজকে, কিছুটা পরিমাণে বদলে দেয়।

প্রাচীনকালে মানুষ ক্রমে ক্রমে তার নানা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নানা প্রযুক্তির উদ্ভাবন করছিল। পাথরের হাতিয়ার থেকে মানুষের উত্তরণ ঘটে ধাতুর হাতিয়ারে, কিন্তু এই পরিবর্তন ঘটতে লেগেছে বহু হাজার বছর। তার প্রধান কারণ সে সময়ে মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল সীমাবদ্ধ। চারপাশের প্রকৃতির নিয়মকানুন সম্বন্ধে মানুষ জানত সামান্য। অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ প্রযুক্তি আয়ত্ত করত তার পেছনের বৈজ্ঞানিক নিয়মকানুন না জেনেই—শুধু যুগ যুগ ব্যাপী অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে। মানুষের জ্ঞানের বিকাশের ফলে বস্তুর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সহজ হয়ে ওঠে। ১৬-১৭ শতকে ইউরোপে যে বিজ্ঞান-বিপ্লব ঘটেছিল তার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে দেখা দেয় ১৮-১৯ শতকের শিল্প-বিপ্লব। নানা নতুন নতুন বস্তু ও নতুন নতুন শক্তির উৎস মানুষ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ করতে শুরু করে। তার ফলে উৎপাদন-পদ্ধতির বিপুল বিকাশ ঘটে। আবার এই উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশ নতুন নতুন যন্ত্রপাতি নির্মাণে সহায়তা করে প্রযুক্তির বিকাশেও প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে।

এসব পরিবর্তনের একটি ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ্মবিকাশের ব্যাপক প্রভাব পড়তে আরম্ভ করেছে সমগ্র সমাজের ওপর। বরং বলা চলে উন্নত বা অনুন্নত কোন দেশই এবং কোন দেশের জনসমাজই আজ আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই বিপুল প্রভাবের বাইরে থাকতে পারবে না। বলা বাহুল্য এই প্রভাবের যেমন ভাল দিক আছে তেমনি অনেক মন্দ দিকও আছে। সবুজ বিপ্লব নতুন নতুন উচ্চফলনশীল বীজ

www.pathagar.com

সৃষ্টি করে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়িয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে অনেক প্রান্তিক ক্ষুদ্র চাষীকে ভূমিহীনে পরিণত করেছে। নতুন নতুন কীটনাশক যেমন ফসলের অনেক অনিষ্টকারী কীট ধ্বংস করেছে, তেমনি নতুন নতুন জাতের অনিষ্টকর কীটের উদ্ভবও ঘটিয়েছে।

কিন্তু এসব ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়ে অবহিত থেকেও আজকের দিনে কোন দেশের পক্ষে প্রযুক্তিবিমুখ হয়ে উন্নয়নের কথা চিন্তা করা যায় না। উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন বর্ধিত বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক সম্পদ। সব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সমান নয়, নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদ বেশি না হলেও কোন কোন দেশ উন্নত উৎপাদন পদ্ধতির মাধ্যমে সে দুর্বলতা পুষিয়ে নিয়েছে। কিন্তু ক্রমাগত পৃথিবীর লোক সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আজ বোঝা যাচ্ছে আসলে সমগ্র পৃথিবীরই বস্তুসম্পদ সীমাবদ্ধ। আর তাই আগামী দিনে সমগ্র পৃথিবীর জন্যই প্রযুক্তির উন্নয়ন হবে একান্ত জরুরী। উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে উন্নত প্রযুক্তি আয়ত্ত করা ছাড়া উৎপাদনশীলতা-বৃদ্ধি হবে দুঃসাধ্য।

সাম্প্রতিক কালে যেসব দেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে, তারা প্রধানত প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মাধ্যমেই এই সাফল্য অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও ভারতের দৃষ্টান্ত সচরাচর উল্লেখ করা হয়ে থাকে। অনেকের ধারণা এসব দেশ শুধু উন্নত পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে প্রযুক্তি ধার করে তাদের দেশের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সাধারণভাবে প্রযুক্তি-হস্তান্তরের পদ্ধতি মোটেই এমন সরল নয়, রীতিমতো জটিল। বর্তমান কালে কোন দেশই নিজেদের লভ্য আধুনিক প্রযুক্তি সহজে হস্তান্তর করতে আগ্রহী নয়। তাছাড়া কোন দেশই বিশেষ করে বর্তমান বিজ্ঞাননির্ভর প্রযুক্তির যুগে বিজ্ঞানশিক্ষার যথোপযুক্ত পটভূমি ছাড়া সহজে নতুন প্রযুক্তি আত্মস্থ করতে পারে না। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত—এসব দেশও সাধারণ শিক্ষার ব্যাপক প্রসার এবং সুসংগঠিত গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যবস্থার ভিতের ওপরই প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অগ্রগতি লাভ করেছে।

তাছাড়া কোন এক দেশের পরিমণ্ডলে উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তি প্রায়শঃই অন্য দেশে হুবহু প্রয়োগ করা শক্ত হয়, তাকে গ্রহণকারী দেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। এজন্য আজকাল 'প্রযুক্তি হস্তান্তর' ও 'যথোপযুক্ত প্রযুক্তির' সমস্যা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে সনাতন ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিজস্ব প্রযুক্তি-উদ্ভাবনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

তৃতীয় বিশ্বের প্রযুক্তিগত দুর্বলতা

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' থেকে মুক্তিলাভের সমস্যা আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের অন্যতম প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানের জন্য দীর্ঘকাল ধরে উত্তর-দক্ষিণ আলোচনা চলছে, ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা-সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, ১৯৮১ সালে গৃহীত হয়েছে 'সবচেয়ে কম উন্নত দেশগুলির বাস্তব নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী'। কিন্তু এসব সত্ত্বেও পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি ঘটেছে বলে মনে হয় না।

www.pathagar.com

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিপুল বিকাশের ফল এযাবৎ প্রধানতঃ উন্নয়নশীল দেশগুলোই ভোগ করেছে। ইউরোপে বিজ্ঞান-বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লব, ঔপনিবেশিক শোষণ, প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলাফলকে পেটেন্ট প্রভৃতি পদ্ধতিতে গোপনীয়তার আড়ালে কুক্ষিগত করে রাখা এ ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি—যারা দীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে নানা ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ হয়ে রয়েছে—রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করার পরও চিরকালের জন্য অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ এবং উন্নত দেশগুলির ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকবে একথা মেনে নেওয়া যায় না।

উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে একটি মূল ভূমিকা পালন করেছে বড় শিল্প-কারখানায় বড় আকারের উৎপাদন এবং সেজন্য আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ। বড় শিল্পকারখানা স্থাপন করতে বিপুল মূলধনের প্রয়োজন। তাছাড়া এসব দেশকে নতুন নতুন বাজার খুঁজে বের করার জন্যও যথেষ্ট গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হচ্ছে। কিন্তু উন্নয়নের এই মডেল উন্নত দেশগুলোর জন্য কার্যকর হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোর পক্ষে সকল ক্ষেত্রে এই একই পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়া অবাস্তব হবে।

জাতিসংঘের তথ্য-অনুযায়ী ১৯৮০ সালে উন্নত পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির মাথাপিছু গড় আয় ছিল ৯,৬৭৫ ডলার, পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে ৪,৫০৩ ডলার, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ৯৮২ ডলার এবং সবচেয়ে কম উন্নত দেশগুলিতে ২২২ ডলার। এই হিসেব-অনুযায়ী উন্নত পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির গড় মাথাপিছু আয় ছিল উন্নয়নশীল দেশগুলির গড় আয়ের প্রায় ১০ গুণ, এবং সবচেয়ে কম উন্নত দেশগুলির গড় আয়ের প্রায় ৪৪ গুণ। কিন্তু এর চেয়েও হতাশাব্যঞ্জক তথ্য দেওয়া হয়েছে বিশ্ব ব্যাঙ্কের 'বার্ষিক উন্নয়ন প্রতিবেদন ১৯৮৫'তে। এতে বলা হয়েছে আফ্রিকার অধিকাংশ দেশে আজও মাথাপিছু প্রকৃত আয় রয়েছে ১৯৭০ সালের মানে, ১৯৭০ আর ১৯৮৪ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলির বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ চারগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮,৬০০ কোটি ডলার (বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক এক হিসেব-অনুযায়ী ১৯৮৬ সালের শেষে এই অঙ্ক দাঁড়াবে অন্তত একলক্ষ কোটি ডলারে)। এসব দেশের ঋণের পরিমাণ মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ৩৪ শতাংশ এবং ১৯৮২ সালে এসব দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ২০ শতাংশ ব্যয় হয়েছে শুধু বৈদেশিক ঋণ-পরিশোধে।

এই ব্যাপক দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র পথ হল আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিকে আত্মস্থ করে নিজস্ব উন্নয়নের পথ তৈরি করা। বলা বাহুল্য এ কাজটি মোটেই সহজ নয়। এ বিষয়ে নানা আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগে নানা প্রস্তাব প্রণীত হচ্ছে। এসব প্রস্তাব ও সুপারিশ যে তৃতীয় সব দেশের জন্য হুবহু একই ভাবে প্রযোজ্য বা কার্যকর হবে তাও বলা যায় না।

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় উন্নয়নশীল দেশের সংখ্যা আজ একশ'র ওপরে। এই দেশগুলির প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব ইতিহাস, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি ও জীবনপদ্ধতি। প্রত্যেক দেশের শিল্প ও কৃষি-ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তির চরিত্রও বিভিন্ন। তবে সব দেশের ক্ষেত্রেই দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতা একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তার সঙ্গে রয়েছে মূলধন ও প্রযুক্তির দুর্বলতা, সনাতন কৃষি-ব্যবস্থা, সেকেলে উৎপাদন-পদ্ধতি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হার।

www.pathagar.com

এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উচ্চমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অস্তিত্বই শুধু এসব দেশের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নয়। বর্তমান বিশ্বের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগাবার উপযোগী সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলাও এসব দেশের জন্য জরুরী। তাছাড়া উন্নত দেশগুলি যে সকল ক্ষেত্রে সেচ্ছায় নিঃস্বার্থভাবে তাদের প্রযুক্তি দিয়ে সহায়তার হাত প্রসারিত করবে এমন মনে করাও হবে নির্বুদ্ধিতা।

তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশ কেবল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। অর্থাৎ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাথে এসব দেশের যে স্বল্প কালের সংযোগ ঘটেছে তার মধ্যে তারা এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা গড়ে তুলতে পারেনি। আজকের এই প্রযুক্তিগত মান অর্জন করতে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির ক্ষেত্রে লেগেছে তিনশ বছরের ওপরে এবং জাপানের ক্ষেত্রে মেইজি পুনর্জাগরণের পর একশ বছরের ওপরে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা-চর্চার বিশিষ্ট ঐতিহ্য গড়ে না ওঠা উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ক্ষেত্রে আজ একটি প্রধান বাধা বলে গণ্য হতে পারে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির অভাবও মূলত ঐতিহ্যের অভাবের ফল বলা যায়। বিদেশে যাদের উচ্চশিক্ষা প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয় দেশে যথেষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে না ওঠায় তাদেরও অনেকে শেষ পর্যন্ত দেশ ত্যাগ করে। দক্ষ জনশক্তিসৃষ্টি এবং সে জনশক্তিকে দেশে ধরে রাখার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিচর্চার পরিবেশ সৃষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণতঃ দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ উন্নয়নশীল দেশে জাতীয় নেতৃবৃন্দ নানা সমস্যা নিয়ে এত বিব্রত থাকেন যে, দেশের অগ্রগতির জন্য সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতা করা তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। বিনিয়োগের উপযোগী পুঁজির ঘাটতি থাকায় উন্নয়নক্ষেত্রে বরং স্বল্পকালে ফল পাওয়া যাবে এ ধরনের প্রকল্পগুলোই প্রাধান্য পেতে থাকে। তাই শিল্পোন্নত দেশে যেখানে সচরাচর মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৩ ভাগ বা তার বেশি গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়, উন্নয়নশীল দেশে সেখানে এক্ষেত্রে ব্যয় হয় জাতীয় আয়ের ০·৫ ভাগ বা তারও কম।

এই দুর্বলতা যে শুধু গবেষণা-ব্যবস্থায় অর্থবিনিয়োগে, তা নয়; একই ধরনের দুর্বলতা দেখা যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাব্যবস্থায়, জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসংক্রান্ত জ্ঞানবিস্তারে, গবেষণা ও শিল্পের মধ্যে সংযোগে এবং শিল্পের ব্যবস্থাপনাতেও। সনাতন আমলাতান্ত্রিক স্থবিরতা ঝেড়ে ফেলে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ না ঘটালে শুধু অর্থ বিনিয়োগের হার বাড়িয়ে এক্ষেত্রে উপযুক্ত ফল লাভ করা কঠিন।

আসলে আধুনিকতার প্রবর্তন প্রয়োজন শুধু গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যবস্থায় নয়, সামগ্রিক সমাজেও। উন্নত দেশগুলি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে রাজনৈতিক-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে এগিয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পক্ষে সামাজিক অগ্রগতির এই ধাপগুলিকে বাদ দিয়ে শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি অর্জন করা সহজসাধ্য নয়। কাজেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে যেমন সামাজিক উন্নয়নের ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে তেমনি সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলও আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা-চর্চার অনুকূল করে তোলা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

প্রযুক্তি অর্জনের সমস্যা

আজকের উন্নত দেশগুলিতে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন দেশের সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত আবার এই প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে বেগ সঞ্চারিত হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে। কাজেই দেশের উৎপাদনবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গবেষণা ও উন্নয়নের প্রভাব অতি স্পষ্ট, অথচ আজকের উন্নয়নশীল দেশগুলোর সনাতন উৎপাদন-ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং গবেষণা ও উন্নয়নের প্রায় কোন স্থান নেই। যদি বা কিছু নতুন প্রযুক্তি দেশে আমদানি করা হয়, তা প্রায়শঃই বিদেশ থেকে 'টার্ন-কি' পদ্ধতিতে। বিদেশী বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমেই সে প্রযুক্তি স্থাপিত হয়, কাজেই দেশে প্রযুক্তি-উদ্ভাবন বা গবেষণার প্রশ্নটি আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত গৌণ বলে মনে হয়। এভাবে উন্নত দেশের সঙ্গে সংযোগ অনেক ক্ষেত্রে দেশীয় প্রযুক্তি বিকাশের পক্ষে সহায়ক না হয়ে বরং বাধা হয়ে দেখা দেয়।

এ কারণেই গত কয়েক দশকের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতায় আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অগ্রগতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযোগ্য প্রয়োগের জন্য একটি সামগ্রিক জাতীয় নীতি নির্ধারণের ভিত্তিতে এগনো প্রয়োজন। এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-নীতি শুধু নিরাবলম্ব নীতি নয়, তাকে হতে হবে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অচ্ছেদ্য অঙ্গ। পশ্চিমা উন্নত দেশগুলিতে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ক্ষেত্রে বেসরকারী খাত একটা বড় ভূমিকা নিয়ে থাকে। উন্নয়নশীল দেশে সাধারণতঃ জাতীয় সরকারকেই এক্ষেত্রে প্রধান উদ্যোগ নিতে হয়। সাম্প্রতিক কালে জাপান, ভারত, চীন, কোরিয়া প্রভৃতি যেসব দেশ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছে তারা সকলেই এমনি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে এগিয়েছে।

এই পরিকল্পিত অগ্রগতির একটি দিক অবশ্যই হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার ব্যবস্থা। এই কাজটি সময়সাপেক্ষ, এবং সে কারণেই এদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন সবার আগে। সেই সঙ্গে জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ-স্থাপনের লক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়ন মূলক প্রতিষ্ঠান গুলিকে আধুনিক ও সুসংহত করা প্রয়োজন। এসব প্রতিষ্ঠানের যেমন সুসংগঠিত গবেষণা কর্মসূচী নির্ধারণ করতে হবে, তেমনি সেসব গবেষণার উপযোগী সুযোগ-সুবিধে এবং উপযুক্ত জনশক্তি-সৃষ্টিরও আয়োজন চাই, সেই সঙ্গে চাই গবেষণার ফলাফল শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা।

অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সকল প্রযুক্তি যে নিজেদেরই উদ্ভাবন করতে হবে এমন নয়। বিদেশ থেকে উন্নত প্রযুক্তি আহরণের নিশ্চয়ই সুযোগ ও প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এসব প্রযুক্তি নির্বাচন ও আত্মীকরণ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করা প্রয়োজন। আগেই বলা হয়েছে প্রযুক্তি অনেকাংশেই একটি সামাজিক-আর্থনীতিক পরিমণ্ডলের ফল। বিদেশ থেকে প্রযুক্তিগ্রহণের সময়ে যদি তার সামাজিক আর্থনীতিক দিকগুলো সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা না হয়, তাহলে তা শেষ পর্যন্ত শুধু যে আর্থিক, পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, তা নয়, বিদেশের ওপর প্রযুক্তিগত নির্ভরতারও জন্ম দেয়।

বিদেশ থেকে প্রযুক্তি গ্রহণের পাশাপাশি নিজস্ব প্রযুক্তিগত ক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে। বিশ্বের সকল প্রযুক্তি মূলতঃ সমগ্র মানবজাতির সাধারণ উত্তরাধিকার, আর এক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতি বা জনগোষ্ঠিরই কিছু না কিছু অবদান রয়েছে। অথচ দুর্ভাগ্যক্রমে

www.pathagar.com

আজ এই প্রযুক্তিসম্পদ অল্প কিছু দেশের ও প্রতিষ্ঠানের কুক্ষিগত। দেশের নিজস্ব যেসব সনাতন প্রযুক্তি সেগুলিকে নতুন প্রযুক্তি আহরণের ডামাডোলে সম্পূর্ণ ত্যাগ করার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয় না। অনেক ক্ষেত্রে সনাতন প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ হলে তা আমাদের জনগণের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে বেশি উপযোগী হতে পারে। কৃষি, চিকিৎসা, ক্ষুদ্র শিল্প প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রেই সনাতন প্রযুক্তির আধুনিকীকরণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বিদেশী প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রেও প্রধান লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন সে প্রযুক্তি নিজস্ব প্রয়োজনে আত্মস্থ করা এবং স্বদেশের প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে অন্য দেশের সমকক্ষতা অর্জন করা। চিরকালের জন্য পরনির্ভরতা কোন দেশেরই কাম্য হতে পারে না।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আধুনিকতা আনতে গেলে আর্থনীতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও আধুনিকতার প্রবর্তন চাই। সমাজে যদি পশ্চাৎপদ ভাবধারা, অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কার অব্যাহত থাকে তাহলে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও উন্নয়ন পদে পদে বাধাগ্রস্ত হবে। এজন্য সমগ্র সমাজে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, অনুসন্ধিৎসার প্রবৃত্তি, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সত্য-নির্ধারণের পদ্ধতি ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশ দেশের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির স্বার্থেই প্রয়োজন।

সনাতন ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতার একটি সূচক এই যে, এসব দেশে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অতি আধুনিক প্রযুক্তি এবং অতি প্রাচীন প্রযুক্তিকে পাশাপাশি অবস্থান করতে দেখা যায়। এই উৎকট বৈপরীত্যকে অনেক সময়ে 'জেট বিমান ও গরুর গাড়ির সহাবস্থান' বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য জেট বিমান দৃষ্টিসুখকর হলেও তার সুবিধা লভ্য শুধু দেশের আণবিক এক জনগোষ্ঠির কাছে, অসংখ্য মানুষের দূর গন্তব্যে পৌঁছবার পন্থা এখনও গরুর গাড়ি বা প্রাগৈতিহাসিক কালের পালের নৌকা। একই ধরনের বৈপরীত্য চোখে পড়বে অতি আধুনিক শল্য চিকিৎসা এবং হাতুড়ে বৈদ্যের ঝাড়ফুঁকের চিকিৎসায়, কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থায় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে।

এই পরিস্থিতিতে এসব দেশের উন্নয়নের একটি আবশ্যকীয় শর্ত হল উৎপাদন ও সেবাক্ষেত্রে উপকরণ ও পদ্ধতির এই বিপুল বৈষম্যের মধ্যে সমন্বয়বিধান। সেজন্য একদিকে যেমন সনাতন প্রযুক্তির আধুনিকায়ন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন অতি আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের সময়ে দেশের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে তার উপযোগিতার মূল্যায়ন।

তৃতীয় বিশ্বে গত কয়েক দশকের শিল্পায়নের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে গ্রহণকারীদের কারণে প্রায়শঃ এমন প্রযুক্তি গছিয়ে দেওয়া হয়; যা ব্যয়বহুল ও অলাভজনক প্রমাণিত হওয়ায় উন্নত দেশে ইতিমধ্যে বর্জিত হয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় অতি জটিল অথবা অনাবশ্যকভাবে বৃহদাকার এবং যার যন্ত্রাংশের জন্য সরবরাহকারী দেশের ওপর দীর্ঘকাল নির্ভর করে থাকতে হবে। কখনো কখনো উন্নত দেশের সরবরাহকারীরা মুনাফার স্বার্থে এমন প্রযুক্তি অন্য দেশে রপ্তানি করে যা পরিবেশে বিপর্যয় ঘটায় এবং মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে। বিপজ্জনক কীটনাশক, বিষাক্ত রাসায়নিক বস্তু ও ক্ষতিকর ওষুধ রপ্তানি এর দৃষ্টান্ত।

www.pathagar.com

এ থেকে একটি শিক্ষা গ্রহণ করা যায় যে, কোন প্রযুক্তি আপাতদৃষ্টিতে যতই আকর্ষণীয় হোক তাকে যথাযথ মূল্যায়ন না করে গ্রহণ করা নিরাপদ নয়। মূল্যায়ন হতে হবে অবশ্যই গ্রহণকারী দেশের বাস্তব প্রয়োজনের নিরিখে। এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে সে প্রযুক্তির পরিবর্তন ও অভিযোজন অনেক ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এ ধরনের মূল্যায়ন, অভিযোজন ও আত্মীকরণের জন্য দক্ষ দেশজ জনশক্তি এবং দেশজ গবেষণা ও উন্নয়ন অবকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন।

আজকাল অনেক সময়ে 'যথাযথ প্রযুক্তি' বা লাগসই প্রযুক্তির কথা বলা হয়ে থাকে। কারো কারো মতে তা মূলতঃ উন্নয়নশীল দেশগুলিকে আধুনিক প্রযুক্তির অবদান থেকে বঞ্চিত রাখার জন্য উন্নত দেশগুলোর একটি কৌশল মাত্র। প্রকৃত অর্থে লাগসই প্রযুক্তি মাত্রই পুরনো বা অনাধুনিক প্রযুক্তি নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনে অতি আধুনিক প্রযুক্তি অনুন্নত দেশের জন্য যথোপযুক্ত হতে পারে—যেমন বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবাণী দেবার জন্য আধুনিক রাডার বা আবহাওয়া উপগ্রহের সংকেত-বিশ্লেষণ ব্যবস্থা। তবে লাগসই প্রযুক্তির মূল কথা হল বৃহৎ পুঁজিনির্ভর এমন প্রযুক্তি বর্জন করা যা দেশে বেকারত্ব সৃষ্টি করবে এবং বিদেশী প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীলতা বাড়াবে এবং তার জায়গায় এমন প্রযুক্তির প্রবর্তন উৎসাহিত করা যা দেশের আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন মেটায় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

যথোপযুক্ত প্রযুক্তি অনেক সময় দেশের প্রচলিত প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে বা অন্য উন্নয়নশীল দেশ থেকেও পাওয়া যেতে পারে। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে যে রান্নার চুলা বা আলো দেওয়ার কুপি ব্যবহার করা হয় তার কথা তোলা যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এমন নতুন চুলা এবং এমন কুপি উদ্ভাবন করেছেন যার জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা আগের চেয়ে দুই বা তিন গুণ বেশি। বলা বাহুল্য সারা দেশে এই নতুন ধরনের চুলা ও কুপি ব্যবহৃত হলে জ্বালানি কাঠ ও কেরোসিনের ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য সাশ্রয় ঘটতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশগুলি প্রধানতঃ পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত। এই দেশগুলির একটি বিশেষ সম্পদ হল তাদের উদ্ভিদরাজি ও প্রাণিকুল। অনুমান করা হয় যে, পৃথিবীতে ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে, তার মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষই রয়েছে নিরক্ষীয় অঞ্চলে অর্থাৎ পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। এসব প্রজাতির মধ্যে অধিকাংশেরই গুণাগুণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনও বাকি রয়েছে। তার প্রধান কারণ এসব দেশে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের সংখ্যাল্পতা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-গবেষণায় সম্পদ বিনিয়োগের অপ্রতুলতা। সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণাক্ষেত্রে জনসম্পদের মাত্র ৬ শতাংশ রয়েছে উন্নয়নশীল দেশে এবং সম্পদ বিনিয়োগের মাত্র ৩ শতাংশ ঘটেছে এই দেশগুলিতে। অথচ মাত্র একটি দুটি অর্থকরী উদ্ভিদের যে কী বিপুল বাণিজ্যিক মূল্য হতে পারে তা রবার, সিঙ্কোনা, কফি, চা, পাট প্রভৃতি উদ্ভিদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব থেকে বোঝা যায়।

বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নানান ফসল ও ফলের চাষে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। নানা ধরনের ফল, ভেষজ উদ্ভিদ, অর্থকরী ফসল প্রভৃতি চাষের প্রযুক্তি এসব দেশ পরস্পরের কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারে। ফিলি-

www.pathagar.com

ফাইনের আন্তর্জাতিক ধান গবেষণাগার দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে ধান চাষের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তেমনিভাবে ঢাকার আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণাগার উদরাময় রোগ নিয়ন্ত্রণে একটি সফল নতুন ধারার প্রবর্তন করেছে। এগুলিকে সার্থক লাগসই প্রযুক্তির দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তি অনেক সময়ে নতুন সমস্যারও জন্ম দেয়। নতুন প্রজাতির উচ্চফলনশীল শস্য চাষের ফলে প্রচলিত অসংখ্য জাতের শস্য আজ নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হয়েছে। কাজেই উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের বংশ-গতির সম্পদ-সংরক্ষণও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার একটি উপযোগী ক্ষেত্র হতে পারে।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে প্রযুক্তি-উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, জ্বালানি এবং যোগাযোগের প্রয়োজন নিঃসন্দেহে অগ্রাধিকারের দাবী করতে পারে। খাদ্য-সমস্যার মতোই জ্বালানি-সমস্যাও সারা পৃথিবী জুড়ে আজ এক ব্যাপক রূপ নিয়েছে। এক্ষেত্রে চীন, ভারত, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশ জৈবগ্যাস বা 'বায়োগ্যাস' ব্যবহারে বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। জৈবগ্যাস ব্যবহারে শুধু যে রান্না বা আলোর জন্য জ্বালানি পাওয়া যায়, তা নয়, এই ব্যবস্থা পরিবেশ-দূষণ-নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং এ থেকে উপজাত বস্তু সারও পশুখাদ্য হিসেবেও ব্যবহারযোগ্য।

জৈবগ্যাস ব্যবহারে খুব উচ্চমানের কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন নেই; তবে জৈবগ্যাসের আধার নির্মাণে কিছুটা প্রাথমিক ব্যয় অবশ্যম্ভাবী এবং দেশের কৃষি ব্যবস্থায় এই প্রযুক্তির আত্মীকরণের জন্য সংগঠিত উদ্যোগ প্রয়োজন। সাম্প্রতিক কালে খাদ্য ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য জৈব বস্তু উৎপাদনের আরো নানা নতুন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে, যেগুলি দেশের প্রচলিত প্রযুক্তি-ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হলে উৎপাদনের ব্যাপক অগ্রগতি হতে পারে। এর মধ্যে কোষকলা চাষ বা টিস্যু কালচার প্রভৃতি পদ্ধতির উল্লেখ করা যায়। এ সকল পদ্ধতিকে সামগ্রিকভাবে জৈব প্রযুক্তি বা 'বায়োটেকনলজি' বলা হয়ে থাকে। কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধিতে জৈব প্রযুক্তির নতুন নতুন ব্যবহার ক্রমাগতই আবিষ্কৃত হচ্ছে। অতি সম্প্রতি উদ্ভাবিত জীন প্রকৌশল বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং জৈব প্রযুক্তিরই একটি উন্নত শাখা।

এমনি আরো নানা ক্ষেত্রে সনাতন প্রযুক্তির সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের যোগসূত্রের ফলে নতুন নতুন প্রযুক্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তার মধ্যে সৌরশক্তি, অ্যাজোলা জাতীয় শেওলা সার ও অন্যান্য জৈব সারের ব্যবহার, কীটপতঙ্গের জৈব নিয়ন্ত্রণ, ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, পানীয় ও সেচের জন্য জল-সরবরাহ, খাদ্য ও শস্য প্রক্রিয়াকরণ, স্বল্পব্যয় গৃহনির্মাণ, ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার, হাঁস-মুরগির চাষ প্রভৃতি গ্রামীণ উৎপাদন-ব্যবস্থায় ক্ষুদ্রাকার যান্ত্রিকায়ন-প্রযুক্তি আজ অনেক উন্নয়নশীল দেশে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে অতি আধুনিক প্রযুক্তি উন্নয়নশীল দেশের জন্য একই সঙ্গে বিপুল সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ ধরনের প্রযুক্তির মধ্যে জীন প্রকৌশল, ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক্স, কমপিউটার, সৌর বিদ্যুৎকোষ, নতুন গুণাগুণযুক্ত বস্তু-উদ্ভাবন এবং কৃত্রিম উপগ্রহ-ভিত্তিক দূর অনুধাবনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব নতুন প্রযুক্তির আত্মীকরণ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির জন্য অর্থনৈতিক অগ্রগতির

www.pathagar.com

বিপুল সম্ভাবনা খুলে দিতে পারে, আবার তা সম্ভব না হলে উন্নত দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক বৈষম্য হয়তো আরো দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।

তৃতীয় বিশ্বে প্রযুক্তি বিকাশের পথ

এই আলোচনার গোড়ার দিকে একটি প্রশ্ন প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয়েছিল। এখন প্রশ্নটিকে সামনে আনা যেতে পারে। সে প্রশ্নটি হল, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আমদানি বা আত্মীকরণ কি শেষ পর্যন্ত সমগ্র জনগণের কল্যাণ সাধন করবে, না দেশের বা সমাজের শুধু সংকীর্ণ এক অংশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবে। এযাবৎকালের অভিজ্ঞতা এই যে, উন্নত দেশগুলি থেকে যখন উন্নয়নশীল দেশে নতুন প্রযুক্তি আমদানি করা হয় তখন তা প্রধানত প্রযুক্তি রপ্তানিকারক দেশের এবং আংশিকভাবে আমদানিকারক দেশের এক ক্ষুদ্র অংশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। আর এ কারণেই উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্য ঘোচে না এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলে যেমন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে তেমনি উন্নয়নশীল দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়তে থাকে।

বলা বাহুল্য, এ সমস্যা উন্নয়নশীল দেশগুলির অগ্রগতির সামনে আজ এক মৌলিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ এটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, সমগ্র জনগণের মধ্যে উন্নয়নের ফলাফল পৌঁছাতে না পারলে, বাংলাদেশে উচ্চফলনশীল ধানের বিস্তারের মতোই, অগ্রগতি একটা পর্যায়ে এসে থেমে যায়, দারিদ্র্যের পরিধি বাড়তে থাকে এবং সমগ্র উন্নয়ন প্রক্রিয়াই শেষ পর্যন্ত অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

এ সমস্যার সমাধান নিঃসন্দেহে নিহিত সামগ্রিক উন্নয়ন-প্রক্রিয়ার পূর্ণ বিবেচনায়। উন্নয়নের লক্ষ্য যদি হয় সমগ্র জনগণের সমৃদ্ধি ও কল্যাণ, তাহলে যেমন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যেকার বৈষম্য দূরীকরণের উদ্যোগ নিতে হবে, তেমনি প্রযুক্তি নির্বাচনে এমন কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন, যা উৎপাদনবৃদ্ধির ফলাফল সমগ্র জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়, শুধু ক্ষুদ্র সুবিধাভোগী অংশের কুক্ষিগত না হয়।

এই কৌশলের একটি প্রধান দিক হল উন্নয়নশীল দেশের উপযোগী প্রযুক্তি নির্বাচন ও উদ্ভাবন। উন্নত দেশে যেসব প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয় সেগুলির মূল লক্ষ্য হল সে-সব দেশের আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন মেটানো। কাজেই অনেক ক্ষেত্রেই সেসব দেশ থেকে পরিপক্ক প্রযুক্তি হুবহু আমদানি করলে তা উন্নয়নশীল দেশের প্রয়োজন সিদ্ধ করে না। এজন্য নতুন প্রযুক্তির পেছনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে আয়ত্ত করে অপেক্ষাকৃত প্রাথমিক বা মাঝারি স্তর থেকে শুরু করে উন্নয়নশীল দেশের নিজস্ব সমস্যা সমাধানের উপযোগী প্রযুক্তি সৃষ্টি করতে হবে। জৈব প্রযুক্তি, ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক, সৌরশক্তি, দূর অনুধাবন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। বলা বাহুল্য এজন্য প্রযুক্তি সরবরাহের জন্য উন্নত দেশের মুখাপেক্ষী না থেকে উন্নয়নশীল দেশকে নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যবস্থা, যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আত্মীকরণের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

উপরোক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হলে তিনটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমতঃ, যেসব দেশজ সনাতন প্রযুক্তির অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত বা সাংস্কৃতিক

www.pathagar.com

মূল্য রয়েছে, সেগুলিকে সংরক্ষণ এবং আরো উন্নত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, যেসব নব-উদ্ভাবিত প্রযুক্তি দেশের বাস্তব অর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধানে সহায়তা করতে পারে, সেগুলিকে দেশের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির স্বার্থে গ্রহণ করতে হবে। তৃতীয়তঃ, দেশের সামগ্রিক প্রয়োজনসিদ্ধির স্বার্থে নতুন ও সনাতন প্রযুক্তির সমন্বয়ের উদ্যোগ নিতে হবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে জনগণের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা, কুশলতা ও কৃষ্টির যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে এই সমন্বয় সাধন করা সম্ভব।

বলা বাহুল্য, সেই সঙ্গে চাই সমগ্র জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিপোষক দক্ষতা ও মনোভঙ্গি গড়ে তোলা। আজকের উন্নত প্রযুক্তিমাত্রই বিজ্ঞাননির্ভর। কাজেই সমগ্র সমাজে সামান্য শিক্ষা, বিশেষতঃ বিজ্ঞান-শিক্ষার বিস্তার না ঘটলে, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারমুক্ত উদ্ভাবনমূলক মনোভঙ্গি প্রসারিত না হলে, অনুসন্ধান, পরীক্ষণ ও শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধি না পেলে সে সমাজে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হবে দুঃসাধ্য। আজকের তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি পাশ্চাত্য দেশ থেকে তৈরি প্রযুক্তি গ্রহণ করে বিনা শ্রমে অগ্রগতির স্বর্ণদ্বারে পৌঁছে যাবার মোহ থেকে যত তাড়াতাড়ি মুক্তি পায় তত মঙ্গল। নিজেদের ঐতিহ্য, মেধা ও শ্রমের ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার দুরূহ পথে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা উদ্ভাবনের পথে এগুনো ছাড়া এসব দেশের প্রকৃত উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনের বিকল্প কোন পথ খোলা আছে বলে মনে হয় না।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ছিল অধিকতর শক্তিশালী, তার ছিল বিস্তীর্ণ এলাকা, দীর্ঘ সময়ের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব, পুরোহিত এবং ক্ষত্রিয় সম্ভ্রান্তবর্গের সমর্থন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মগধের ছিল অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন 'সম্পদ'—গাঙ্গেয় নদীপথের উপর নিয়ন্ত্রণে সুবিধাজনক অবস্থানের অধিকার এবং সর্বোপরি, লৌহ-আকরের উৎস। এই দুই কৌশলগত সুবিধার কারণেই শেষ পর্যন্ত কোশলকে পরাভূত করে মগধ আত্মপ্রকাশ করে এতদঞ্চলের মূল শক্তি হিসাবে।[১৩]

সুবিদিত যে, কোশল রাজা প্রসেনজিতের উপর অজাতশত্রুর বিজয়ের মধ্য দিয়েই কোশল এবং মগধের সংঘাতের পরিসমাপ্তি ঘটে। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষ নাগাদ কোশল তার সকল পূর্বগৌরব হারিয়ে বিস্মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে।

এদিকে যদি কৌমের ভাঙনের মধ্য দিয়ে মগধ এবং কোশলের রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে থাকে, তবে অপরাপর জনপদের সঙ্গে এবং তাদের পরস্পর সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে কৌমের সর্বশেষ অবশেষসমূহও রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কাঠামোর ক্ষেত্র থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রসেনজিৎ এবং বিম্বিসার উভয়ের ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয় সম্পূর্ণ এক পৃথক ধরনের সেনাবাহিনী, যার কৌম-ভিত্তি সম্পূর্ণই অপসারিত এবং যে-সেনাবাহিনীর আনুগত্য কেবলমাত্র ব্যক্তিগতভাবে রাজার নিকট।[১৪]

কিন্তু কোশলের উপর মগধের বিজয়ের মধ্য দিয়েই এ প্রক্রিয়াটির পরিসমাপ্তি ঘটেনি। পার্শ্ববর্তী অন্যান্য কতক কৌম এবং জনপদ তখনও ছিল বেশ শক্তির অধিকারী। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলো লিচ্ছবি এবং মল্ল কৌমসমূহ। শেষোক্তদ্বয় নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এক ধরনের কনফেডারেসী। কূটকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে অজাতশত্রু এই দুই কৌমের প্রতিরোধ বিচূর্ণ করে। কৌশলটি কতক কারণে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সংক্ষেপে তা এই যে, অজাতশত্রু তাঁর এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রীকে লিচ্ছবিদের নিকট মিথ্যা পরিচয়ে প্রেরণ করেন, যাঁকে লিচ্ছবিরা যত্নের সঙ্গেই গ্রহণ করে। অতঃপর

---

১৩. মগধের ক্ষেত্রে লৌহ-আকর উৎসের ভূমিকার ব্যাপারে কোসাম্বীর নিম্নরূপ আলোচনা বেশ লক্ষণীয়: "Looking over the old traditional capitals, one is struck by the solitary occurence of Rajgir on the other side of the river, whereas the chain of Aryan settlements had all its links far to the north along the Himalayan foothills. To this day, the environs of Rajgir preserve a comparatively wild appearance. The reason for a capital so far out of the way in what is not the most fertile land becomes clear when it is noted that the Baraaba hills contain the northernmost known Dharwar outcrop, with quickly accessible iron encrustations. Rajgir had the first immediate source of iron at its disposal. Secondly, it straddled (with Gaya, to which the passage was through denser forest) the main route to India's heaviest deposits of both iron and copper to the south-east in the Dhalbhum and Singhbhum district ... Thus Magadha has a near-monopoly over the main source of contemporary power, the metals." (ঐ; পৃ ১৪৭)

১৪. "Both these kings had developed a new type of army to replace the former armed tribe as a whole, an army without tribal basis which now owed loyalty only to the king, With the dynastic principle, there appeared a new office : that of *senapati*, i.e. commander in-chief, often held by the heir-apparent. Such an army could not have been maintained without regular tax and extensive revenues, It was the main support of the king's absolute power. Bimbisara was reported to have ruled over 80,000 villages." (ঐ; পৃ ১৫০)

www.pathagar.com

ব্রাহ্মণ মন্ত্রী এ পদমর্যাদার সুযোগ নিয়ে (এ সূত্রে যাঁর ভাস্কর নামের উদ্ভব) লিচ্ছবিদের মধ্যে বপন করতে থাকেন পারস্পরিক সন্দেহ আর অবিশ্বাসের বীজ। এ কাজে তিনি এতই সফলতা লাভ করেন যে স্বল্পকালের মধ্যেই লিচ্ছবি নিপতিত হয় রাজনৈতিক গোলযোগে, কৌমসভার নিয়মিত অধিবেশন হয়ে যায় বন্ধ। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অজাতশত্রু খুব অনায়াসেই প্রবেশ করেন লিচ্ছবির রাজধানী বৈশালিতে। এই সময়ে চূর্ণ করা হয় মল্ল কৌমকেও। আর প্রসেনজিতের পুত্র বিড়ূড়ভা স্বীয় অপমানের প্রতিশোধ নিতে গৌতম বুদ্ধের কৌম, শাক্যের সদস্যদের রক্ত দিয়ে নিজের সিংহাসন স্নাত করেছেন আগেই।

এরপরও আরও যেসব কৌম ছিল (যেমন 'কুরু' অথবা 'পঞ্চাল'), মগধের রাজা মহাপদ্ম নন্দ খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০ সাল নাগাদ সেসব বিচূর্ণ করার মাধ্যমে পূর্বসূরী অজাতশত্রু এবং বিড়ূড়ভার কাজ সম্পূর্ণ করেন [১৫]। গাঙ্গেয় উপত্যকায় মগধের বিজয় এইভাবে নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠে। লিচ্ছবিদের বিরুদ্ধে অভিযানের অংশ হিসেবেই অজাতশত্রু পাটলিপুত্রের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেছিলো। আর তাঁর পৌত্র উদয়নের আমলে রাজধানী রাজগীর থেকে পাটলিপুত্রে (পাটনা) স্থানান্তরের কাজ সম্পন্ন হয়। এ পাটনাই পরবর্তী প্রায় সাত শতাব্দী ধরে বিরাজ করতে থাকে ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান নগরী হিসাবে। পাটনাকে রাজধানী করে মগধ আত্মপ্রকাশ করে ভারতবর্ষের প্রথম universal monarchy রূপে। ভারতের বুকে কৌম থেকে অঞ্চলভিত্তিক সমাজে উত্তরণের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে।[১৬]

৪. আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়ার আরেক অনুষঙ্গী দিক—নতুন ধর্মমতের উদ্ভব

কৌম থেকে সমাজে উত্তরণের এই যে প্রক্রিয়া, তার আর্থ-সামাজিক সারবত্তা ঘনিষ্ঠ অনুধাবনের জন্য প্রয়োজন সমসাময়িককালের আরও কতক ঘটনা লক্ষ্য করা। আপাত-দৃষ্টিতে এসব ঘটনা ধর্মীয় চরিত্রের। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ছিল তলবর্তী অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং তাগিদেরই উপরিকাঠামোগত অভিপ্রকাশ।

যখন গাঙ্গেয় উপত্যকায় সংঘটিত হচ্ছিল এসব প্রবল রাজনৈতিক তৎপরতা, তখন একই সময়ে এ অঞ্চল প্রত্যক্ষ করে এক ধর্মীয় আলোড়ন। বেশ কয়েকজন নতুন ধর্ম-প্রচারকের আবির্ভাব ঘটে এ সময়ে। তাঁদের মধ্যে বর্তমান কালের নিরিখে সবচেয়ে উল্লেখ্য হলেন গৌতম বুদ্ধ এবং মহাবীর। কিন্তু এ ছাড়াও সমসাময়িককালে আরও যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সঞ্জয় বেলাত্তিপুত্ত (Sanjaya Belatthiputta), মাক্খালী গোশাল (Makkhali Gosala) প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্নটি দেখা দেয় তা হলো: প্রায় একই সময়ে এরূপ বিভিন্ন ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাবের কি কারণ ছিল?

---

১৫. "A few surviving traditional Ksatriya tribes (like those of Kurus and Pancalas) were systematically wiped out by about 350 B. C. by king Mahapadma Nanda of Magadha, who completed the work of Vidudabha and Ajatsatru" (ঐ; পৃ ১৫৩)

১৬. "The one essential change was that the four caste-class system had finally become broader than, and indepecdent of, any tribal regulations." (ঐ; পৃ ১৫৪)

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির ছিল এমন কিছু গূঢ় তাগিদ, যার ফলে প্রায় একই সময়ে বেশ একই ধরনের ভাবধারাসম্পন্ন বিভিন্ন ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব ঘটেছিল। কি ছিল এই তাগিদ ?[১৭]

বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যদি এই ধর্মপ্রচারকেরা কি বক্তব্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তার প্রতি লক্ষ্য করা যায়। সুবিদিত যে, বিভিন্ন ধরনের সূক্ষ্ম এবং অনুচ্চকিত পার্থক্য সত্ত্বেও এসব ধর্মপ্রচারকের সাধারণ যে বাণীটি ছিল মূল, তা হলো 'অহিংসা'। কিন্তু কেন এই অহিংসা ? কেন অহিংসা হয়ে উঠলো এত বেশী প্রয়োজনীয় যে, প্রায় একই সময়ে বিভিন্ন ধর্মপ্রচারকেরা নানারূপ পার্থক্য সত্ত্বেও জোরালোভাবে তুলে ধরলেন এই অভিন্ন বাণী ?

কোসাম্বীর মতে এটা ছিল : "The rising protest against a pastoral life which could not feed the increasing population so well as plough-cultivation ..." (ঐ; পৃ ১২৮)[১৮]। অন্য ভাষায়, এটা ছিল tribal kingdom সমূহের যে 'monstrous cancer growth of sacrificial ritual', তার বিরুদ্ধে এক সাধারণ প্রতিবাদ। ব্রাহ্মণ বর্ণ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের উদ্ভবের প্রসঙ্গটি নতুন করে আলোচনার অপেক্ষা রাখেনা। খুব বোধগম্য কারণে যতই ব্রাহ্মণদের সামাজিকভাবে এক রক্ষণশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল ততোই আচারাদি হয়ে উঠছিল আরও ভারযুক্ত এবং কঠোর। কৌম সদস্যদের মধ্যে শ্রেণীগঠনের প্রক্রিয়া অগ্রসর হওয়ার মধ্যে দিয়ে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় বর্ণের মধ্যে দেখা দেয় যে স্বার্থের আঁতাত, তার ফলে যজ্ঞ-আচারাদির মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। Bali-tax ছিল সবচেয়ে আদি কর। সেটা ছিল কৌম জীবনেরই অঙ্গ। কৌমের কোন অভিন্ন কল্যাণার্থে কৌম সদস্যদের কাছ থেকে বলি দেওয়ার উদ্দেশ্যে সংগৃহীত হতো পশু ইত্যাদি, কৌম প্রধানের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হতো যৌথ বলিদান। কিন্তু কালক্রমে ঐ যজ্ঞপ্রথা সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্র ধারণ করে। কৌমের অর্থনীতি ততোদিনে বিবর্তিত হয়েছে অনেকখানি; পশুপালনের বদলে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে কৃষি; আর কৃষিজীবীর নিকট পশুর গুরুত্ব নিঃসন্দেহে পশুপালকের চেয়ে খুবই ভিন্ন মাত্রার। অথচ পরজীবী ক্ষত্রিয়ের মোক্ষ হলো যুদ্ধ; আর যুদ্ধে জয়লাভের জন্য প্রয়োজন দেবতাদের সন্তুষ্ট করা, এবং সেজন্য প্রয়োজন যজ্ঞ। যজ্ঞ পরিচালনার দায়িত্ব ব্রাহ্মণের; যজ্ঞ পরিচালনাই তার জীবিকার অন্যতম উৎস। কাজেই যজ্ঞ ব্রাহ্মণদের জন্যেও লাভজনক। এদিকে যুদ্ধের যাতে কারণের অভাব না হয় সেজন্য আরো আয়োজন করা হলো অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রথা।

---

১৭. কোসাম্বীর ভাষায়, "...the new beliefs were the expression of some urgent need, some change in the productive basis." (ঐ; পৃ ১৫৫)

১৮. কোসাম্বীর কাছ থেকে এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানা যায় : "The second common feature shows us why the sects arose, why they were necessary. Without exception, even when the founder was a brahmin like Purana or Samjaya, they actively or passively denied the validity of vedic ritual and observances. In the study of these sects, the finer metaphysical differences are of lesser importance than the background phenomena of tribal life and the monstrous cancer growth of sacrificial ritual in the tribal kingdoms. It is out of these and as a protest against their anti-social features that every one of the sects appeared." (ঐ; পৃ ১৫৭)

www.pathagar.com

ইত্যাদির। গোটা এ বিষয়টাই ছিল কৃষিজীবী এবং কৃষি অর্থনীতির জন্য প্রতিকূল। যজ্ঞ ছিল পশুপালক জীবনের উপযোগী একটি আচার। অথচ অর্থনীতি যখন হয়ে উঠেছে কৃষিভিত্তিক তখন এ যজ্ঞ হয়ে দাঁড়ায় কেবল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের পশ্চাদ্‌মুখী শ্রেণী-স্বার্থের পরিপোষক; এবং অর্থনীতির আরও বিকাশের পথে বাধা। প্রগতির পথে এ অন্তরায় দূর করার ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই অবশ্যম্ভাবীভাবে দেখা দেয় ঐরূপ 'অহিংসা'র বাণী-সম্পন্ন নতুন ধর্মমত।[১৯]

লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, এটা হলো কৌম অতিক্রম করে যাওয়ার অর্থনৈতিক প্রয়োজনের একটি দিক। কৌম সংগঠন এবং তার অনুষঙ্গী কৌম যুদ্ধ-বিগ্রহ (tribal warfare) নতুন কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির জন্য সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে উঠেছে। সে কারণে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিপরীতে বৌদ্ধ এবং অন্যান্য নতুন ধর্মমতের আবির্ভাব ঘটে কৃষি-অর্থনীতির এবং এলাকা-ভিত্তিক সমাজের উপযোগী মতাদর্শ হয়ে।

কিন্তু পাশাপাশি কৌমের ভাঙনের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের অন্য আরেকটি দিকের প্রতিও বেশ মনোযোগ আকর্ষণ করেন কোসাম্বী। সেটা হলো এই যে, কৌমের ভেতর ইতিমধ্যে অভ্যুদয় ঘটেছে ব্যক্তি-এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার পারিবারিক-মালিকানার। বিকশিত হয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য; আর বলা বাহুল্য যে, সাধারণভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা আবশ্যিক পূর্বশর্ত হলো ব্যক্তি-মালিকানা। ফলে অর্থনীতির এই যে নতুন উদ্‌গত শক্তিসমূহ, আরও সম্মুখ অগ্রগতি এবং বিকাশের জন্য তার প্রয়োজন ছিল কৌম বাধা-বন্ধনসমূহ থেকে মুক্ত হয়ে আসা; নিজ নিজ অর্থনৈতিক কর্মপ্রয়াসের লাভের (gain, সংকীর্ণ অর্থের profit নয়) উপর কৌমের অযাচিত এবং অতঃপর অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপের অবলুপ্তি ঘটানো।[২০] কৌমের ভাঙন এ দিক থেকেও ছিল ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য।

---

১৯. "The greatest fruit of the *yajna* sacrifice was success in war; fighting was glorified for its own sake as the natural mode of life for Ksatriyas, while the brahmin's duty and means of livelihood was the performance of vedic sacrifices. The other two castes had the task of producing the surplus which priest and warrior took away by natural right, originally for the good of the tribe, but soon for the good of the upper castes. The vedic ritual was formulated in a pastoral age where large herds collectively owned were the main form of property. The new society had gone over to agriculture, so that the slaughter of more and more animals at a growing number of sacrifices meant a much heavier drain upon producer and production. Not only was the number of cattle bred proportionately much less per head of population but they were now privately owned by class or families rather than tribes and more valuable to the agriculturist than to herdsmen. That they were taken as before without compensation meant in effect a heavy tax upon the Vaisya class. Apart from their having less to trade because of this tax, trade and production were both disturbed by the unceasing petty warfare. Even the most passive of the sects ... repudiated the use of ritual sacrifice, while the most active like Jainism and Buddhism based themselves upon *ahimsa*, 'non-killing', as strongly opposed to war as to ritual sacrifice." (ঐ পৃ ১৫৭-৮)

২০. "... a whole class of people, who now engaged in trade, the production of commodities, or of surplus grain on family holdings—in a word, the creation of private property — needed their immunity from tribal obstruction and from tribal sharing of the

www.pathagar.com

এভাবেও আমরা দেখি যে, নতুন ধর্মমতসমূহ ছিল এসব নব উদ্গত অর্থনৈতিক শক্তি-সমূহের স্বার্থের পক্ষে। 'অহিংসা' ছাড়া নতুন ধর্মমতসমূহের অন্যান্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল সততা, ন্যায়বিচার, অন্যের সম্পদ হস্তগত না করা, চৌর্যবৃত্তি পরিহার করা ইত্যাদি। কোসাম্বীর মতে, এসব নীতি-নিয়ম দেখায় যে, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মালিকানার উদ্ভব ঘটেছে। নতুন ধর্মমতের এসব শিক্ষা এ ধরনের মালিকানারই প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন হিসেবে আবির্ভূত হয়।[২১]

৫. ভারতীয় সমাজগঠনে ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং বৌদ্ধধর্মের ভূমিকার জটিল বৈপরীত্য

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এরূপ একটি ধারণা বেরিয়ে আসতে পারে যে, বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং ব্রাহ্মণ-বর্ণ সর্বতোভাবেই ছিল কৌম সমাজের পক্ষে, পশুপালক জীবনের অনুসারী, পশ্চাদ্মুখী, পুরাতনকে আঁকড়ে থাকার পক্ষে। বিপরীতে, নতুন ধর্মমতসমূহ ছিল কৌমের সীমা অতিক্রমকারী এলাকা-ভিত্তিক সমাজের পক্ষে, কৃষি-অর্থনীতির স্বার্থানুকূল, নতুন সমাজের প্রবক্তা-স্বরূপ।

কিন্তু গোটা প্রক্রিয়াটি বোধকরি এত সরল প্রকৃতির ছিল না। নিঃসন্দেহে বৌদ্ধ ধর্ম[২২] ছিল কৌম-বিচ্ছিন্নতার (tribal exclusiveness) বিরুদ্ধে। যজ্ঞ এবং তৎসম্পর্কিত কৌম যুদ্ধ-বিগ্রহের বিরোধিতাই কেবল তার পরিচায়ক ছিল না। বস্তুত বুদ্ধের জীবনা-দর্শের মূল যে কথা, 'noble eightfold path,' বলা বাহুল্য, তার মধ্যে কৌম-সীমাবদ্ধ-তার কোন লেশমাত্রই নেই। সেজন্য বৌদ্ধধর্মের মূল বৈশিষ্ট্যই ছিল 'সর্বজনীনতা' (universality)। বস্তুত কৌম-বিচ্ছিন্নতার বিপরীতে সর্বজনীনতার বক্তব্য নিয়ে আবি-

---

profit. To them, it was most important to have a King who could ensure safety on the road and the new rights of property; not some particular King, but any King who would prevent reversion to tribal law and property rights in common." (ঐ; পৃ ১৫১)

২১. "Truth, justice, non-stealing, not encroaching upon possessions of others show that a totally new concept of private, individual property had arisen. In the older traditions, the most valuable property within the tribe (cattle) was held in common, assigned to class or households by mutual consent; property of strangers was not recognized. The injunction against adultery denotes a rigid concept of family and the passing of group-marriage. Without such a morality, taken for granted today, trade would have been impossible. The staunchest of the Buddha's lay followers were traders; merchants are the prominent element among the Jains to this day." (ঐ; পৃ ১৫৮)

২২. বলা বাহুল্য, নতুন ধর্মমতসমূহের মধ্যে বৌদ্ধধর্মই ছিল সবচেয়ে সফল এবং প্রভাবসম্পন্ন। এ ধর্ম ভারতবর্ষ থেকে পূর্বাভিমুখী সারা এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। সিংহল থেকে জাপান, আর তিব্বত থেকে জাভা, মানুষ হয়ে ওঠে বুদ্ধের ধর্মানুসারী। ভারতবর্ষ হয়ে ওঠে এশিয়ার অগণিত মানুষের তীর্থকেন্দ্র। বলা বাহুল্য, ধর্মমতের এই প্রচার একই সঙ্গে ছিল এক সামাজিক ব্যবস্থারও প্রচার এবং প্রসার। যদিও আমরা এখানে সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না, কিন্তু তিব্বত, চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, প্রভৃতি অঞ্চলের সামাজিক বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় এটি বস্তুতই প্রভূত প্রভাব ফেলে। বৌদ্ধধর্মের প্রসার একই সঙ্গে ডেকে আনে স্থাপত্য-শিল্প, চিত্র-কলা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক সাংস্কৃতিক জোয়ার। বিশ্ব-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এটা ছিল ভারতবর্ষের এক অনন্য অবদান।

খোদ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও, বলা বাহুল্য যে, সকল নতুন ধর্মমতের মধ্যে বৌদ্ধধর্মেরই ছিল সবচেয়ে প্রভাবশালী ভূমিকা। সেজন্য ক্ষেত্রবিশেষে নতুন ধর্মমতের প্রভাব বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্মের প্রভাবেরই সমর্থক।

www.pathagar.com

ভূত হলো যে বৌদ্ধধর্ম, সেটা ছিল সমসাময়িক কালের কৌমের প্রতিরোধ বিচূর্ণ করে ভারতবর্ষের বুকে প্রথম universal monarchy প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ারই সমান্তরাল ভাবাদর্শগত প্রক্রিয়া।[২৩]

কিন্তু অন্যদিকে আমরা লক্ষ্য করেছি, কোসাম্বীর অভিমত যে, ব্রাহ্মণরাই সবচেয়ে আগে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল কৌমের সীমাবদ্ধতা; অনার্য কৌমসমূহের মধ্যে তারা সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছিল এক 'সংস্কৃতিকরণ' (acculturation) প্রক্রিয়া। শুধু তাই নয়, সেখানে আমরা আরও জেনেছি যে, বস্তুত কৃষি-অর্থনীতির প্রসারের ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণেরা পালন করেছিল এক অগ্রণী ভূমিকা; ব্রাহ্মণদের পঞ্জিকা-জ্ঞান ইত্যাদি এক্ষেত্রে খুবই অত্যাবশ্যক ছিল। উদাহরণস্বরূপ, এখানে কোসাম্বীর নিম্নোক্ত উক্তিটিও লক্ষ্য করা যেতে পারে :

"The new priesthood influenced the formation of a society out of Aryan and non-Aryan tribes. This was not deliberate, conscious, planned action, but the result of hunger. The sole aim was to make a livelihood. The long, rigid training in the vedas which gave the brahmins solidarity beyond the tribe, which helped them loosen tribal bonds to form a society, also made them unfit to handle plough or bow. They helped form a society fitted to the new concept of property — a concept not shared by all tribesmen because it was not (like the herds) the result of their common effort—agrarian property. The story of Baka Dalbhya or Glava Maitreya shows, if it has any rational meaning, how brahmins could penetrate non-Aryan tribes, take over new cults and so ultimately help food-gatherers turn into food-producers." (ঐ; পৃ ১২৬) এবং "The flexibility of the brahmin, though motivated by greed, was useful nevertheless in the process of assimilation with minimum use of violence, as we shall see later." (ঐ; পৃ ১২৭)

এসব আলোচনা থেকে স্পষ্টতই দৃশ্যমান যে, ব্রাহ্মণরাও কাজ করেছে কৌমের সীমানা অতিক্রম করার দিকে, কৃষি-অর্থনীতির প্রসারের দিকে। তবে কালক্রমে হয়তো বাস্তবিকই ব্রাহ্মণ্যবাদের এবং ব্রাহ্মণদের ভূমিকার রক্ষণশীলতার দিকটিই হয়ে ওঠে মুখ্য[২৪] এবং তার বৈপরীত্য-সূত্রেই নতুন ধর্মমতসমূহের অভ্যুদয় ঘটে।

২৩. "In the political field, the new religion was the exact parallel, for the same economic reasons, of the move towards 'universal monarchy', the absolute despotism of one as against the endlessly varied tyranny of the many." (ঐ; পৃ ১৬১)

২৪. "The conservative brahmins persisted in a way of life formed when cultivation was relatively unimportant to the food supply. This way could no longer be practised when the free, open range had been sadly interrupted by ploughed fields which cattle herds could not be alloved to trample except when fallow." (ঐ; প. ১৬১)

অথবা যেমন কোসাম্বী উল্লেখ করেন উপনিষদের ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি যে, বিধিনিষেধ যাই থাকুক না কেন, ভাল পেলে তিনি গোমাংস অবশ্যই খেয়ে যাবেন। বন্ধ্যা আঁকড়ে থাকার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোসাম্বী জানান যে, "The barhmins meant to preserve their main sonrce of food and hence their theology, no matter how uneconomic the pastoral life had become on which both diet atd ritual were based." (ঐ; প. ১২১)

www.pathagar.com

আরেকটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে, নতুন ধর্মমতসমূহ ছিল সাধারণভাবে বর্ণ-বিভক্তির বিরুদ্ধে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে অনমনীয় ছিলেন গৌতম বুদ্ধ। 'চার বর্ণ-বিভক্তি প্রকৃতির বিধান'—এ তত্ত্বের অসারতা উদ্‌ঘাটনে বুদ্ধ আনেন হেলেনীয় শ্রেণী-বিভক্তির শ্রুতি। তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, সেখানে মাত্র দুটি শ্রেণী। চার বর্ণ-বিভক্তি যে প্রাকৃতিক বিধান নয়, তার প্রমাণে এই উদাহরণটিই ছিল যথেষ্ট, কারণ প্রকৃতির বিধান হলে শ্রেণীর সংখ্যা সেখানেও হওয়ার কথা ছিল চার! বস্তুত বর্ণ-বিভক্তি সম্পর্কে বৌদ্ধধর্মের এরূপ আপোষহীন ভূমিকার জন্যেই শেষ পর্যন্ত আমরা দেখি যে, এশিয়ার বাকি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চমৎকার টিকে থাকলেও, তার উৎসস্থল, ভারতবর্ষেই তা স্থায়ী হতে পারেনি। সে তুলনায় জৈন ধর্মের প্রভাব কিছুটা অক্ষুন্ন থাকে, কারণ তা দ্রুতই বর্ণ-প্রথার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়।[২৫]

সুবিদিত যে, বৌদ্ধধর্মের বর্ণ-বিভক্তি অস্বীকারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল এর 'কর্ম' এবং 'নির্বাণ' সংক্রান্ত ধারণাসমূহ। বলা বাহুল্য, এর অনুষঙ্গী ছিল 'পরজন্মে' বিশ্বাস। বুদ্ধ বর্ণ-বিভক্তিকে মানতে পারছেন না; কিন্তু, অন্যদিকে, বাস্তবে মানুষের সামাজিক অবস্থানের পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। এই দুই বিপরীতকে মেলানোর চেষ্টায়ই বুদ্ধ আনেন 'কর্ম' এবং 'পরজন্ম' সংক্রান্ত তাঁর ধারণাসমূহ। বর্তমান জীবনে মানুষের অবস্থান নির্ধারিত হয় তার পূর্বজন্মের কর্মফল-দ্বারা। একইভাবে পরবর্তী জন্মে তার কি পরিচয় হবে, তা নির্ধারিত হচ্ছে তার বর্তমান জন্মের 'কর্ম'-দ্বারা। সুবিদিত যে, এটা শুধু মানুষের বিভিন্ন সামাজিক অবস্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বুদ্ধ এটাকে আরও বিস্তৃত করে ভাবেন এবং প্রস্তাব করেন যে, পরজন্মে মানুষ আদৌ মানুষ হয়ে জন্মাবে কিনা, অথবা রূপান্তরিত হবে অন্য কোন প্রাণীতে (কীটপতঙ্গ অথবা পশু-পাখি ইত্যাদিতে), তা-ই নির্ভর করে তার 'কর্ম'-দ্বারা।

বলা বাহুল্য, একদিক থেকে বুদ্ধের এই 'কর্ম' এবং 'পরজন্ম' সংক্রান্ত তত্ত্বটি ছিল বেশ বিপ্লবাত্মক। কারণ এর দ্বারা নাকচ হয় জন্মগত শ্রেষ্ঠত্ব-সংক্রান্ত সকল তত্ত্ব। জন্মগত শ্রেষ্ঠত্ব বলে কিছু নেই; সকলেই সবকিছু হতে পারে, সবটাই নির্ভর করছে তার 'কর্মে'র উপর।[২৬] স্পষ্টতঃ ই, বুদ্ধের এই তত্ত্ব ছিল মানুষকে তাঁর ঐ noble

২৫. "This most important religion (অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম) was but one of several very similar movements that arose in Magadha at about the same time. Of these Jainism survives in India to this day for the same reasons that prevented its spread outside the country. That is, it soon came to terms with caste and ritual, as Buddhism did not." (ঐ; পৃ ১৫৫)

২৬. লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, 'কর্মে'র এ তত্ত্ব কৌম-বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে বুদ্ধের অবস্থানেরই আরেকটি অভিপ্রকাশ। 'কর্মে'র তত্ত্ব মানুষের সর্বজনীনতার এক জোরালো স্বীকৃতি হিসেবে আবির্ভূত হয়। কৌম, বর্ণ ইত্যাদি কোন কিছুই কোন অনতিক্রম্য বাধা নয়। মানুষ জন্মলাভ করতে পারে যে কোন কৌমে, স্থানে; সবটাই নির্ভর করছে কেবল তার কর্মের উপর। কোসাম্বী বিষয়টি চমৎকারভাবে প্রকাশ করেন নিম্নরূপে:

"...The new ideology was equally against tribal exclusiveness. Because of good or evil *Karma*, a living creature would be reborn; not into a special totem but into any species particularly suited to and measured by the action, from the vilest insect to a god. Indra was as subject to *Karma* as an earthworm. Evil deeds would ultimately cause the fall of Indra from the world of gods, ultimately to become an animal; the insect could by good,

www.pathagar.com

eightfold path [২৭]-অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। যখন এই সঠিক পথ অনুসরণ হবে সম্পূর্ণ নির্মল, ত্রুটিহীন, তখনই কেবল 'আত্মা' লাভ করবে 'নির্বাণ'। তা না হওয়া পর্যন্ত পূর্বজন্মের কর্মফল-অনুধায়ী মানুষ জন্মলাভ করতে থাকে বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন সামাজিক পরিচয়ে। এভাবেই বুদ্ধ মেলানোর চেষ্টা করেন বর্ণ-বিভক্তি অস্বীকারের সঙ্গে প্রকৃত সামাজিক বিভিন্নতার বাস্তবতা।

সেজন্য যদিও কালের তুলনায় বুদ্ধের মতবাদগুলো ছিল নিঃসন্দেহে খুবই অগ্রসর, কিন্তু ঠিক একই কারণে এক অর্থে তার মধ্যে ছিল কিছুটা ইউটোপীয়ার উপাদানও। বস্তুতই, কোসাম্বী যেটা উল্লেখ করেন যে, বৌদ্ধধর্ম (যদি এটাকে সে অর্থে ধর্ম বলা চলে) ছিল কোন ব্যক্তিসত্তা-সম্পন্ন সর্বক্ষমতাধর ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসহীন সর্বাধিক সামাজিক ন্যায়-সম্পন্ন ধর্ম।[২৮] কোসাম্বী যেটা আরও লক্ষ্য করেন যে, সম্পূর্ণ শ্রেণীহীন সমাজের যে ধারণা, তার জন্য প্রয়োজন ছিল আরও বহুমাত্রার উঁচু উৎপাদিকা শক্তি; ষষ্ঠ শতাব্দীর অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের উৎপাদনের ভিত্তিতে এই চিন্তায় উপনীত হওয়া সম্ভব ছিল না। সেজন্য যদিও পরবর্তীকালে বৌদ্ধ শ্রমণেরা হয় স্বীয় বর্ণ-বর্জনকারী, কিন্তু বৃহত্তর সমাজের বর্ণ এবং শ্রেণী-বিভক্তি তাদের মেনে নিতেই হয়।[২৯]

---

deeds in successive births, be reborn to human and then to divine estate, though even that did not free him from the power of his further *Karma.*" (ঐ ; পৃ ১৫৮-৯)

কোসাম্বী অবশ্য বিষয়টিকে আরও অগ্রসর করে নিয়ে মন্তব্য করেন যে, "*Karma* therefore was a religious extension of an elementary concept of abstract value, independent of the individual, caste, or tribe. It could grow and ripen like a seed planted in the previous season, or mature like a debt, while it never failed to pay in exact proportion." (ঐ ; পৃ ১৫৯)

২৭. এই noble eightfold path হচ্ছে : "Proper activity of the body (avoidance of taking life, of stealing, of fornication); proper speech (truthfulness, not carrying tales, no cursing or vituperation, avoidance of idle chatter); proper vision and proper thought (not hankering after the wealth of others, absence of hatred, belief in rebirth as fruit of good and evil deeds ; ... rightful mode of gaining livelihood, proper exertion, self-control, and cultivation of proper thoughts." (ঐ ; পৃ ১৫৬)

২৮. "This was the most active as well as the most social of creeds, without belief in a personal all- powerful God or ritual of any sort." (ঐ; পৃ ১৫৬)

২৯. এ প্রসঙ্গে কোসাম্বীর নিম্নরূপ আলোচনাটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক :

"None of the sects fought to abolish all castes from society even though the *sramana* himself renounced caste, Though the Buddhist monastic order functioned along the lines of a tribal *sabha* council, the Buddhist precepts were meant for a class society far beyond the tribe, caste or cult. It must be kept in mind that we are in the presence of the FIRST society divided into classes, linked indissolubly to a new form of production which could not be abolished without increasing that very misery of all human existence which is a recurrent theme of discourse. A famous *gatha* gave the essence of Buddhism as showing the cause of those phenomenon that arise from a cause, and its negation. That all causation implies negation is the first step in dialectic. Advance to a higher level (by 'the negation of negation') necessitated far greater progress through more productive types of society than could have been visualised with the rudimentary productive mechanism of the 6th century B.C. The Buddhist

www.pathagar.com

আপাতঃদৃষ্টিতে ধর্মের আলোচনা আমাদেরকে বেশ দূরে নিয়ে এসেছে। আমাদের মূল প্রসঙ্গটা ছিল কৌম থেকে এলাকাভিত্তিক সমাজ-প্রতিষ্ঠার প্রতিক্রিয়ায় মতাদর্শ-গতভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং নতুন ধর্মমতসমূহের বিপরীত ভূমিকার বিষয়টি আলোনচা করা। যে বিষয়টি আমরা এখানে লক্ষ্য করতে চাইছি তা হলো এই যে, এই বৈপরীত্য-রেখাটি অত সরল প্রকৃতির ছিল না। এখানে আমরা যেটা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করলাম তা হলো এই যে, বৌদ্ধধর্মের বর্ণ-বিভক্তি-অস্বীকৃতি যথেষ্ট প্রাবল্য নিয়ে আবির্ভূত হলেও, ভারতবর্ষীয় এলাকাভিত্তিক সমাজের ব্যাকরণটি তা নির্ধারণ করতে পারে নি। এই সমাজটি শেষ পর্যন্ত গড়ে ওঠে ঐ ব্রাহ্মণ্যবাদের চার বর্ণ-ধারাতেই।[৩০] কৌম যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং যজ্ঞ আঁকড়ে থাকা ব্রাহ্মণ্যবাদের জন্য এটাও একটা লক্ষণীয় কূটাভাস বৈকি!

সবশেষে এ প্রসঙ্গে যে-বিষয়টি লক্ষ্য করতে হয় তা হলো এই যে, নতুন ধর্মপ্রচারকদের একটা বড় অংশ উদ্ভূত হয়েছিলেন কৌম-ক্ষত্রিয়দের মধ্যে থেকে।[৩১] বুদ্ধের কৌমের

---

nirvana now appears to a casual reader like complete annihilation. When first propounded, it was a negation, return of the individual to the signless, undifferentiated state. The condition was to be achieved only by cumulative perfection in successive rebirths, till the personality was freed by its own efforts from subjection to *karma*, the necessity of transmigration, The memory of a classless, undifferentiated society remained as the legend of a golden age ... when the good earth spontaneously produced ample food without labour because men had neither property nor greed. The transfer from individual tc collective, social, cumulative effort, the return of society as a whole to a classless state, on a far higher level of production which would satisfy everyone's needs with as little human effort as the silent forces of nature—this was not visualized till the last century." (ঐ; পৃ ১৬১-২)। বৌদ্ধধর্ম-বিষয়ক কোসাম্বীর এই সব বিশ্লেষণ (পূর্বোল্লিখিত কর্মের সঙ্গে বিমূর্ত মূল্যের সম্পর্কস্থাপন) কিছুটা সুদূরপ্রসারী মনে হওয়া খুব বিচিত্র নয়। পাশাপাশি লক্ষ্য করা দরকার যে, এ বিষয়ে কোসাম্বীর আলোচনায় একটি অসঙ্গতির দিকও কেউ উত্থাপন করতে পারেন। সেটা হলো এই যে, একদিকে আমরা জানতে পারছি যে, যেহেতু বৌদ্ধধর্ম বর্ণপ্রথাকে অস্বীকার করেছিল, সেজন্য পৃথিবীর অন্যত্র তা বেশ প্রসারিত এবং বিস্তৃত হতে পারলেও ভারতে শেষ পর্যন্ত তা হতে পারেনি। কিন্তু অন্যদিকে আবার আমরা লক্ষ্য করি যে, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মকেও শেষ পর্যন্ত বৃহত্তর সমাজে বিদ্যমান বর্ণ-বিভক্তিকে মেনে নিতে হয়েছিল। বলা দরকার যে, ঘটনার এই দুটি দিকই সঠিক। দৃশ্যমান অসঙ্গতির প্রকৃত ব্যাখ্যাটি সম্ভবত ঘটনাপ্রবাহের আরও জটিলতার মধ্যে নিহিত। ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারেনি, কারণ পরিস্থিতির উপযোগী এর উপাদানগুলো পরবর্তীকালে বহুলাংশে অধিগৃহীত হয়ে গিয়েছিল ব্রাহ্মণ্যবাদের বিবর্তিত রূপ 'হিন্দুধর্মে'র মধ্যে। এভাবেই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের ঐতিহাসিক আর্থ-সামাজিক ভূমিকাটি বাস্তবায়িত হয় এবং নিঃসারিত হয়।

৩০. পরবর্তীকালে বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে নতুন ধর্মমত, বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন তত্ত্বের এক সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হয় হিন্দুধর্ম; সেজন্য কোসাম্বী মন্তব্য করেন যে "There is no point in arguing they (নতুন ধর্মমত প্রচারকগণ) were Hindu or not; Hinduism came into existence, with the indelible stamp of these sects, only when they had faded many centuries later." (ঐ; পৃ ১৫৭)

৩১. "The Buddhist and Jain monastic orders were modelled upon...tribal constitutions, quite naturally, seeing that the Buddha came from the tribal Sakyans, the Jain founder Mahavira from tribal Licchavis." (ঐ; পৃ ১২৮)

www.pathagar.com

সুবিদিত নাম শাক্য এবং মহাবীর ছিলেন পূর্বোল্লিখিত লিচ্ছবি কৌম থেকে আগত। কোসাম্বী অবশ্য মন্তব্য করেন যে, এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, কৌম উপনীত হয়েছিল ভাঙনের মুখে এবং তা আর বিকাশের জন্য সুপরিসর বলে অনুভূত হচ্ছিল না।[৩২] এ সত্ত্বেও বিষয়টি একটু পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

শাক্য কৌম সম্পর্কে আমরা অন্যত্র যেমন জানি যে, এটা ছিল মূলতঃ অপ্রধান ক্ষত্রিয়দের কৌম, যারা নিজেরাই কিছু চাষ-বাসও করতো ; রাজা নির্বাচনের প্রথা তখনও তাদের মধ্যে ছিল প্রচলিত।[৩৩] অন্যদিকে মহাবীরের কৌম লিচ্ছবি সম্পর্কে আমরা জেনেছি আগেই। এগুলো হলো সেইসব কৌম, যেগুলো, কোসাম্বীর আগের শ্রেণীকরণ অনুযায়ী, ব্রাহ্মণ্য সংগ কর্তৃক তখনও পরিব্যাপ্ত হয়নি (ঐ ; পৃ ১২৮)। এখন প্রশ্ন হলো, তাই যদি হয়, তাহলে কেন ব্রাহ্মণ্য আচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদসম্পন্ন ধর্মমতসমূহ এসব কৌম থেকেই মূলতঃ উদ্ভূত হলো ? প্রশ্নটি বোধকরি কিছুটা আলোচনার দাবী করতে পারে।[৩৪] কেননা যেসব কৌম ছিল এসব আচারাদি কর্তৃক আক্রান্ত, ব্রাহ্মণ্য আচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কি সেসব কৌম থেকেই ধ্বনিত হওয়া বেশি স্বাভাবিক ছিল না ?

যাহোক, মনোযোগী পাঠক লক্ষ্য করতে পারবেন যে, এ গোটা আলোচনাটির মধ্যে কতক অসঙ্গতি এবং স্ববিরোধিতামূলক উপাদান থেকে গেছে।[৩৫] কিন্তু মূল যেটা এখানে লক্ষ্য করার বিষয় তা হলো এই যে, কৌম ভেঙে এলাকা ভিত্তিক সমাজ-গঠনের প্রতিক্রিয়াটি বাস্তব আর্থ-সামাজিক কাঠামোর দিক থেকে ছিল যেমন জটিল, মতাদর্শগত ক্ষেত্রেও তা ছিল একইরকম জটিল। ব্রাহ্মণ্যবাদ আর নতুন ধর্মমতের পরস্পর বৈপরীত্যমূলক এসব বৈশিষ্ট্য বস্তুত এ জটিলতার পরিচায়ক।[৩৬]

---

৩২. "The great religious teachers arose from tribal Ksatriyas at the same time in the same place, among a host of other founders of similar sects...This very fact shows that the tribe had reached a state of desintegration. Society had to be reorganised on a basis that tribal life could not furnish; a philosophy and religion (as distinct from ritual) —a superstructure in short—beyond that of the tribe was needed by the most advanced elements to cement the various components together." (ঐ; পৃ ১২১)

৩৩. "The Buddha's own people, the Sakyans, were a small tribe just beyond the present Nepal frontier. The Sakyans were otherwise left (প্রসেনজিৎ কর্তৃক) to their own devices, as petty Ksatryas who did not disdain to set their hands to the plough. Their king was a chieftain elected from the leading families in rotation for an unspecified term." (ঐ ; পৃ ১৪৪)

৩৪. এদিকে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে. সাধারণভাবে কৌম-বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে হলেও কৌম-গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন বুদ্ধ। আগেই লক্ষ্য করেছি যে, বৌদ্ধ সংঘসমূহ গঠিত হয়েছিল সাংগঠনিক কাঠামোর দিক থেকে কৌমসভার অনুকরণে। অন্যদিকে আমরা আরও জানতে পারি যে, "The Licchavis received high praise from the Buddha as he walked northwards on his last journey. The great teacher predicted that as long as Licchavis held to their tribal institutions, they would be matchless—and so they were." (ঐ; পৃ ১২৮)

৩৫. এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ইসলাম, ১৯৮৫।

৩৬. খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে আলেকজান্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন দেখা যায় যে, তাকে বিশেষভাবে রুদ্ধ হতে হয়েছিল ব্রাহ্মণদের প্রতি। সুবিদিত যে, পূর্বাঞ্চল, অর্থাৎ গাঙ্গেয় উপত্যকার

www.pathagar.com

৬. মৌর্য-আমলের অর্থনীতি এবং 'অর্থশাস্ত্রে'র বিবরণ

নন্দ আমলে মগধের বিজয় নিরংকুশ হয়ে উঠলেও সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী এই নিখিল রাজতন্ত্রের বিস্তার সংঘটিত হয়, বলা বাহুল্য, মৌর্য আমলে। আর যাকে আমরা আখ্যায়িত করছি ভারতবর্ষীয় গ্রামের প্রথম সংস্করণ বলে, তার পত্তনও ঘটে এই আমলেই।

সম্রাট অশোকের বক্তব্য তিনি নিজেই উৎকীর্ণ করে গেছেন তাঁর অনন্য শিলালিপি-সমূহে ; সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার জন্য (পাঠোদ্ধার হওয়ার পর) ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা অশোকের এইসব শিলালিপি এক অমূল্য উৎস। আর প্রাক-মৌর্য আমলের ঘটনাবলী জানার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে তথ্য-উৎস, তা হলো, বলা বাহুল্য, 'অর্থশাস্ত্র'।

সুবিদিত যে, 'অর্থশাস্ত্রে'র প্রামাণিকতা নিয়ে একটি বিতর্ক বিদ্যমান।[৩৭] কেউ কেউ একটা অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, 'অর্থশাস্ত্র' আসলে মেসোপটেমীয় উৎসের/সূত্রের। অর্থাৎ, 'অর্থশাস্ত্রে'র বিবরণ যতটা না ভারতবর্ষীয় ঘটনাবলী-সঞ্জাত, তার চেয়েও তা বেশী 'আমদানিকৃত' ; অর্থাৎ মেসোপটেমীয় আচারের পুনর্লিখন। 'অর্থশাস্ত্রে'র প্রামাণিকতার বিষয়ে দ্বিতীয় আরেকটি প্রসংগ হলো এর সময়কালের প্রশ্ন অর্থাৎ, রচনাটি প্রাক-মৌর্য কি-না। বিশেষতঃ এ শেষোক্ত দৃষ্টি-কোণ থেকে 'অর্থশাস্ত্রে'র প্রমাণিকতা পরীক্ষার জন্য পুরো একটি অনুচ্ছেদ ব্যয় করেন কোসাম্বী। বিস্তৃত এই পরীক্ষাশেষে যে অভিমতে তিনি উপনীত হন, তা হলো এই যে, 'অর্থশাস্ত্রে'র প্রামাণিকতা, বিশেষত তা যে প্রাক-মৌর্য আমলের রচনা, সে বিষয়ে বিশেষ কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।[৩৮] ধারণা করা হয়ে থাকে যে, মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মুখ্যমন্ত্রী কৌটিল্য পূর্ববর্তী আমলের শাসন ব্যবস্থার অভিজ্ঞতার আলোকে রচনাটি লিপিবদ্ধ করেন। বস্তুত বইটির শুরুতে এর উদ্দেশ্য

তুলনায় পাঞ্জাবে তখনও ঢের সংরক্ষিত হয়েছিল বেদ-আমলের জীবনযাত্রা—পশুপালন-অর্থনীতি, কৌম সংগঠন ইত্যাদি। বিচ্ছিন্ন কৌমের প্রতিরোধ এক-এক করে বিচূর্ণ করা ছিল সহজ; কিন্তু এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের দেখা যায় বিপজ্জনক ভূমিকায়; তারা চেষ্টা করে কৌমসমূহের প্রতিরোধ সমন্বিত করতে। "Nor was he (Alexander) less incommoded by the Indian philosophers who inveighed against those princes who joined his party and solicited the free nations to oppose him. He took several of these also and caused them to be hanged." প্লুটার্কের *Alexander* গ্রন্থ থেকে এই উদ্ধৃতি দিয়ে কোসাম্বী মন্তব্য করেন যে, "Here, philosophers means brahmins, not the ascetics with whom they were regularly classed. The brahmin, for all that has deservedly been said against him for promoting the superstition upon which he fed, was a link between tribes, the one class that might think of a society beyond the tribe." (কোসাম্বী, ১৯৫৬; পৃ. ১৮১)। কাজেই এখানে আবার দেখি কোসাম্বী ব্রাহ্মণদের আখ্যায়িত করেছেন কৌমসমূহের মধ্যে সংযোগকারী হিসাবে, যারা কৌম অতিক্রমকারী একটা সমাজ সম্পর্কে ভাবতে সক্ষম ছিল। এটাও ঐ আপাত-বৈপরীত্যের জটিলতার স্বাক্ষরেরই আরেকটি স্বীকৃতি।

৩৭. "The authenticity of this extraordinray and still difficult book has been doubted with unusually acrid, even rabid polemic." (ঐ; পৃ. ১১১)

৩৮. "It cannot be denied that there may be brief later interpolations in the *Arthasastra*, to bring it up to date in small details, just as a good deal of the work rests solidly

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা করে লেখাও হয় যে, "Having gathered together all the diverse *arthasastras* composed by former magistri (*acarya*), for the purpose of gaining (rule over) the whole earth and maintaining it, this single *arthasastra* has been composed." উদ্ধৃত, in Kosambi, 1956; p 204) রচনাটির সংকলন-ধর্মীতা এবং প্রাক-মৌর্য চরিত্র, উভয়ই এই উক্তিতে স্পষ্ট।[৩৯]

সুবিদিত যে, 'অর্থশাস্ত্র' রচনাটি অনেকগুলো পুস্তকে (অংশ অথবা পর্বে) বিভক্ত। তার মধ্যে আমাদের আলোচনার জন্য প্রথম পাঁচটিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ পাঁচটি পুস্তকে আমরা পাই বিভিন্ন জনপদ-এককে বিভক্ত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের বিস্তৃত বিবরণ। পরবর্তী পুস্তকসমূহের উপজীব্য হলো রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের উপায় এবং পথ-পদ্ধতি।

শেষোক্ত বিষয়ে 'অর্থশাস্ত্রে'র যে সমস্ত সুপারিশ পাওয়া যায় (Arth. 11. 1), তার বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে আমরা অবহিত হয়েছি আগেই। লিচ্ছবি কৌম বিনষ্ট করে দেওয়ার জন্য অজাতশত্রু প্রয়োগ করেছিলেন যে পদ্ধতি (ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ভাস্করকে কৌশলে প্রেরণ এবং অতঃপর তাঁর মাধ্যমে কৌমের অভ্যন্তরে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বীজ বপন ইত্যাদি), 'অর্থশাস্ত্রে' আমরা লক্ষ্য করি তারই সাধারণীকরণ। শুধু তাই নয়, এখানে পাওয়া যায় বরং আরও হীন কার্যকলাপের সুপারিশ। অন্যদিকে 'অর্থশাস্ত্রে'র এই বিবরণেই আমরা পাই একচ্ছত্র শাসকের নিরংকুশ আধিপত্যের পথে লিচ্ছবি, বৃজ্জি মল্ল, মদ্র, কুকুরা, কুরু, পঞ্চাল, ইত্যাদি oligarch-কৌমের নাম ধরে উল্লেখ। বস্তুত এটা ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীরই প্রতিফলন এবং তা পুনরায় 'অর্থশাস্ত্রে'র প্রাক্-মৌর্য চরিত্রেরই সাক্ষ্য বহন করে।[৪০] 'অর্থশাস্ত্রে'র রাষ্ট্র-বিস্তারের এইসব সুপারিশকৃত পথ-পদ্ধতি আরও প্রমাণ করে যে-'অর্থশাস্ত্র'-রচয়িতাকে কোন ন্যায়-নীতির প্রশ্ন বিব্রত করেনি। নিরেট স্বার্থ এবং সম্ভাব্য যে-কোন উপায়ে সেই স্বার্থ চরিতার্থ

---

upon previous administrative practice, and a theory of statecraft which can only be pre-Mauryan. (ঐ; পৃ ২০২)

৩৯. বস্তুত 'অর্থশাস্ত্রে'র যে কিছু আপাত-মিল আছে মেসোপটেমীয়, বিশেষত হাম্মুরাবী অনুশাসনের সঙ্গে, সে বিষয়টি লক্ষ্য করেন কোসাম্বীও: "In its endless regulations, the *Arth.* has the guise of a supercode, like that of Hammurabi, but with one crucial difference, Whereas the rules given in the Mesopotamian law-book were due to the need to uniformize transactions between traders or property-owners, here the state was itself the greatest single entrepreneur, anxious to preserve its basic monopoly." (ঐ; পৃ ১০৬)

৪০. "The specific tribal names show that the particular tribes had been formidable and their survivors were still potentially dangerous. This is comprehensible for an early Mauryan document (but for no later age), in the light of the purana report that Mahapadma Nanda (just before the Mauryans) had destroyed the last of these traditional ksatriya tribes." (ঐ; পৃ ২০৪)

www.pathagar.com

করা—এটাই থেকে গেছে 'অর্থশাস্ত্রে'র প্রকাশ্য দর্শন।[৪১] সে দৃষ্টিকোণ থেকেও পরবর্তীকালের মধ্যযুগীয় যে-কোন রচনা থেকে 'অর্থশাস্ত্রে'র পার্থক্য স্পষ্ট। কারণ মধ্যযুগের এ জাতীয় রচনা বিষয়গতভাবে যতই প্রতিক্রিয়াশীল হোক না কেন, আপাতভাবে তা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হতো কতক নীতির ভিত্তিতে। 'অর্থশাস্ত্রে' আমরা সেরূপ কোন প্রচেষ্টা দেখি না।

যাহোক, আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বেশী আগ্রহোদ্দীপক হলো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক বন্দোবস্ত সম্পর্কে 'অর্থশাস্ত্রে'র বিবরণ। 'অর্থশাস্ত্রে' বস্তুত পাওয়া যায় এ সম্পর্কিত যথেষ্ট বিস্তৃত বিবরণ।[৪২]

'অর্থশাস্ত্রে' যে-অর্থনীতির বিবরণ আমরা পাই সেটা হলো একটা পণ্য-অর্থনীতির। আর এই পণ্য-অর্থনীতির অন্য পরিচায়ক হলো, বলা বাহুল্য, মুদ্রার প্রচলন-সম্পন্ন অথবা মুদ্রা-অর্থনীতি। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পুরোহিত, সেনাপতি, রাজ-মাতা, রানী থেকে রাজকুমার, সকল রাজকর্মচারী থেকে শূদ্র করে ভিস্তি পর্যন্ত, সকলের ছিল মুদ্রায় নির্দিষ্ট বেতন। কিন্তু পণ্য-অর্থনীতি হওয়া সত্ত্বেও 'অর্থশাস্ত্রী'র অর্থনীতির এই পণ্য-উৎপাদক এবং নিয়ন্ত্রক ছিল রাষ্ট্র নিজে। রাষ্ট্র নিজেই ছিল সবচেয়ে বড় বণিক।[৪৩] বস্তুত, খুবই কুটাভাসমূলক হলেও বলা যায় যে, 'অর্থশাস্ত্রে'র নিকট ব্যক্তি বণিক ছিল একটি অনভিপ্রেত চরিত্র। বণিককে আখ্যায়িত করা হয় 'কণ্টক' বলে, জনস্বার্থ-বিরোধী, বস্তুত শত্রু হিসাবে।[৪৪] অর্থনৈতিক উদ্যোক্তা ছিল রাষ্ট্র নিজে ; বিশেষ বিশেষ পণ্যের উপর ছিল রাষ্ট্রের একাধিপত্য ; এরমধ্যে অন্যতম ছিল খনি-শিল্প। সব ধরনের ধাতব দ্রব্য, আকর থেকে চূড়ান্ত পণ্য, সমস্তটাই ছিল রাষ্ট্রীয় একাধিপত্যের অন্তর্গত। সমস্ত অর্থনীতিটাই ছিল কড়া রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন। রাষ্ট্রীয় একাধিপত্যের বাইরে যেসব পণ্য, সেসবের বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ছিল পূর্ণ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। পণ্যের দাম এবং মান উভয়ই ছিল রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এমনকি পতিতাবৃত্তি নিয়েও ছিল রাষ্ট্রের পৃথক মন্ত্রণালয় (যাতে এর থেকে রাষ্ট্রীয় আয় যথাযথভাবে আদায় হতে পারে)!

---

৪১. "Material gain (*artha*) alone is the principal aim...for morality (*dharma*) and pleasures of the senses (*kama*) are both rooted in material gain (*arthamula*) (*Arthasastra*, উদ্ধৃতি, ঐ; পৃ. ২০৫)

৪২. "The Mauryan administration before Asoka is described in the *Arthasastra* of Kautalya (incorrectly Kautilya), otherwise known as Canakya and Visnugupta, traditionally a great minister of Chandragupta Maurya." (ঐ; পৃ ১১১)

৪৩. "The Society In which the book (অর্থশাস্ত্র) was written engaged in large-scale commodity production and trade over long distances. However, the work does not describe a state of the commodity producers. The reason was that the king, as the successor to chiefs of many different tribes, and as the recipient of great revenues in kind from harvested grain and from local manufacture, had to convert a substantial part of these grains into commodities to pay the army and bureaucracy. The state, therefore, was itself the greatest trader, the supreme monopolist." (ঐ; পৃ ২০৫-৬)

৪৪. "While it (রাষ্ট্র) liquidated all tribal customs that had become hindrances to commodity production, it looked upon the private trader with utmost suspicion. The

www.pathagar.com

স্বাভাবিকভাবেই এরূপ একটি অর্থনীতি পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল বিপুল প্রশাসনিক কাঠামোর। অত্যন্ত নিচু পর্যন্ত নিয়োজিত ছিল গোপ-নিবন্ধক, যার দায়িত্ব ছিল স্বীয় এলাকার জমি, ফসল, সকল ধরনের অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য, খাজনা, গবাদি পশু ইত্যাদি সকল বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা। শুধু তাই নয়, গোপদের আরও দায়িত্ব ছিল এলাকার সকল অধিবাসী সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য রাখা—তাদের পেশা, চরিত্র, তাদের আয়, ব্যয় ইত্যাদি সকল বিষয় সম্পর্কে। নিবন্ধের (তথ্য এবং হিসাবপত্র রাখার) এই অতি বিস্তারিত আয়োজনের পাশাপাশি ছিল আবার গুপ্তচরবৃত্তির বন্দোবস্ত। গুপ্তচরদের দায়িত্ব ছিল নিবন্ধকের কাজের সত্যতা পরীক্ষা করা, বণিকদের আচরণের উপর দৃষ্টি রাখা, লোকজনের আগমন এবং নির্গমনের কারণ অনুসন্ধান করা, অবাঞ্ছিত লোকজনের গতিবিধি লক্ষ্য করা ইত্যাদি।

৭. সীতা-কর্ষণ এবং ভারতীয় গ্রামের প্রথম সংস্করণ

সুতরাং, এই সামান্য বিবরণ থেকেই ধারণা করা যেতে পারে 'অর্থশাস্ত্রী'য় রাষ্ট্রের ব্যাপ্তি ও পরিধির এবং তার কার্যপ্রণালী। এহেন রাষ্ট্রের অধীনেই সংঘটিত হয় প্রথম সংস্করণের ভারতবর্ষীয় গ্রামপত্তনের ঘটনা।

কোসাম্বী লক্ষ্য করেন যে, "The Arthasastra (was)···mainly preoccupied with the exploitation of sita state-land" (ঐ; পৃ ২০০) বস্তুত 'অর্থশাস্ত্রী'য় রাষ্ট্রের অধীন যে এলাকা, সাধারণভাবে তাকে দুইভাগে বিভক্ত করা সম্ভব। একটি হলো পুরানো জনপদ এলাকাসমূহ।[৪৫] আর দ্বিতীয় হলো এই sita land, অথবা যাকে কোসাম্বী অন্যরা অভিহিত করেন crown land বলে। পুরাতন জনপদভিত্তিক 'পৌরজনপদ' ছিল রাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রভাবশালী শ্রেণী। সম্রাটকে তার দিনের সময়ের এক অষ্টমাংশ রেখে দিতে হতো বিশেষ এই পৌরজনপদ-শ্রেণীর লোকজনের বিষয়াদি বিবেচনা/নিষ্পত্তির জন্য। জনগণের জন্য তাদের মধ্যে থেকে মন্ত্রী-নিয়োগেরও সুস্পষ্ট বিধান ছিল।[৪৬] আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, আক্ষরিকভাবে 'জনপদ' কথাটির অর্থ হলো, 'the locality of a tribe' (jana); আর যেহেতু প্রত্যেক tribe-এরই

---

merchant is along with the artisan, guild-actor (*kusilava*), beggar, and sleight-of hand juggler, listed among the 'thieves that are not called by the name of thief.' (*Arth.* 4. 1) and treated accordingly." (Arth. 4. 1) অথবা "The private trader was regarded as a thorn (*kantaka*), a public enemy just short of national calamity by Arth. 4. 2 taxed and fined for malpractices of whlch many are taken for granted." (ঐ; পৃ ২০৭)

৪৫. "The older lands developed from various former tribal territories, each with a headquarter city, counted as the *rastra* of the *paura-janapadass*, with lighter taxes, formerly paid to the chief now replaced by the emperor." (ঐ; পৃ ২১৭)

৪৬. এই সূত্রে কোসাম্বী অভিমত প্রকাশ করেন যে, "This indicates that every *janapada* administrative unit had its own board or council of ministers, as reported by Megasthenes." (ঐ; পৃ ২১৩)

www.pathagar.com

একটা কেন্দ্রস্থল ছিল, যে কেন্দ্রস্থল থেকেই শহরের (paura) সূচনা, সুতরাং এই সূত্রে paura-janapada অভিপ্রকাশটির উদ্ভব। তবে কোসাম্বী ব্যাখ্যা করেন যে, পৌরজনপদ বলতে কেবল ঐরূপ 'শহর'বাসীকেই বোঝাতো না, বরং এটা বোঝাতো তাদের, যারা ছিল অবস্থাপন্ন এবং যাদের তখনও কৌমের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক অনুসারী ও প্রভাব ছিল। ফলে রাষ্ট্রের আপেক্ষিকে তাদের ছিল বিশেষ মর্যাদা এবং জনমত বলতে বোঝাত কেবল তাদেরই মত।[৪৭] কোসাম্বীর মতে, পৌরজনপদ নামীয় এই প্রভাবশালী শ্রেণীর আয়ের উৎস ছিল দুটি। তাদের মধ্যে যারা শহরবাসী, তারা জড়িত ছিল বাণিজ্য এবং (হস্ত-) শিল্পোৎপাদনের সঙ্গে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্যে এটা ছিল জমিতে উৎপাদিত উদ্বৃত্তের আত্মসাৎকরণ।

এই আত্মসাৎকরণটি বিশেষভাবে সম্ভব ছিল 'অর্থশাস্ত্রী'য় রাষ্ট্রে খাজনা-ব্যবস্থার তাৎপর্যপূর্ণ এক দ্বৈতের কারণে। পুরানো জনপদসমূহকে খাজনা দিতে হতো রাষ্ট্র-পরিকল্পনার অধীনে। এই ব্যবস্থা-অনুযায়ী খাজনার হার ছিল ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ। তবে এ ছাড়া আরও ছিল নয় ধরনের কর। অর্থাৎ রাষ্ট্র-পরিকল্পনা-অনুযায়ী মোট করের সংখ্যা ছিল দশ এবং এইসব করের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, কৌম-প্রথাসমূহের প্রভাব তখনও ছিল বেশ অনুভব করার মতো। কৌম ভেঙে গেছে, আবির্ভাব ঘটেছে বৃহৎ পিতৃতান্ত্রিক পরিবার-গোষ্ঠির। এসব গোষ্ঠির প্রধানরাই হলো ঐ 'পৌরজনপদ'-শ্রেণী। পুরানো বিভিন্ন বিধি-ব্যবস্থা এবং প্রথার জের হিসাবে তারা তখনও ছিল গোষ্ঠিভুক্ত সদস্যদের উৎপাদনের উপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণের অধিকারী; ফলে সম্ভাবনা ছিল উদ্বৃত্ত আত্মসাৎকরণের। শুধু তাই নয়, অতঃপর তাদের পক্ষে আরও সম্ভব ছিল এই উদ্বৃত্ত নিয়ে বাণিজ্যে নিয়োজিত হওয়ার।[৪৮]

---

৪৭. কোসাম্বী উল্লেখ করেন 'অর্থশাস্ত্রে'র এই মর্ম উক্তি যে, "If discontented, they could destroy a new ruler" (Arth. 13. 5)। কিন্তু অন্যত্র কোসাম্বী মন্তব্য করেন যে, ("Arthasastra) state had no real class basis beyond the bureaucracy." (ঐ; পৃ ২২৩) তাঁর Ancient India (কোসাম্বী, ১৯৭০) বইতে এই শেষোক্ত তত্ত্ব বেশ জোরের সঙ্গে আনেন কোসাম্বী। কিন্তু এটা কি একটু স্ববিরোধিতামূলক নয়? কারণ অসন্তুষ্ট হলে যদি পৌরজনপদেরা শাসককে উৎখাত করতে সমর্থ ছিল, তাহলে তো বুঝতে হয় যে, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক ছিল তারাই। সেক্ষেত্রে আবার 'অর্থশাস্ত্রীয়' রাষ্ট্রকে আমলাতন্ত্রের ব্যতিরেকে কোনরূপ শ্রেণীভিত্তিহীন বলে আখ্যা দেওয়া যায় কি করে?

৪৮. 'পৌরজনপদ' শ্রেণী সম্পর্কে বিবরণটি কোসাম্বীর নিজের ভাষায় লক্ষ্য করা যেতে পারে: "The paura-janapadas had a recent tribal past. The reader must again be reminded that *janapada* means 'the locality of tribe'. The large patriarchal family groups into which such tribes had split up to form *rastra* territory still preserved many ancient customs in spite of the new agrarian production which had caused the fragmentation. The *janapada* magnate was not a feudal or private landlord, but the head of such a large land. Local custom and group tradition gave him control of surplus produced by the members, with or without the help of sudra helots. But he had begun to trade in this surplus. The profits were converted gradually into his private property and the extent to which the entourage would benefit thereby depended more upon his will than theirs...Such *paura-janapadas* were the upper class in the free 'cities' of Megasthenes and, to a considerable extent, managed their own affairs ; the more so because the local ministers and officials were recruited from amongest them." (কোসাম্বী, ১৯৫৬ ; পৃ ২১৪)।

www.pathagar.com

এছাড়াও, পৌরজনপদ-শ্রেণীর জন্য উদ্বৃত্তের ছিল আরও একটি উৎস। সীতা-এলাকার জন্য করের হার ছিল ফসলের এক-চতুর্থাংশ, কিন্তু অন্যসব কর মিলিয়ে উৎপাদকদের নিকট ফসলের অর্ধেকও অবশিষ্ট থাকতো কিনা সন্দেহ। কাজেই পৌর-জনপদ আর সীতা-এলাকা—দুয়ের মধ্যে করের হারের ক্ষেত্রে এই যে পার্থক্য, উদ্বৃত্তের সন্ধানে অবস্থাবিশেষে সেটারও সুযোগ গ্রহণ করতে সক্ষম ছিল পৌরজনপদ শ্রেণীর সদস্যরা। কিছু অর্ধ-সীতিকাদের অস্তিত্বও অনুমান করা যায় পৌরজনপদের আওতায়। অবশ্য কোসাম্বী যথার্থই লক্ষ্য করেন যে, সীতা জমি-পত্তনের প্রক্রিয়ার পটভূমিতে এদের সংখ্যা তেমন বেশি ছিল বলে মোটেও ধারণা করা যায় না।[৪৯] তবে এইসব ছিটেফোঁটা অর্ধ-সীতিকাদের অর্ধেক ফসল আর রাষ্ট্র-পরিকল্পনার এক-ষষ্ঠাংশ খাজনা—দুয়ের পার্থক্যটুকু আত্মসাৎ করার উপায়টিও ছিল পৌরজনপদের হাতে।

যাহোক আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে 'অর্থশাস্ত্রী'য় রাষ্ট্রের এলাকার যে অংশটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তা এই পৌরজনপদ এলাকা নয়, তা হলো সীতা অথবা রাজকীয় জমি; অন্য ভাষায়, পুরানো এলাকার পরিবর্তে নতুন জনপদসমূহ। এইসব নতুন জন-পদকেই কোসাম্বী আখ্যায়িত করেন 'foundations of Mauryan production' বলে, এবং তা গড়ে ওঠে পূর্বতন অনাবাদী, আরণ্য এলাকাকে প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রাণধীনে আবাদ ও বাসযোগ্য করে তোলার মাধ্যমে।[৫০] রাষ্ট্রীয় এই উদ্যোগের প্রয়োজন ছিল, কারণ পুরাতন জনপদসমূহ থেকে আদায়কৃত কর রাষ্ট্রের প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট ছিল না, এমনকি নতুন যুদ্ধ-জয়ের লক্ষ্যও ছিল বিজিত অঞ্চলে নতুন জনপদের পত্তন ঘটানো।

এই নতুন জনপদের প্রতিষ্ঠান ছিল ভারতবর্ষীয় গ্রামের প্রথম সংস্করণ-প্রবর্তনের পদক্ষেপ। কি ছিল এই প্রক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট রূপ, কোসাম্বীর নিম্নোক্ত বিবরণটিই তা উদ্ঘাটন করে সবচেয়ে চমৎকারভাবে। সেজন্য দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও নিচে বিবরণটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হলো :

"Villages of between a hundred and five hundred families of sudra cultivators were to be formed, with territories between one and two leagues in diameter, settled sufficiently close to each other for mutual protection. The boundaries were carefully drawn by land marks. Administrative units would be of ten, two hundred, four hundred and eight hundred villages; the last

---

লক্ষ্য করা যেতে পারে ভিন্ন প্রসঙ্গে এ সংক্রান্ত একটি বিবরণ আমরা লক্ষ্য করেছি বর্তমান প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদেই।

৪৯. 'To this must be added the fact that the population was not enough to supply more than a few casual ardha-sitikas, especially as the newly opened *sita* lands could be settled on a permanent basis on better terms for the actual cultivator. (ঐ; পৃ ২১৬)

৫০. "Settlement of uncleared waste lands and their direct exploitation under royal officers." (ঐ: পৃ ২১৭)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিলুপ্ত নগর বর্ধনকোট ও মোহাম্মদ বখতিয়ারের তিব্বত-অভিযান

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া*

বর্ধনকোট বা মর্ধনকোট নগরের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মীনহাজ-ই-সিরাজ-রচিত 'তবকাত-ই-নাসিরী' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে। ইখতিয়ার-উদ্-দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর তিব্বত-অভিযানের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন,

"কোচ ও মেচ জাতির প্রধানদের মধ্যে একজন—যিনি আলী মেচ নামে [পরে] পরিচিত হন—মোহাম্মদ বখতিয়ারের হস্তে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং [তিনি মোহাম্মদ বখতিয়ারকে] ঐ পার্বত্য অঞ্চলে নিয়ে যেতে ও পথ প্রদর্শন করতে সম্মত হন।

"মোহাম্মদ বখতিয়ারকে [তিনি] একস্থানে নিয়ে আসেন; সেখানে মর্দানকোট (বর্ধনকোট) নামক এক নগর ছিল। কথিত আছে বহু প্রাচীনকালে শাহ্ গরশ্ আস্প্ [যখন] চীন থেকে প্রত্যাবর্তন করেন ও কামরূদের দিকে আগমন করেন [তখন তিনি] এই নগর স্থাপন করেন।"[১]

প্রাচীন কালের পারস্য সম্রাট শাহ্ গরশ্ আস্প্, শাহ্ গোস্তাবি বা শাহ্ গোদ্ব্জ (এই তিন নামই বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়) এই নগর নির্মাণ করেছিলেন, মীনহাজের এই উক্তি কল্পনাপ্রসূত হলেও বর্ধনকোট[২] কোন কাল্পনিক স্থান ছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন না। এ কারণে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন প্রাচীন স্থানকে এ নামের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। এ সম্বন্ধে একটু পরে মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং এ স্থান যে কাল্পনিক নয়, তাও প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। পরবর্তীকালের ইতিহাসে এই নগর সম্বন্ধে কেন উল্লেখ পাওয়া যায় না, তাও পরে বলা হয়েছে।

---

* আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, বাংলাদেশ সরকার, এবং সভাপতি, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ।

১. মীনহাজ-ই-সিরাজ, 'তবকাত-ই-নাসিরী' (অনুবাদ ও সম্পাদনা : আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, ঢাকা, ১৯৮৩), পৃ. ৩১। মূল ফারসী পাঠ :

یکے از روساے قبائل کوچ و میچ کہ او را علی میچ گفتندی برکت محمد بختیار اسلام آوردہ بود دلالت (وی) راهبری آن
کوه قبول کرده و محمد بختیار را بموضعی آورد که آنجا شهریست بردهن کوت چنان تقریر می کنند که در قدیم العهد گرشا
سپ از زمین چین بازگشت و بر طرف کامرود بیامد آن شهر را بنا کرد .

২. 'তবকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বর্ধন, বর্ধনকোট, মর্ধনকোট, মর্দনকোট, দোরধানকোট বা ওরাধান কোট প্রভৃতি পাঠ পাওয়া যায়। তবে নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপিতে বর্ধন বা বর্ধনকোট পাঠই দেখা যায়। তাতে মনে হয় যে মীনহাজ বর্ধনকোটের কথাই বলেছেন, ফারসী মর্দন কোটের কথা নয়।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ বখতিয়ারের তিব্বত-অভিযান

এ সম্বন্ধে মীনহাজের বর্ণনার সারমর্ম এই যে, 'নওদীহ্' (نوديه) অধিকারের পর মোহাম্মদ বখতিয়ার 'লখনৌতি' শহরে রাজধানী স্থাপন করেন এবং লখনৌতি রাজ্য ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অধিকারের পর প্রায় দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে তিনি তিব্বত-অভিযানে অগ্রসর হন। খুব সম্ভব ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অথবা ১২০৬ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি অভিযান শুরু করেন। কিন্তু তিনি কোন্ স্থান থেকে এই অভিযানে অগ্রসর হন, এ সম্বন্ধে মীনহাজের বর্ণনায় কোন সুস্পষ্ট উল্লেখের অভাবে অনেকের ধারণা, এই অভিযান শুরু হয়েছিল লখনৌতি থেকেই। কিন্তু সেই ব্যর্থ অভিযানে প্রায় সব সৈন্য হারিয়ে মাত্র শ খানেক সৈন্য নিয়ে কোনরকমে দেবকোটে ফিরে আসা এবং সেখানেই মোহাম্মদ বখতিয়ারের মৃত্যুর বর্ণনা থেকে অতি সঙ্গত কারণেই ধারণা করা যায় যে, লখনৌতি নয়, দেবকোটই ছিল তাঁর যাত্রাস্থল এবং সেখানেই ছিল খুব সম্ভব তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী। লখনৌতি রাজ্যে তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী শাসনকর্তা মোহাম্মদ শিরান খলজী ও আলী মর্দান খলজী এবং প্রথম দিকে গোয়াস-উদ্-দীন ইওয়াজ খলজীর রাজধানীও ছিল দেবকোটে।

মোহাম্মদ বখতিয়ারের ব্যর্থ তিব্বত-অভিযানের পর দেবকোটে ফিরে আসার পরের ঘটনাবলী সম্বন্ধে মীনহাজ বলেন, "[মোহাম্মদ বখতিয়ার] দেওকোটে পেঁাছে অত্যধিক মানসিক যন্ত্রণায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। যে সমস্ত খলজী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল, তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের [সঙ্গে সাক্ষাতের] বিশেষ লজ্জায় তিনি অশ্বারোহণে বিরত থাকতেন। যখনই তিনি অশ্বারোহণে নির্গত হতেন সমুদয় লোক [তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক] নারী ও শিশু তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করত ও [তাঁকে] অভিশাপ দিত ও গালিগালাজ করত। ফলে তিনি অশ্বারোহণে নির্গত হতেন না।"[৩]

এই বর্ণনায় দেখা যায় যে, মোহাম্মদ বখতিয়ারের অনুগামী সৈনিকদের পরিবার-পরিজন দেবকোটেই অবস্থানরত ছিল। এই তথ্য থেকে অতি সঙ্গত কারণেই ধারণা করা যায় যে তিব্বত-অভিযানের মানসিক প্রস্তুতি লখনৌতিতে গ্রহণ করা হলেও মোহাম্মদ বখতিয়ার তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী দেবকোট থেকেই সেই অভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং সেখানেই প্রত্যাবর্তন করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। এখানে তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপিত হওয়ার কারণে তাঁর পরবর্তী তিনজন শাসনকর্তাও দেবকোটেই তাঁদের রাজধানী বহাল রেখেছিলেন।

করতোয়া, বেগমতী নদী ও বর্ধনকোট

এ সম্বন্ধে মীনহাজের বর্ণনায় আছে, "এই নগরের (বর্ধনকোটের) সম্মুখ দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত। অসাধারণ বিশালতার দরুন এ নদীকে বাঁকমতী নামে আখ্যায়িত করা হয়। হিন্দুস্তানের মাটিতে যখন এটি প্রবেশ করে তখন এটিকে হিন্দুস্তানী ভাষায় 'সমুন্দর' (সমুদ্র) বলা হয়ে থাকে। বিস্তৃতি, আয়তন [ও গভীরতায়] এটি 'গঙ্গ' (গঙ্গা) নদীর চেয়ে তিনগুণ [বৃহৎ]।

"মোহাম্মদ বখতিয়ার ঐ [নদীর] তীরে উপস্থিত হলেন এবং আলী মেচ মুসলমান সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে ছিলেন। [তিনি] দশদিন ধরে নদীর ঊর্ধ্বমুখে সৈন্যদের চালিয়ে

৩ মীনহাজ-ই-সিরাজ, প. ৪১-৪২।

www.pathagar.com

নিয়ে গেলেন এবং পাহাড়ী অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে যে স্থানে এসে উপস্থিত হলেন সেখানে প্রাচীন কাল থেকে একটি সেতু বিদ্যমান ছিল। প্রস্তর কেটে এ সেতু নির্মিত হয়েছিল এবং তাতে ২০ কি আনুমানিক সেই সংখ্যার খিলান ছিল।"[৪]

'তবকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে এই নদীর বেগমতী (بکمتی), বেগমতী (بنگمتی) **বাকমতী** (بنکمتی), বাকমতী, (بلمتی), বাগমতী, বাগমদী, নাঙ্গমতী, নাগমতী, বেগহাতী প্রভৃতি নাম দেখা যায়। তবে নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপিগুলিতে বাঁকমতী, বাগমত বা বেগমতী নামই পাওয়া যায়। খুব সম্ভব বাঁকমতী বা বেগমতী নামের কোন একটি বা উভয় নামেই নদীটি তখন পরিচিত ছিল। বাংলার ইতিহাস-বর্ণনায় মীনহাজ কোন স্থানের নামকরণ ও অবস্থানের ব্যাপারে কোন মারাত্মক ভুল করেছেন বলে দেখা যায় না। এই নদীর নামকরণেও তিনি ভুল করেছেন বলে মনে হয় না।

অথচ এ নামের কোন নদীর সন্ধান দ্বাদশ শতাব্দী বা পরবর্তীকালে বাংলার উত্তরাঞ্চলে পাওয়া যায়না। অবশ্য নেপালের গ্রণ্ডক (Grandhak) নদীর উপরিভাগ বেগমতী নামে পরিচিত ছিল এবং এখনও আছে বলে জানা যায়। কিন্তু নেপালের সেই নদী দেবকোট থেকে প্রায় ৩২০ কিলোমিটার (প্রায় ২০০ মাইল) উত্তর-পশ্চিমে এবং লখনৌতি থেকে প্রায় ১৫০ মাইল উত্তরে অবস্থিত এবং মোহাম্মদ বখতিয়ারের তিব্বত-অভিযানের সঙ্গে সেই নদী কোনমতেই সম্পৃক্ত হতে পারে না। মীনহাজ-বর্ণিত বেগমতী বা বাঁকমতী নদী দেবকোট থেকে খুব বেশি দূরে ছিল বলে মনে হয় না এবং তা ছিল খুব সম্ভব দেবকোটের উত্তর-পূর্ব দিকে।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই করতোয়া ছিল বাংলার উত্তরাঞ্চলের প্রধান ও সুপ্রসিদ্ধ নদী। মহাভারতের বনপর্বে করতোয়াকে 'পুণ্যতোয়া' নদী বলা হয়েছে। লঘুভারতে এ নদীকে বলা হয়েছে 'বৃহৎপরিসরা পুণ্যা করতোয়া মহানদী'। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর স্বনামধন্য চীনা পরিব্রাজক য়ুয়ান চোয়াঙ-এর বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, সে সময়ে করতোয়া (Ka-lo-tu) ছিল এক বিশালকায়া নদী। আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত 'করতোয়া মাহাত্ম্য' গ্রন্থে এর তীর্থমহিমা ঘোষণা করা হয়েছে। এসব প্রমাণ থেকে সহজেই ধারণা করা যায় যে, করতোয়া ছিল উত্তর বঙ্গের সর্বপ্রধান ও সর্ববিখ্যাত নদী।

আগের কথা সঠিকভাবে বলা না গেলেও গুপ্ত, শশাঙ্ক, পাল ও সেন যুগে এই করতোয়া নদী যে পুণ্ড্র ও কামরূপ (প্রাগজ্যোতিষ) রাজ্য দুটির সীমারেখা নির্দেশ করত, সে সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য প্রমাণের অভাব নেই। পুণ্ড্ররাজ্যের অধিপতিরা অনেক সময়ে কামরূপ রাজ্যে এবং কামরূপের শাসনকর্তারা কোন কোন সময়ে পুণ্ড্র রাজ্যে অধিকার বিস্তার করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এক রাজ্য অন্য রাজ্যের অধিকারভুক্ত হলেও সুবৃহৎ করতোয়া নদী দুই রাজ্যের সীমা নির্দেশ করত।

---

৪. ঐ, পৃ. ৩২। মূল ফারসী পাঠ:

و در پیش آن شهر آبی می رود در غایت عظمت نام او بنگمتی گویند چون بدریا رهندوستان در آید او را
بلغت هندوی سمندر گویند - به بزرگی و سعت (و عمیق) سه چندان گنگ باشد محمد بختیار برلب آن (آب)
آمد و علی میچ در پیش لشکر اسلام شد و مدت ده روز لشکر را بطرف بالا روان کرد در میان کوهها برد تا
بموضعی آورد که از قدیم العهد باز (آنجا) پلی بسته بودند از سنگ تراشیده بایست و اند طاق

www.pathagar.com

মুসলমান আমলের প্রথম দিকেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। মীনহাজের উপরি-উদ্ধৃত বর্ণনা ছাড়াও এই দুই রাজ্যের সীমানা সম্পর্কে মীনহাজের আরও একটি বর্ণনা পাওয়া যায় মোহাম্মদ বখতিয়ারের তিব্বত-অভিযানের প্রায় ৫০ বছর পরে লখনৌতির তুর্কী শাসনকর্তা মালিক ইখতিয়ার-উদ্-দীন ইউজবক তুঘরীল খানের কামরূপ-অভিযানের বর্ণনা-প্রসঙ্গে। সেখানে আছে,

"আয়োদাহ্ (অযোধ্যা) থেকে লাখনৌতি প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কামরূদ (কামরূপ) অভিযানের সংকল্প গ্রহণ করেন এবং বেগমতী (বা বাঁকমতী) নদীর অপর তীরে সৈন্য প্রেরণ করেন। কামরূদের রায়ের প্রতিরোধের ক্ষমতা ছিল না বলে তিনি একদিকে পালিয়ে যান। মালিক ইউজবক কর্তৃক কামরূদ শহর অধিকৃত হয়।"[৫]

এই বর্ণনা থেকে বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয়না যে বেগমতী বা বাঁকমতী বলতে করতোয়াকেই বোঝাচ্ছে এবং এই নদীর বাম তীরবর্তী অঞ্চলে ছিল কামরূপ রাজ্য এবং ডান তীরবর্তী অঞ্চলে ছিল লখনৌতি রাজ্য অর্থাৎ প্রাচীন পুণ্ড্ররাজ্য। খুব সম্ভব মীনহাজের সময়ে প্রাচীন করতোয়া নদী দিনাজপুর-রংপুর অঞ্চলে বেগমতী বা বাঁকমতী নামেই পরিচিত ছিল। সেই ইতিহাস আমাদের জানা নেই বলে তাঁর বর্ণনাকে আমরা খুব সহজে গ্রহণ করতে পারছি না। মীনহাজের ভৌগোলিক বর্ণনায় সাধারণত কোন কল্পিত নাম দেখা যায় না। করতোয়া নদীর এই নামও তিনি কল্পনা করে দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না।

তিব্বত-অভিযানের যাত্রাপথ ও বর্ধনকোটের অবস্থান

মোহাম্মদ বখতিয়ার যে তাঁর বিরাট বাহিনী নিয়ে কোন রাজপথ বা সে-ধরনের কোন প্রশস্ত পথ ধরে তিব্বত-অভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন, তা যুক্তিসঙ্গত কারণেই ধারণা করা যেতে পারে। সেই পথ যে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলে ছিল এবং সেই নদী অতিক্রম না করে তিনি যে নদীর ঊর্ধ্বমুখে অগ্রসর হয়েছিলেন, সেই কথা মীনহাজের বর্ণনায়ই আমরা দেখতে পাই। বর্ধনকোট যে সেই নদীর ডান অর্থাৎ পশ্চিম তীরে ছিল, সেই অনুমান অতি সঙ্গত কারণেই করা যায় এবং মীনহাজের উপরি-উল্লিখিত বর্ণনা সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য করে।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী রংপুর জেলার বর্ধনকুঠিকে বর্ধনকোট বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।[৬] এই বর্ধনকুঠি সাবেক রংপুর জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার অধীনে এবং উপজেলা-সদর থেকে দুই মাইল, করতোয়া নদী থেকে চার মাইল ও দেবকোট থেকে প্রায় ৬০ মাইল পূর্বে অবস্থিত।

---

৫. ঐ, পৃ: ১৬৭-৬৮। মূল ফারসী পাঠ :

چون از اوده به لکهنوتی باز گشت. عزیمت کامرود مصمم گردانید و لشکر از آب بیکمتی بگذرانید و چون رای کا
مرود را طاقت مقاومت نبود بهزیمت بطرف برفت ملک یوزبک را شهر کامرود فتح شد.

৬. N. K. Bhattasali, "Muhammad Bakhtyar's Expedition to Tibet", *Indian Historical Qnarterly*, Vol. IX, p 49.

www.pathagar.com

রেনেলের মানচিত্রে এ স্থানের নাম 'বোরগন কুটি' ('Burgan Cooty')। এ স্থানকে মোটেই প্রাচীন বলা যায় না। এখানে মোঘল আমলের দুটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। আর আছে বর্ধনকুঠির জমিদারদের আবাসবাটি ও বাড়ির সামনে দক্ষিণ দিকে একটি দিঘি। এখানকার প্রাচীনতম মন্দিরগাত্রে যে শিলালিপি আছে, তা থেকে জানা যায় যে (এখানকার জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা) রাজা ভগবান দাস কর্তৃক ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয় মন্দিরটি আরও পরবর্তীকালের।

বর্ধনকুঠি জমিদারির সৃষ্টি হয় মোঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রী)। ক্ষেতলালের জমিদারি বিলুপ্ত হলে এই জমিদারির সৃষ্টি হয় এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল পর্যন্ত এটি ইদ্রাকপুর জমিদারি নামে পরিচিত ছিল। মোঘল আমলের আগে এ স্থানের কোন প্রাধান্য বা বৈশিষ্ট্য ছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধযুগ তো দূরের কথা, সুলতানী আমলেও এ স্থানের কোন প্রাধান্য বা বৈশিষ্ট্য ছিল না। করতোয়ার বাম অর্থাৎ পূর্ব তীরে, নদী থেকে চার মাইল দূরে অবস্থিত এবং মোঘল আমলের এ স্থান যে মীনহাজ-বর্ণিত বর্ধনকোট হতে পারেনা, এ সম্বন্ধে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। অতএব এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনাও অনাবশ্যক।

কোন কোন পণ্ডিত প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন (বর্তমান মহাস্থানগড়) নগরকেও বর্ধনকোট বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। জবাবে শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে, মীনহাজের বর্ণনামতে মোহাম্মদ বখতিয়ার হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত তিব্বত-অভিযানে গিয়েছিলেন, পূর্ববঙ্গে নয়। মহাস্থান দেবকোট থেকে প্রায় ৭০ মাইল পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত এবং দেবকোট বা লখনৌতির উত্তরে অবস্থিত। তিব্বত-অভিযানে অগ্রসর হওয়ার জন্য মহাস্থানে আসার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

দেবকোট থেকে তিব্বতে যেতে হলে দুটি সম্ভাব্য পথের কথা চিন্তা করা যায়। প্রথম পথটি ছিল দেবকোট থেকে প্রায় ১৭ মাইল উত্তরে বর্তমান দিনাজপুর (তখন দিনাজপুর শহরের অস্তিত্ব ছিল না) শহর হয়ে আরও ১২ মাইল উত্তরে প্রাচীন কান্তনগর পর্যন্ত আসা এবং সেখান থেকে উত্তর দিকে অগ্রসর হওয়া। প্রাচীন কান্তনগর ছিল প্রাচীন তিস্তা-আত্রাই নদীর একটি বিশালকায়া প্রবাহ প্রাচীন গর্ভেশ্বরী নদীর ডান তীরে অবস্থিত এবং প্রাচীন পুনর্ভবা নদী ছিল কান্তনগরের কিছু পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত। দেবকোট (প্রাচীন কোটিবর্ষ) থেকে কান্তনগরের মত প্রাচীন নগর পর্যন্ত একটি রাজপথ থাকার কথা। কিন্তু কান্তনগর থেকে উত্তর দিকে কোন সড়ক-যোগাযোগ ছিল কিনা, তথ্যের অভাবে তা বলা সম্ভব নয়।

তেমন কোন সড়ক-যোগাযোগ থাকলেও মীনহাজের বর্ণনাদৃষ্টে মনে হয় যে, মোহাম্মদ বখতিয়ার খুব সম্ভব কান্তনগর হয়ে তিব্বতের দিকে যান নি। তিস্তা-আত্রাই বা তার শাখা নদী মীনহাজ-বর্ণিত বেগমতী (করতোয়া) হতে পারে না। কারণ, সেই বেগমতী বা করতোয়া নদী যে লখনৌতি রাজ্য (প্রাচীন পুণ্ড্ররাজ্য) ও কামরূপের সীমারেখা নির্দেশ করত, তা মীনহাজের বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় এবং এ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। কান্তনগর থেকে করতোয়া বা বেগমতী নদী ছিল আরও প্রায় ২৫ মাইল

www.pathagar.com

পূর্ব দিকে এবং সেই নদীর তীরেই যে বর্ধনকোট ছিল তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

দেবকোট থেকে তিব্বতে যাওয়ার দ্বিতীয় সম্ভাব্য পথটি ছিল দেবকোট থেকে প্রায় ২০ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত চরকাই-বিরামপুর (প্রাচীন পঞ্চনগরী) অথবা দেবকোট থেকে প্রায় ২৫ মাইল পূর্ব-উত্তরে অবস্থিত ফুলবাড়ি হয়ে উত্তর দিকে যাওয়া। দেবকোট (কোটিবর্ষ) থেকে চরকাই-বিরামপুর পর্যন্ত অন্তত গুপ্তযুগ থেকেই যোগাযোগ-ব্যবস্থা থাকার কথা এবং দেবকোট থেকে ফুলবাড়ি নামক প্রাচীন স্থানের সঙ্গেও যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল, তা অনুমান করা যায় ফুলবাড়ির নিকট অবস্থিত দামোদরপুর নামক একটি প্রাচীন স্থানে গুপ্ত সম্রাটদের পাঁচটি তাম্রলিপি-আবিষ্কার ও সে স্থানে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ ও অসংখ্য প্রাচীন জলাশয়ের অস্তিত্ব দেখে এবং সেখান থেকে প্রায় ফুলবাড়ি পর্যন্ত একটি প্রাচীন 'জাঙ্গাল'-এর অস্তিত্ব দেখে।

খুব সম্ভব মোহাম্মদ বখতিয়ার চরকাই-বিরামপুরের ঘোরাপথে পূর্বদিকে না গিয়ে দামোদরপুর-ফুলবাড়ি হয়ে সেখান থেকে উত্তর দিকে তিব্বতের দিকে গিয়েছিলেন এবং ফুলবাড়ি থেকে অগ্রসর হয়েই তিনি বর্ধনকোট পৌঁছেছিলেন আলী মেচের পথ-প্রদর্শনে। রেনেলের মানচিত্রে দেবকোট থেকে সমঝিয়া (পশ্চিম দিনাজপুর, ভারত) নামক স্থান হয়ে দামোদরপুর-ফুলবাড়ি পর্যন্ত একটি রাজপথের অস্তিত্বও দেখা যায়। এপথটি যে আগেও ছিল, সেই সম্ভাবনার কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

দেবকোট থেকে বর্ধনকোটের দূরত্ব খুব বেশি ছিল বলে মীনহাজের বর্ণনা দেখে মনে হয় না। বর্ধনকোট থেকে প্রস্তর সেতু ১০ দিনের এবং সেখান থেকে তিব্বতের (?) দূরত্ব ১৫ দিনের পথ ছিল বলে মীনহাজ উল্লেখ করলেও যাত্রাস্থল থেকে বর্ধনকোট কয়দিনের পথ ছিল, সেই উল্লেখের অভাবে মনে হয় যে এ স্থান দেবকোট থেকে খুব দূরে ছিল না। মনে হয় বর্ধনকোট খুব সম্ভব দেবকোটের ৪০ থেকে ৫০ মাইলের মধ্যেই ছিল।

এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে করতোয়ার পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলে ও দেবকোট থেকে আনুমানিক ৫০ মাইলের মধ্যে অবস্থিত প্রাচীন স্থানগুলির কোন একটিতে বর্ধনকোট ছিল বলে ধারণা করা যায়। এগুলির মধ্যে দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলার (১) চরকাই-বিরামপুর, নওয়াবগঞ্জ উপজেলার (২) বামনগড়, ফুলবাড়ি উপজেলার (৩) ফুলবাড়ি, পার্বতীপুর উপজেলার (৪) বৈগ্রাম, (৫) হাবড়া, (৬) রাজাবাসর, (৭) বেলাই-চণ্ডী, (৮) পাঁচপুকুরিয়া ও (৯) খামার জগন্নাথপুর (খোলাহাটি) প্রভৃতি স্থানগুলি উল্লেখযোগ্য। যতটুকু মনে হয় এই কয়েকটি স্থানের কোন একটিতেই খুব সম্ভব বর্ধনকোট নগর বিদ্যমান ছিল।[৭]

এ স্থানগুলি সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সাবেক রংপুর জেলার বদরগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে প্রায় সাত মাইল দক্ষিণে লোহানীপাড়া নামক একটি প্রাচীন গ্রামে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রায়

৭. বর্ধনকোট নগরের সন্ধানে আমি বহু বছর দিনাজপুর জেলার পূর্ব ও উত্তর অঞ্চলে এবং রংপুর জেলার পশ্চিম ও উত্তর অঞ্চলে অবস্থিত প্রাচীন স্থানগুলিতে অনুসন্ধানকার্য চালিয়েছি। বর্তমান প্রবন্ধটি সেই অনুসন্ধানের ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে।

www.pathagar.com

৩০০×৩০০ ফুট আয়তনের এই বিহারের ভিতর একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৭৬ সালের দিকে। বর্তমানে ঢাকার জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত এই শিলালিপির আংশিক পাঠোদ্ধার করেন বেশ কয়েক বছর আগে ঢাকা যাদুঘরের তদানীন্তন সহকারী কীপার শ্রী রণজিৎকুমার শর্মা।[৮] এই অপ্রকাশিত লিপির আংশিক উদ্ধারকৃত পাঠ থেকে জানা যায় যে মহারাজ শ্রীধর বর্ধনের প্রপৌত্র, মহারাজ পাইখ বর্ধনের পৌত্র ও মহারাজ বিক্রম বর্ধনের পুত্র মহারাজ অংশু বর্ধন কর্তৃক এই মহাবিহারটি নির্মিত হয়েছিল। সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধারের অভাবে এই লিপি সম্বন্ধে আর কিছুই বলা সম্ভব নয়। তবে অক্ষর-বিচারে এই লিপিটি আনুমানিক খ্রীষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দীর বলে শ্রীশর্মা এবং আরও অনেক পণ্ডিতের অভিমত। বিহারটির অবস্থান ছিল প্রাচীন করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলে এবং নদী থেকে এর দূরত্ব এক মাইলের বেশি ছিল না। সেই নদী মরে গেছে এবং চাপড়াবিল নামে একটি বিরাট আকারের বিল করতোয়ার সেই প্রাচীন ধারার নিদর্শন বহন করছে। লোহানীপাড়া বিহারকে চাপড়াকোট বিহারও বলা হয়ে থাকে।

এই শিলালিপি-আবিষ্কারের পর অতি সঙ্গত কারণেই ধারণা করা যেতে পারে যে, বর্ধন অভিধাধারী এক রাজবংশ এই (দিনাজপুর-রংপুর) অঞ্চলে রাজত্ব করত। বর্ধন উপাধিধারী উপরি-উল্লিখিত নৃপতিগণ স্বাধীন ও সার্বভৌম ছিলেন, না তাঁরা পাল বংশীয় নৃপতিদের সামন্ত ছিলেন, সে সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছুই বলার মত তথ্য আমাদের কাছে এখন নেই। তবে সম্রাট হর্ষবর্ধনদের কথা বাদ দিলে এঁদের ছাড়া বাংলার ইতিহাসে বর্ধন উপাধিধারী আর কোন রাজা বা রাজবংশের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাতে এই ধারণা করা যেতে পারে যে, এই বর্ধন উপাধিধারী কোন নৃপতি মীনহাজ-বর্ণিত বর্ধনকোট নগর স্থাপন করেছিলেন এবং এই ধারণা খুব অযৌক্তিক বলে মনে হয় না। খুব সম্ভব বখতিয়ার খলজীর তিব্বত-অভিযানের অনেক আগেই সেই রাজবংশের সমাপ্তি ঘটেছিল, কিন্তু নগরটি তখনও টিকে ছিল। এই নগরে তখন কোন রাজা বা রাজপুরুষ ছিলেন বলে মীনহাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় কোন উল্লেখ নেই। খুব সম্ভব সেখানে তখন কোন রাজা ছিলেন না। কালক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে আর দশটি প্রধান নগরের মত এ স্থানও মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। প্রায় সমসাময়িক এমনকি অনেক পরবর্তীকালেরও অনেক নগরের চিহ্ন এখন খুঁজে পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রামাবতী, বিজয়নগর প্রভৃতি স্থানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

বর্ধনকোটের অবস্থান নিয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে উপরি-উল্লিখিত প্রাচীন স্থানগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা একে একে তুলে ধরা হল। এখানে উল্লেখ্য যে সবকটি স্থানই দিনাজপুর জেলায়। করতোয়ার নিকটবর্তী রংপুর জেলার সবকটি প্রাচীন স্থানই এই নদীর পূর্ব তীরবর্তী বলে এখানে সেগুলি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করা হল না। কারণ, মীনহাজের

৮. শিলালিপিটি প্রথমে স্থানীয় লোকেরা আবিষ্কার করে রংপুর জেলা প্রশাসকের অফিসে জমা দেন। বগুড়ার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কাজী মেহের সংবাদ পেয়ে লোহানীপাড়া যান এবং পরে শিলালিপিটি ঢাকা যাদুঘরে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন। আমি ১৯৭৯ সালে লোহানীপাড়ায় গিয়ে নিশ্চিতভাবে জানতে পারি যে, এটি ছিল একটি বৌদ্ধ বিহার। আমার অনুরোধে শ্রীশর্মা এর আংশিক পাঠোদ্ধার করেন এবং আমি নিজে শিলালিপিটি যতটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয় যে শ্রীশর্মার পাঠ ঠিকই হয়েছে।

www.pathagar.com

বর্ণনামতে বর্ধনকোট ছিল করতোয়া (বেগমতী) নদীর পশ্চিম তীরে এবং নদীর তীরবর্তী স্থানে।

চরকাই-বিরামপুর

প্রাচীন যমুনা (দামোদরপুর লিপির সম্ভব নদী?) ও প্রাচীন করতোয়ার নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এই প্রাচীন জনপদ ছিল অতি বিরাট আয়তনের। প্রায় ১০ মাইল দীর্ঘ ও প্রায় দুই মাইল প্রশস্ত এই স্থানে পাঁচটি সুস্পষ্ট নগরী বিদ্যমান ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ২৫ বছর আগেও সমগ্র এলাকা জুড়ে প্রাচীন ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ বহনকারী প্রায় ২০০ ঢিবির অস্তিত্ব ছিল। ইট-হরণকারীদের দৌরাত্ম্য ও ক্রমবর্ধমান মানুষের চাপে এখানকার অনেক ঢিবিই প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। তবে সমগ্র এলাকা জুড়ে এখনও অসংখ্য প্রাচীন দিঘি-পুষ্করিণীর অস্তিত্ব দেখা যায়।

চরকাই রেলস্টেশন থেকে প্রায় আধমাইল পূর্বে চোরচক্রবর্তী নামক একটি বিরাট ঢিবি এখনও কোনরকমে টিকে আছে। আমাদের অনুরোধ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক পরীক্ষামূলক খননকার্যের পর দেখা গেছে যে এখানে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত আছে। এই ঢিবির প্রায় আড়াই মাইল পূর্বে সীতাকোট বিহার নামক একটি অতি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। চরকাই-বিরামপুর এলাকা থেকে অসংখ্য প্রস্তর-মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক পোড়ামাটির চিত্রফলকও।

করতোয়া নদী থেকে প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে এবং দেবকোট থেকে ২০ মাইল পূর্বে অবস্থিত এই প্রাচীন স্থান খুব সম্ভব বর্ধনকোট ছিল না। পাঁচটি সুনির্দিষ্ট নগরীর সমন্বয়ে গঠিত এ স্থান ছিল খুব সম্ভব গুপ্ত ও পাল লিপিতে বর্ণিত পঞ্চনগরী বিষয়ের অধিকরণ 'পঞ্চনগরী' (গ্রীক ইতিহাসে উল্লিখিত 'পেন্টা পালস') নামক সুবিখ্যাত নগর। এ সম্বন্ধে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বলে এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা হলনা।[১]

বামনগড়

চরকাই-বিরামপুর থেকে প্রায় ১৫ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত জঙ্গলঘেরা বামনগড় নামক প্রাচীন ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ বহনকারী কয়েকটি ঢিবির অস্তিত্ব ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল বলে আমরা দেখেছি। এগুলি খুব সম্ভব হিন্দু-বৌদ্ধ মন্দির বা বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ। এখানে একটি বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ এবং আরও কয়েকটি ঢিবি ছিল বলে লোকমুখে জানা গেছে। প্রাচীন করতোয়া নদীর একটি ক্ষীণ প্রবাহ (বর্তমানে ঘিরনাই নামে পরিচিত) বর্তমান ঢিবিগুলির প্রায় আধ মাইল পূর্ব দিয়ে প্রবাহিত। এ স্থানের অবস্থান ও ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয় যে, এখানে নগর জাতীয় কোন স্থান ছিল না। খুব সম্ভব এখানে বৌদ্ধ বিহার ও স্তূপের সমন্বয়ে একটি প্রসিদ্ধ ধর্মকেন্দ্র ছিল।

---

১. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, 'বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ' (ঢাকা, ১৯৮৪), পৃ ৮৭-৮৯।

www.pathagar.com

ফুলবাড়ি

চরকাই-বিরামপুর থেকে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে এবং প্রাচীন যমুনা নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত ফুলবাড়ি উপজেলার সদর এ স্থানের প্রকৃত নাম কাটাবাড়ি হাট। এখানে প্রাচীন কালে একটি বিরাট দুর্গনগরী ছিল। পরিখাবেষ্টিত সেই দুর্গনগরীর (গড় গোবিন্দ) অতি সামান্য অংশই এখন টিকে আছে এবং অবশিষ্ট অংশে গড়ে উঠেছে হাল আমলের ফুলবাড়ি বাজার ও শহর। তবে মাটির নিচে অজস্র ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ এ স্থানের সর্বত্রই পাওয়া যায়। এখানে বেশ কয়েকটি প্রাচীন জলাশয় আছে। অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষে পূর্ণ ও গুপ্তদের পাঁচখানা তাম্রলিপির প্রাপ্তিস্থল দামোদরপুর গ্রাম এখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এ স্থান করতোয়া নদী থেকে প্রায় ১০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

বৈগ্রাম

ফুলবাড়ি থেকে প্রায় দুই মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বৈগ্রাম (দামোদরপুর লিপির বায়িগ্রাম, হিলীর নিকটবর্তী ও গুপ্ত সম্রাট কুমার গুপ্তের তাম্রলিপির প্রাপ্তিস্থান বৈগ্রাম নয়) নামক স্থানে গুপ্ত যুগে একটি প্রাচীন জনপদ ছিল। এখানে কয়েকটি অতি প্রাচীন জলাশয় ছাড়া প্রাচীন কীর্তির আর কোন নিদর্শন মাটির উপরে টিকে নেই। তবে মাটির নিচে অনেক স্থানে প্রচুর প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পাওয়া যায়। করতোয়া নদী এ স্থান থেকে প্রায় নয় মাইল পূর্বে অবস্থিত।

হাবড়া

বৈগ্রাম থেকে প্রায় পাঁচ মাইল উত্তরে অবস্থিত হাবড়া নামক স্থানে একটি প্রাচীন নগর ছিল। মাটির উপরে কোন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা না গেলেও প্রায় এক বর্গমাইল স্থান খুঁড়ে মাটির নিচে প্রচুর প্রাচীন ইট, প্রাচীন ইমারতের ভিত্তি দেয়াল, প্রাচীন মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ইত্যাদি পাওয়া যায়। এখানে প্রাচীনকালে একটি নগর ছিল বলে ধারণা হয়। করতোয়া নদী এ স্থান থেকে প্রায় ছয় মাইল পূর্বে অবস্থিত।

রাজাবাসর

হাবড়া থেকে প্রায় চার মাইল উত্তরে এবং পার্বতীপুর শহরের কিছু দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত রাজাবাসর একটি প্রাচীন স্থান। এখানে বহু ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় এবং মাটির নিচে এক বিরাট এলাকা জুড়ে অজস্র প্রাচীন ইট, ইটের তৈরি ভিত্তি-দেয়ালের অংশবিশেষ নজরে পড়ে। এখানে বেশ কয়েকটি প্রাচীন জলাশয়ও আছে। এখানে এক রাজার রাজধানী ছিল বলে জনপ্রবাদ-মতে এ স্থানের নাম রাজাবাসর। করতোয়া নদী এ স্থান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল পূর্বে অবস্থিত।

বেলাইচণ্ডী

রাজাবাসর ও পার্বতীপুর থেকে প্রায় ছয় মাইল উত্তরে অবস্থিত বেলাইচণ্ডী একটি

www.pathagar.com

প্রাচীন স্থান। এখানে একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষকে জনপ্রবাদ-মতে মহাভারতের রাজা বিরাটের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। এ জন্য এই দুর্গকে বিরাট পাটক বলা হয়ে থাকে। এখানে বেশ কয়েকটি প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ও অসংখ্য প্রাচীন দিঘি পুষ্করিণী আছে। প্রায় চার বর্গমাইল স্থান জুড়ে এ স্থানের ধ্বংসাবশেষগুলি অবস্থিত। এক কালে এখানে একটি বিরাট আকারের নগর ছিল। এই স্থানের প্রায় চার মাইল পশ্চিমে ছিল বর্তমানে দেউল গ্রাম নামে পরিচিত একটি প্রাচীন স্থান। সেখানে একটি দুর্গ, ৬৩টি প্রাচীন জলাশয় এবং কয়েকটি বৌদ্ধ বিহার ও অসংখ্য বৌদ্ধ স্তূপ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দেও দেখা যেত।

বেলাইচণ্ডী ঘিরনাই (করতোয়ার একটি ক্ষীণ শাখা নদী) নদীর তীরে অবস্থিত হলেও প্রাচীন করতোয়া নদী ছিল এ স্থান থেকে প্রায় তিন মাইল পূর্বে।

পাঁচ পুকুরিয়া রাজবাড়ি

ফুলবাড়ি উপজেলা-সদর থেকে প্রায় সাত মাইল পূর্ব-উত্তরে মধ্যপাড়া (বর্তমানে মাটির নিচে প্রাচীন শিলাপ্রাপ্তির জন্য খ্যাত) নামক স্থান। সেখান থেকে প্রায় দুই মাইল পূর্ব-উত্তরে হাবড়া থেকে প্রায় আট মাইল দক্ষিণ-পূর্বে পাঁচ পুকুরিয়া রাজবাড়ি নামক একটি প্রাচীন স্থান আছে। প্রায় ১২৫×১২৫ ফুট আয়তনের একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসবেশেষ এবং সেই মন্দিরের চারদিকে প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ বহন-কারী কয়েকটি ঢিবি ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দেও টিকে ছিল। এই মন্দির থেকে কিছু দূরে আছে প্রাচীন ইটে বাঁধান ঘাটসহ পরপর পাঁচটি প্রধান পুকুর এবং পুকুর-গুলির ধারে-কাছে পড়ে আছে অসংখ্য প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ। পাঁচটি বাঁধান পুকুর ও পূর্বে উল্লিখিত মন্দিরের (এই মন্দিরটিকে স্থানীয় লোকেরা রাজবাড়ি বলে) অবস্থানের জন্য জনপ্রবাদ-মতে এ স্থানের নাম হয়েছে পাঁচ পুকুরিয়া রাজবাড়ি।

ঘিরনাই নামক একটি ছোট নদী (প্রাচীন করতোয়ার একটি ক্ষীণ শাখা নদী এবং নিচে নওয়াবগঞ্জের নিকট বর্তমানে করতোয়া নামেই পরিচিত) এ স্থানের উত্তর ও পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এ স্থানকে প্রায় বেষ্টন করে আছে। এই নদীই এখন দিনাজ-পুর ও রংপুর জেলার সীমারেখা নির্দেশ করে। প্রাচীন করতোয়া নদীর মরে যাওয়া খাত পাঁচ পুকুরিয়া থেকে প্রায় দেড় মাইল পূর্বে অবস্থিত। লালমাটিতে গঠিত এ স্থান খুবই প্রাচীন এবং পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে করতোয়া নদী কোন কালেই এর ধারে কাছে দিয়ে প্রবাহিত হত না।

ঘিরনাই নদীর অপর তীরে এবং এ স্থান থেকে প্রায় আড়াই মাইল উত্তরে অবস্থিত পূর্বে উল্লিখিত লোহানীপাড়া বা চাপড়াকোট বিহার এবং তা রংপুর জেলায় অবস্থিত।

খোলাহাটি-রঘুনাথপুর-খামার জগন্নাথপুর-হীরা বেশ্যার ভিটা

পাঁচ পুকুরিয়া রাজবাড়ি থেকে প্রায় সাড়ে ছয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে ও পার্বতীপুর রেল জংশন থেকে প্রায় দুই মাইল পূর্বে খোলাহাটি রেলস্টেশনকে কেন্দ্র করে প্রায় চার বর্গ-মাইল স্থান জুড়ে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। খোলাহাটি রেল-

www.pathagar.com

স্টেশন থেকে প্রায় আধ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, রেল লাইনের দক্ষিণে আনুমানিক ৫০০×৫০০ গজ আয়তনের একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। লোকে বলে, মহাভারতের কীচক রাজার দুর্গ এটি এবং এখানেই নাকি তিনি বাস করতেন। লাল মাটিতে গড়া দুর্গের দেয়ালগুলি বেশ প্রশস্ত এবং এখনও প্রায় ১৫ ফুট উঁচু। দুর্গের ভিতরের অংশ এখন চাষের জমি। সেখানে কিছু কিছু ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দেখা গেলেও কোন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ নেই। মনে হয় দুর্গটি বেশ প্রাচীন, খুব সম্ভব প্রাক্-মুসলিম যুগের।

এই দুর্গের প্রায় ২০০ গজ পশ্চিমে আছে অনুমানিক ৫০০×২০০ গজ আয়তনের উত্তর-দক্ষিণে লম্বা মজে যাওয়া একটি প্রাচীন দিঘি, নাম কাটাহার দিঘি। এই দিঘি থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে রেল লাইনের উত্তরে আছে প্রায় অনুরূপ আয়তন ও অবস্থার আরেকটি প্রাচীন দিঘি। কীচক রাজার গড়ের পূর্বদিকে আছে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি প্রাচীন জলাশয়। এর দক্ষিণে আছে একটি গ্রাম। সেই গ্রামে কোন প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ না থাকলেও মাটির নিচে এখানে-ওখানে প্রাচীন ইট পাওয়া যায়। গ্রামের পূর্বদিকে মাঠের মধ্যে আছে কিছু প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র এলাকাতেই কিছু না কিছু প্রাচীন কীর্তির চিহ্ন দেখা যায়।

খোলাহাটি রেলস্টেশনের উত্তরে রঘুনাথপুর, খামার জগন্নাথপুর প্রভৃতি গ্রামগুলির বর্তমান অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত হাল আমলের বলে জানা গেছে। কিন্তু এই গ্রামগুলি খুবই প্রাচীন এবং এখানে অবস্থিত প্রাচীন জলাশয়গুলি এ স্থানের প্রাচীনত্বের নিদর্শন বহন করে। প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূমিতে অবস্থিত এসব গ্রামে প্রাচীন জলাশয়-গুলি ছাড়া আর কোন প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা না গেলেও কোথাও কোথায়ও মাটির নিচে প্রাচীন ইট পাওয়া যায় বলে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে জানা গেছে।

গ্রামগুলির উত্তরে আছে বিলের মত একটি নিম্নভূমি। খুব সম্ভব বর্তমানে মৃত করতোয়া নদীর একটি প্রবাহ কোন এক সময়ে এই নিম্নভূমির সৃষ্টি করেছিল অথবা কোন রাজা বা রাজপুরুষ করতোয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করে এখানে কৃত্রিম হ্রদ বা পরিখা-জাতীয় জলাধারের সৃষ্টি করেছিলেন। এই বিলের কিছু উত্তরে দিনাজপুর-রংপুর কাঁচা সড়ক অবস্থিত। এই পথটি কত প্রাচীন সে সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে রাস্তার উভয় পার্শ্বে লালমাটিতে গড়া এখানকার ভূমি যে অত্যন্ত প্রাচীন, তা এক নজরেই বোঝা যায়। এখানে রাস্তার উভয় পার্শ্বেই আছে গায়ে গায়ে লাগান অনেকগুলি প্রাচীন জলাশয়। উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে প্রায় মজে যাওয়া এই পাড়হীন প্রাচীন জলাশয়গুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে সুদূর অতীতে এখানে একটি প্রাচীন জনপদের অস্তিত্ব ছিল।

এই জলাশয়গুলির কিছু পূর্ব-দক্ষিণে এবং উপরি-উল্লিখিত নিম্নভূমির প্রায় লাগোয়া পূর্ব দিকে প্রায় এক বর্গমাইল স্থান জুড়ে একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ নজরে পড়ে। সমগ্র এলাকা এখন কৃষিভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হলেও প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ এত বেশি যে এখানে ভাল করে চাষাবাদ করা যায়না এবং প্রত্যেক চাষের সময়েই কৃষকেরা এসব বস্তু ক্ষেতের আলে জমা করে রাখে। এই এলাকার উত্তর ভাগে অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূমিতে 'হীরা বেশ্যার ভিটা' নামক স্থানে একটি প্রাচীন ইমারতের

www.pathagar.com

ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দেও বেশ সুস্পষ্ট ছিল। প্রায় দুই বিঘা আয়তনের এই ভিটাতে প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের এত ভগ্নাংশ আছে যে এতে চাষাবাদ করা যায় না। এর পার্শ্ববর্তী কয়েক খন্ড ভূমির অবস্থাও প্রায় অনুরূপ। এম. মার্টিন ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সরেজমিনে তদন্ত করে এখানে একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষে ছিল বলে তাঁর রচিত *Eastern India* গ্রন্থে উল্লেখ করে গেছেন।

এই ইমারতকে নাথ সাহিত্যের রাজা গোপীচন্দ্রের কাহিনীর সঙ্গে জড়িত হীরা বেশ্যার বাড়ি বলে জনপ্রবাদ-মতে চিহ্নিত করা হয়। মার্টিনও এই জনপ্রবাদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেই জনপ্রবাদ আজও টিকে আছে। এই কাহিনী যে ভিত্তিহীন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। খুব সম্ভব এখানে অবস্থিত একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে এই কাহিনী গড়ে উঠেছিল উপরি-উল্লিখিত কীচক রাজার প্রবাদের মতই।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে হীরা বেশ্যার ভিটা ও পার্শ্ববর্তী স্থানের অসংখ্য ইট পাটকেল ও মৃৎপাত্রের মধ্যে কিছু কিছু চাকচিক্যময় পাত্রের (glazed potteries) অংশও আমাদের নজরে পড়েছে। এগুলি যে এখানকার এবং বাইরে থেকে পরবর্তীকালে এখানে আমদানি করা হয়নি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুলতানী আমলে প্রচলিত এসব চাকচিক্যময় পাত্রের ভগ্নাংশ দেখে মনে হয় যে অন্তত সুলতানী আমলের প্রথম দিকেও এখানে কিছু কিছু সঙ্গতিপন্ন মুসলমানের বসতি ছিল।

এই ভিটার কিছু পূর্বে অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূমিতে মুসলমানের একটি করবস্থান আছে। সেখানে কবর খুঁড়তে গিয়ে মাটির নিচে প্রচুর ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পাওয়া যায় বলে স্থানীয় লোকের কাছে জানা গেছে।

এই কবরস্থানের লাগোয়া পূর্বেই আছে দিনাজপুর-রংপুর জেলার সীমানা নির্দেশকারী বর্তমানে ঘিরনাই নামে পরিচিত প্রাচীন করতোয়া নদীর মৃতপ্রায় খাত। এই নদীর প্রশস্ততা যে এখানে আধ মাইলেরও বেশি ছিল, খাতটি দেখলে তা সহজেই বোঝা যায়। বর্তমানে শীতকালে এই নদীর এই স্থানে পানি থাকে না।

এখানে ১৯৮৩ সালের শীতকালে একটি পাকা সেতু নির্মাণ করা হচ্ছিল। নদীগর্ভে সেতুর ভিত্তির জন্য মাটি খুঁড়তে গিয়ে প্রায় ১২ ফুট মাটির নিচে পাওয়া যায় অসংখ্য প্রাচীন ইট ও ইটের ভগ্নাংশ। আরও পাওয়া যায় ধাতব তৈজসপত্র, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, কাঠের আসবাবপত্র ও দরজা-জানালার ভগ্নাবশেষ, বেশ কয়েকটি মানুষের মাথার খুলি, বেশ কয়েকটি মানুষের হাড়, প্রায় ছয়আনা সোনা দিয়ে তৈরি একটি ছোট সোনার বালা (শিশুর জন্য নির্মিত), কিছু অপরিচিত মুদ্রা ইত্যাদি। মুদ্রা, সোনার বালা, ধাতব তৈজসপত্র ইত্যাদি বস্তুগুলি অনেক চেষ্টা করেও উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। অজস্র ইটের ভগ্নাংশ, কাঠের দরজা-জানালা ও আসবাবপত্রের অংশবিশেষ, অনেকগুলি মাথার খুলি ও মানুষের হাড় তখনও সেখানে পড়ে ছিল।[১০]

১০. এসব বস্তু ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের দিকে আবিষ্কৃত হয়। খবর পেয়ে মার্চ মাসের দিকে আমরা যখন সেখানে যাই, ঠিকাদারকে সেখানে তখন পাওয়া যায়নি। তবে ঠিকাদারের কর্মরত লোক এবং স্থানীয় লোকেরা এসব বস্তু প্রাপ্তির কথা স্বীকার করে। অনেক চেষ্টা করেও ঠিকাদার কর্তৃক নিয়ে যাওয়া

www.pathagar.com

এসব বস্তু দেখে ধারণা হয় যে, এককালের বিশালকায়া করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত এক বা একাধিক অট্টালিকা কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে হঠাৎ নদীতে পড়েছিল এবং গৃহবাসীরা সেই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিল। সেই অট্টালিকা বা অট্টালিকাগুলি নদীর পাড়ে (এবং নগরীর পূর্বাংশে) অবস্থিত ছিল বলে ধারণা হয়। সেই নগরীর অংশবিশেষে তথাকথিত হীরা বেশ্যার ভিটা ও পার্শ্ববর্তী ইমারতগুলি ছিল, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। করতোয়ার তীরে অবস্থিত এই নগরী যে বিরাট আয়তনের ছিল উপরের বর্ণনাতেই তা বোঝা যায়।

বর্ধনকোটের স্থান-নির্ধারণ

দেবকোট থেকে প্রায় ২৫ মাইল সোজা পূর্বে অবস্থিত চরকাই-বিরামপুর যে বর্ধন-কোট ছিল না, সে সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তবে দেবকোট থেকে এ স্থান হয়ে মোহাম্মদ বখতিয়ার যদি করতোয়ার ঊর্ধ্বমুখে অগ্রসর হয়ে থাকেন তবে পথে বামনগড় পড়ার কথা। করতোয়া থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে হলেও বামনগড়, মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, এ নদীর তীরবর্তী অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। তবে এ স্থানের প্রাচীন কীর্তিগুলির ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষণ করে দেখার পর মনে হয় যে, এখানে খুব সম্ভব কোন নগরের অস্তিত্ব ছিলনা। একটি বৌদ্ধ বিহারকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি বৌদ্ধ স্তূপ ও মন্দির নিয়ে এখানে একটি উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধধর্ম-কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া মোহাম্মদ বখতিয়ারের এই ঘোরাপথে তিব্বতের পথে অগ্রসর হওয়ার কথাও যুক্তির দিক থেকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। তাই বামনগড়কে বর্ধনকোট বলে ধরা যায় না।

মোহাম্মদ বখতিয়ার খুব সম্ভব দেবকোট থেকে যাত্রা করে সমঝিয়া ও দামোদরপুর হয়ে ফুলবাড়ি এসেছিলেন এবং সেখান থেকে তিব্বতের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু ফুলবাড়ি যে বর্ধনকোট হতে পারে না, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ফুলবাড়ি ছিল করতোয়া থেকে প্রায় ১০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। অতএব মীনহাজের বর্ণনামতে ফুলবাড়ি কিছুতেই বর্ধনকোট হতে পারে না। উপরি-উল্লিখিত বৈগ্রাম, হাবড়া, রাজাবাসর এবং বেলাই চণ্ডীও একই কারণে বর্ধনকোট হতে পারে না।

উপরি-উল্লিখিত পাঁচপুকুরিয়া রাজবাড়িতে যে একটি বড় ধরনের নগর ছিল, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ধন রাজবংশের শিলালিপিটি যে এ স্থান থেকে প্রায় আড়াই মাইল উত্তরে অবস্থিত লোহানীপাড়া বা চাপড়াকোট বিহারে আবিষ্কৃত হয়েছে, সেকথাও পূর্বে বলা হয়েছে। এসব কারণে এবং করতোয়ার তীরবর্তী অঞ্চলে এ স্থানের অস্তিত্ব দেখে মনে হতে পারে যে, এখানেই ছিল বিলুপ্ত বর্ধনকোট নগর। কিন্তু এ স্থান ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল খুব ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, প্রাচীন করতোয়া নদী কোন কালেই এ স্থানের নিকট দিয়ে প্রবাহিত হত না এবং করতোয়া থেকে এ স্থানের দূরত্ব বরাবরই এক মাইলের চেয়েও বেশি। অতএব এ স্থানকে মীনহাজের বর্ণনামতে বর্ধনকোট বলে সনাক্ত করা যায়না।

মুদ্রা, সোনার বলয় ও ধাতব তৈজসপত্রগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। আশ্রিত ইটগুলিও তখন তারা সেতুর ভিত্তির তলদেশে লাগিয়ে ফেলেছে। তবে ইটের ভগ্নাংশগুলি (সেগুলিও সংখ্যায় বহু) দেখে মনে হয় যে এগুলি প্রাক্-মুসলিম যুগের।

www.pathagar.com

উপরি-উল্লিখিত স্থানগুলি বাদ দিলে একমাত্র স্থান থাকে খোলাহাটি রেলস্টেশনকে কেন্দ্র করে রঘুনাথপুর, খামার জগন্নাথপুর, হীরা বেশ্যার ভিটা প্রভৃতি স্থান জুড়ে অবস্থিত প্রাচীন নগরটি। এই স্থানে একটি বড় ধরনের নগরের অস্তিত্ব ছিল এবং সেই নগরের লাগোয়া সামনে দিয়ে প্রবাহিত ছিল বিশালকায়া করতোয়া নদী। ইতিহাসে উল্লেখ না থাকলেও অন্তত সুলতানী আমলে এ স্থানে মুসলমানের বসতির প্রমাণ পাওয়া যায় এখানে প্রাপ্ত চাকচিক্যময় পাত্রের ভগ্নাংশ দেখে। মীনহাজের মতে, প্রাচীন কালের পারস্য সম্রাট এই শহর নির্মাণ করেছিলেন। মীনহাজের এই কাহিনী কল্পনাপ্রসূত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে মীনহাজের এই বর্ণনা দেখে মনে হয় যে এই নগরটি ছিল বেশ প্রাচীন এবং এখানে খুব সম্ভব কোন রাজা বা তেমন কোন প্রবল রাজপুরুষের অবস্থান সে সময়ে ছিল না। তবে এটি যে একটি বিরাট ও উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল, মীনহাজের বর্ণনা থেকেই তা বোঝা যায়।

লোহানীপাড়া থেকে আনুমানিক সাড়ে চার মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এই প্রাচীন স্থানেই ছিল খুব সম্ভব বর্ধনকোট নগর। মীনহাজের বর্ণনার সঙ্গে এ স্থানের অবস্থান প্রায় সম্পূর্ণরূপে মিলে যায়। তাতে মনে হয় যে এখানে ছিল মীনহাজ-বর্ণিত প্রাচীন বর্ধনকোট নগর। অংশুবর্ধন কর্তৃক নির্মিত লোহানীপাড়া বিহারের অবস্থানও এই সিদ্ধান্তের পিছনে সমর্থন যোগায়। তখনকার দিনে বিহারগুলি নির্মিত হত নগরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে যাতে করে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা শান্ত পরিবেশে পঠন, পাঠন ও ধর্মকর্মে গভীর মনোযোগ দিতে পারতেন। খুব সম্ভব এ কারণেই প্রায় সাড়ে চার মাইল দূরে বৌদ্ধ বিহারটি নির্মিত হয়েছিল।

এ স্থান থেকে করতোয়ার প্রবাহ ছিল প্রায় সোজা উত্তর মুখে। মোহাম্মদ বখতিয়ার খুব সম্ভব করতোয়ার পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চল দিয়ে এবং বর্তমান হিল্লী-পার্বতীপুর-চিলাহাটি রেল লাইন অথবা এর পাশাপাশি অবস্থিত কোন রাস্তা ধরে উত্তরমুখে তিব্বতের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন।

মোহাম্মদ বখতিয়ারের পরেও কিছুকাল ধরে খুব সম্ভব এ স্থানের অস্তিত্ব ছিল এবং এখানে মুসলমানের বসতিও গড়ে উঠেছিল। এর পরে খুব সম্ভব এ স্থান পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে এবং এর পরিচিতিও হারিয়ে যায়।

উপসংহার

খোলাহাটির চারদিকের এসব ধ্বংসাবশেষকে বর্ধনকোট বলে চিহ্নিত করার যুক্তি এই যে, মীনহাজের বর্ণনামতে, এ স্থান (বর্ধনকোট) মোহাম্মদ বখতিয়ারের তিব্বত-অভিযানের যাত্রাস্থল থেকে ৫০ মাইলের বেশি দূরে হতে পারে না। কারণ, বর্ধনকোট থেকে নদীর ঊর্ধ্বমুখে (উত্তর দিকে) অগ্রসর হয়ে ১০ দিন পরে মোহাম্মদ বখতিয়ার কামরূপের সীমানায় অবস্থিত পাথরের সেতুতে উপস্থিত হয়েছিলেন বলে মীনহাজের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। সেখান থেকে ১৫ দিনের পথ অতিক্রম করে মোহাম্মদ বখতিয়ার তিব্বতে (?) পৌঁছেছিলেন বলে মীনহাজ জানিয়েছেন। তবে সে স্থান যে তিব্বত ছিল না এবং তা ছিল কামরূপের উত্তরে অবস্থিত সিকিম-ভুটান অঞ্চলের কোন স্থান, সেই অনুমান মীনহাজের বর্ণনা থেকেই করা যায়।

www.pathagar.com

এসব কারণে অতি সঙ্গতভাবেই ধরা যেতে পারে যে মীনহাজ-বর্ণিত বর্ধনকোট ছিল দিনাজপুর জেলাতে এবং সেই স্থান ছিল জেলার পূর্বাঞ্চলে কিছুটা উত্তর দিক ঘেঁষে। এই অঞ্চলের প্রাচীন স্থানগুলির কোন একটিই যে বর্ধনকোট ছিল, তা মেনে নিতেই হয়। খোলাহাটির যে পরিচয় আমরা তুলে ধরেছি তাতে দেখা যায় যে মীনহাজের বর্ণনার সঙ্গে এ স্থানের অবস্থান প্রায় পুরোপুরি মিলে যায়। অতএব প্রাচীন করতোয়ার তীরে অবস্থিত এ স্থানেই ছিল খুব সম্ভব বিলুপ্ত নগরী বর্ধনকোট।

www.pathagar.com

বাংলায় ইসলাম-বিস্তারের পটভূমি

আবদুল মমিন চৌধুরী*

বাংলা[১] বিশ্বের অন্যতম মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চল। ১৮৭১ সালের আদম শুমারিতে এই তথ্য প্রকাশ পাওয়ায় বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।[২] শুরু হয়েছিল বিতর্ক এবং হিন্দু-বৌদ্ধ বাংলা কি প্রক্রিয়ায় মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল, তার ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা চলেছিল বেশ কিছু কাল ধরে।[৩] তবে এখন একথা মোটামুটিভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে যে, বহিরাগতদের সংখ্যা কোন সময়েই এত বেশি ছিল না যে তাদের মাধ্যমেই এই অঞ্চল মুসলিম-অধ্যুষিত হয়েছে, বরঞ্চ স্থানীয় জনগোষ্ঠির ধর্মান্তরই এর প্রধান কারণ এবং এই ধর্মান্তর-প্রক্রিয়ায় সুলতান, মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও সুফি সাধকদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। অবশ্য একথাও স্বীকার করতে হবে যে, বহিরাগত মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকেই এদেশে বিয়ে করেছেন এবং তাঁদের সন্তানাদি এই ভূভাগে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে।[৪] বাংলায় ইসলাম-বিস্তারের ক্ষেত্রে ধর্মান্তর-প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা ও প্রেক্ষাপট-বিশ্লেষণের প্রয়াসেই এই প্রবন্ধ।

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম ধর্মে স্থানীয়দের ধর্মান্তর সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনটি প্রধান মতবাদ প্রকাশ পেয়েছে।[৫] এদের মধ্যে 'বলপ্রয়োগ' বা 'তরবারির মাধ্যমে ধর্মান্তর' ব্যাখ্যাটির অসারতা বা সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে পণ্ডিতমহলের সচেতনতা ইতি-

---

* আবদুল মমিন চৌধুরী, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. 'বাংলা' বলতে এখানে প্রাক্-১৯৪৭এর অবিভক্ত বাংলাকে বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বাংলাকে নিয়ে গঠিত ভূভাগ।

২. Rafiuddin Ahmed, *The Bengal Muslims, 1871-1906, A Quest for Identity* (Delhi, 1981), pp 1 ff.

৩. বিতর্কের একদিকে ছিল রিজলির ব্যাখ্যা : "The presence of so many Muslims in the remote corners of Bengal was not due so much to the introduction of Moghal blood into the country as to the conversion of the former inhabitants." (*Census of Bengal*, Calcutta, 1872, p 132)। অন্যদিকে ছিল খন্দকার ফজলি রাব্বির মতবাদ যে বাংলার মুসলমানদের অধিকাংশই ছিল সাড়ে পাঁচশ বছর ধরে মুসলিম শাসনামলে বহিরাগত মুসলমান শিক্ষক, প্রচারক আমলা শ্রেণী এবং সৈন্যদলের সদস্যদের বংশধর (*The Origin of the Musalmans of Bengal*, Calcutta, 1895)।

৪. Abdul Karim, *Social History of the Muslims in Bengal* (Dhaka, 1959), Chapters II, III, and IV.

আবদুল করিম, 'বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ,' ১ম খন্ড (কলিকাতা, ১৩১০), পৃ ১৫৯।

৫. Richard M Eaton, "Approaches to the Study of Conversion to Islam in India", in Richard Martin (ed.), *Islam and the History of Religions* (Tucson, 1984).

www.pathagar.com

মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে।[৬] রাজনৈতিক শক্তি কর্তৃক বলপ্রয়োগ যদি ধর্মান্তরের কারণ হয়ে থাকত, তাহলে ভারতে মুসলিম শক্তির কেন্দ্রস্থল দিল্লি-আগ্রায় বা গঙ্গা-যমুনা দোআব অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে নি। বরঞ্চ কেন্দ্রীয় মুসলিম সাম্রাজ্যের পশ্চিম ও পূর্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মুসলমানদের প্রাধান্য দেখা যায়। দ্বিতীয় মতবাদটি—রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা—আংশিকভাবে হয়তো ধর্মান্তরের কারণ ব্যাখ্যা করে। মুসলিম শাসকগোষ্ঠির কাছ থেকে নানান পার্থিব সুযোগ-সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে—যেমন অনেক কর থেকে রেহাই পাওয়া বা রাজকীয় আমলাতন্ত্রে যোগদান ও উন্নতিলাভের আশায়—স্থানীয় জনগণ অনেক সময়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। এই প্রক্রিয়ার ফলে যে বাংলায়ও ধর্মান্তর ঘটছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাছাড়া হিন্দু সমাজের পবিত্রতারক্ষার ক্ষেত্রে অতি সংরক্ষণশীল মনোভাব এই প্রক্রিয়ায় সাহায্য করেছে। কোন ব্যক্তি যে-কোনো কারণে 'যবন'দের সংস্পর্শে এলে হিন্দু সমাজ তাকে সমাজচ্যুত করত। সমাজের এই মনোভাবই অনেকের ক্ষেত্রে ধর্মান্তরের কারণ হয়েছে।[৭] আপাতদৃষ্টিতে এই ব্যাখ্যা অনেকটা গ্রহণযোগ্য। তবে একথা স্বীকার করে নেওয়া যায় না যে, ব্যাপক ভিত্তিতে ধর্মান্তর এতে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তাছাড়া বাংলায় গ্রাম-পর্যায়ে কৃষক শ্রেণীর লোকদের ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা প্রয়োগ করা যুক্তিসংগত হবে না।

এই ক্ষেত্রেই তৃতীয় মতবাদটির সৃষ্টি হয়েছে—সামাজিক মুক্তির কারণে ধর্মান্তর। যুগ যুগ ধরে সমাজের অবহেলিত ও পদদলিত অংশ সামাজিক মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যেই ইসলামের ভ্রাতৃত্বে যোগদান করেছে।[৮] বাংলায় এই প্রক্রিয়া যে অত্যন্ত প্রবল ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মুসলিম-পূর্ব যুগের সামাজিক ও ধর্মীয় অঙ্গনে এমন অনেক অবস্থা বিরাজমান ছিল যা এই প্রক্রিয়াকে অবশ্যই সাহায্য করেছে, যেমন হিন্দু-বৌদ্ধ সমাজে বর্ণভেদের কাঠিন্য; উচ্চশ্রেণীর প্রাধান্য; ভূম্যধিকারী দ্বারা গঠিত সমাজের উচ্চশ্রেণী: নিম্নশ্রেণীর প্রতি তাদের অবহেলার মনোভাব ও সমাজে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি। সামাজিক ক্ষেত্রে এই অবস্থারই পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন মুসলমান সুফি সাধকগণ। আর তাই তাঁদের প্রচারণা ও কার্যকলাপ লাভ করেছিল অভূতপূর্ব সাফল্য।

এই তৃতীয় ব্যাখ্যাটি বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর প্রযোজ্য বলে মনে হয়। তবে সমস্ত ভারতবর্ষে অন্যান্য অঞ্চলেও একই ধরনের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিরাজমান ছিল। এই কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, উত্তর ভারতের হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণী কম অবহেলিত ছিল বা তাদের ক্ষেত্রে সামাজিক বর্ণভেদের কাঠিন্য কোন অংশে কম ছিল; কিংবা একথা মনে করারও কোন কারণ নেই যে, উত্তর ভারতের ভূম্যধিকারী সমাজ নিম্নশ্রেণীর প্রতি অধিকতর উদার ছিল। অর্থাৎ উত্তর ভারতের

৬. P. Hardy, "Modern European and Muslim Explanations of Conversion to Islam in South Asia : A Preliminary Survey of the Literature", *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland*, No. 2, pp 177-206.

৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'কমলা বক্তৃতামালা' (কলিকাতা, ১৯৬৬), পৃ. ১৩-১৪।

৮. I. H. Qureshi, *The Muslim Community of the Indo-Pakistan Subcontinent* (The Hague, 1962), p 75.

www.pathagar.com

নিম্নশ্রেণীর মনেও সামাজিক মুক্তিলাভের বাসনা বাংলার অনুরূপ থাকাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু উত্তর ভারতে সামাজিক মুক্তিলাভের কারণে ব্যাপক ধর্মান্তর ঘটেছিল, একথা বলা যায় না। বর্ণভেদ-প্রথার কাঠিন্য নিয়ে উত্তর ভারতের হিন্দু সমাজ মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগেও এসে দাঁড়িয়েছে। ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধ সেই সমাজের নিপীড়িত নিম্নশ্রেণীকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে। উত্তর ভারতের ক্ষেত্রে যা ঘটেনি, বাংলার ক্ষেত্রে তা ঘটেছে। নিশ্চয়ই বাংলার আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে এমন কিছু ছিল যার কারণে এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ধর্মান্তর-প্রক্রিয়া ঘটেছে। এই কারণ ও প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

এই অনুসন্ধানের সঙ্গে জড়িত রয়েছে আর একটি প্রশ্ন — বাংলায় বিরাজমান ইসলামের ভিন্ন ধর্মীয়-সামাজিক রূপ। ভৌগোলিকভাবে উপমহাদেশের পূর্ব প্রান্তে সমুদ্রোপকূলে অবস্থানের জন্য এবং এখানকার আদি মানবগোষ্ঠির নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাগত স্বকীয়তা বিদ্যমান থাকার কারণে বাংলায় মুসলমান সমাজ-গঠনের বিবর্তন-প্রক্রিয়ায় এমন কিছু লক্ষ্য করা যায়, যার ফলে বাংলায় বিরাজমান মুসলমান সমাজ উত্তর-ভারতের বা পাশ্চাত্যের সমাজের চাইতে অনেক দিক থেকেই ভিন্ন। বাংলায় ধর্মান্তরিত জনগোষ্ঠির নিজস্ব জীবনধারাকে ইসলাম খুব একটা আমূল পরিবর্তন করতে পেরেছে বলে দাবি করা সম্ভব নয়। ইসলাম-পূর্ব জীবন-বৈশিষ্টের অনেক লক্ষণই ইসলাম-পরবর্তী যুগে লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় ইসলামীকরণের প্রক্রিয়া অনেক স্থানীয় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে স্থান দিতে বাধ্য হয়েছে, যার ফলে গড়ে উঠেছে এমন একটি মুসলমান সমাজ যার আঞ্চলিক সত্তা অত্যন্ত স্পষ্ট। সে সত্তা যেমন এই অঞ্চলের অমুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক কাছাকাছি, তেমনি উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের চাইতে অনেক ভিন্ন ও দূরের। ধর্মের ঐতিহ্যিক গোঁড়া মনোভাবের চাইতে আত্মিক মানবতাবোধ বাংলার মানসে প্রাধান্য পেয়েছে। বাংলার গ্রামীণ মুসলমান সম্প্রদায় ধর্মীয় আচার-ব্যবহার ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাদের প্রতিবেশী অমুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক নিকটে, তুলনামূলকভাবে স্বসম্প্রদায়ভুক্ত নগরবাসীদের (যারা বেশির ভাগই বহিরাগত) ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও আচার-অনুষ্ঠান অনেক ভিন্ন। তাই প্রাক-মুসলিম অতীতের উপর প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ মুসলমানদের ধর্ম-বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনা করতে গিয়ে কিছু নতুন শব্দের সৃষ্টি হয়েছে, যেমন 'ফোক-ইসলাম' বা 'পপুলার ইসলাম'—লৌকিক বা লোকায়ত ইসলাম।[৯] এ কথা অনস্বীকার্য যে বাংলায় ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার ধারা-গঠনে স্থানীয় ও বহিরাগত উপাদানের সংমিশ্রণ ও যুক্ত প্রক্রিয়া কাজ করেছে। যে-কোন অঞ্চলে এটাই স্বাভাবিক। ইসলাম বাংলাদেশে স্থানীয় প্রাক-ইসলামী সমাজের অনেক বৈশিষ্ট্য পরিগ্রহণ করেছে, ফলে এখানে ইসলাম তার মৌল বহিরাগত রূপ থেকে অনেকটা পৃথক সত্তা লাভ করেছে।[১০] সমাজ ও ধর্ম-চিন্তা ও মনোভাব হঠাৎ

৯. Rafiuddin Ahmed, প্রাগুক্ত, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়।

১০. প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় অধ্যায়। তাছাড়া দেখুন : Jagadish Narayan Sarkar, *Islam in Bengal* (Calcutta, 1972), pp 27-42; M. A. Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, Vol. I (Karachi, 1963), pp 335-340; M. R. Tarafdar, "The Bengali Muslims in the Pre-Colonial Period : Problems of Conversion, Class Formation and Cultural Evolution", *Purusartha*, 9, *Islam and Society in South Asia* (Paris, 1986), pp 93-110.

www.pathagar.com

করে সৃষ্টি হয় না এবং হঠাৎ করে বদলেও যায় না; কালের প্রবাহে নতুন নতুন উপাদানের সংস্পর্শে পরিবর্তন ঘটে বৈকি, কিন্তু এই পরিবর্তনের মধ্যেও একটা চিরন্তন বা শাশ্বত রূপ থেকে যাওয়া বাংলার মতো ঐতিহ্যাবদ্ধ সমাজে খুবই স্বাভাবিক।[১১] বাংলার ইসলামের ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে বিরোধী ভাবধারার, ধর্মীয় আচার-ব্যবহারের এবং চিন্তা-ভাবনার যে সংমিশ্রণ-প্রক্রিয়া চলেছিল, তা স্বীকার করেই পণ্ডিতবর্গ 'সিন্‌ক্রেটিক' ইসলামের কথা চিন্তা করেছেন।[১২]

ইসলামের এই ভিন্ন আঞ্চলিক রূপ এই কথাও প্রমাণ করে যে এর অনুসারীরা অধিকাংশই হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রদায় থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান, যারা তাদের পূর্বের অভিজ্ঞতা দিয়ে নতুন বিশ্বাসকে নিজের মতো করে গড়ে তুলেছিল। তাই বাংলার এই ব্যাপক ধর্মান্তরের প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান অত্যন্ত যুক্তিসংগত। ধর্মান্তর একটা মানসিক প্রক্রিয়ার ফল। তাই সমাজ-মানসিকতার দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রেক্ষাপটের বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

বাংলার প্রাচীন যুগের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল ধারার সঙ্গে ধর্মীয় অঙ্গনের সম্পর্ক রয়েছে। মৌর্য-গুপ্ত যুগে রাজনৈতিক সত্তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ ঘটে। জৈনধর্মের খুব একটা প্রসার ঘটেছিল বলে মনে হয় না। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে শশাঙ্ক কর্তৃক বৌদ্ধনিধনের অভিযোগ থাকলেও য়ুয়াং চুয়াং-এর বর্ণনা থেকে একথা স্পষ্ট যে বাংলার পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশে বৌদ্ধধর্মের প্রসার তিনি দেখেছিলেন।[১৩] অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল থেকে প্রায় চারশ বছর ব্যাপী বৌদ্ধ পাল সম্রাটদের শাসন এবং নবম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বৌদ্ধ দেব ও চন্দ্র রাজবংশের শাসন বাংলায় বৌদ্ধধর্মের বিকাশে সাহায্য করেছিল।[১৪] পাশাপাশি হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরও প্রসার ঘটেছিল, তারা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করেছে। ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন বাংলায় ধর্মীয় ক্ষেত্রে সহনশীলতা লক্ষ্য করেছেন।[১৫] প্রাচীন যুগে অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে বৌদ্ধ সম্রাট শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও চতুর্বর্ণ প্রথার প্রতি নিজেদের একাত্মতা ঘোষণা করেছেন বা হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করেছেন। প্রাচীন তাম্রলিপিসমূহে বংশাবলী ও ভূমিদান অংশে প্রমাণ রয়েছে যে বৌদ্ধ সম্রাটের সভাসদ, সভাকবি ও অমাত্যবর্গ ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধ সম্রাটদের প্রশস্তি পৌরাণিক আলেখ্যতে ভরপুর। বৌদ্ধ রাজারা হিন্দু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি এত শ্রদ্ধাশীলরূপে প্রতীয়মান

১১. আবদুল মমিন চৌধুরী, "প্রাচীন বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় মনোভাব, ঐতিহ্য ও শাশ্বত রূপ", 'সমাজ নিরীক্ষণ', ৮ (জুলাই ১৯৮৩), পৃ. ৬৪-৭৫।

১২. M. R. Tarafdar, *Hussain Shahi Bengal, A Socio-Political Study* (Dhaka, 1965), pp 198-225; A. Roy, *The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal* (New Jersey, 1983).

১৩. S. Beal, *Buddhist Records of the Western World*, II (London, 1884), 194-202.

১৪. P. Niyogi, *Buddhism in Ancient Bengal* (Calcutta, 1980), pp 1-48.

১৫. R. C. Majumdar, *History of Ancient Bengal* (Calcutta, 1974), pp 532-536,

www.pathagar.com

হন যে তা থেকে অনেকেই মনে করছেন যে তাঁরা বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করেছিলেন।[১৬] বাংলার বৌদ্ধ রাজাদের অধিকাংশ ভূমিদানই লাভ করেছে হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও উদারতার মনোভাব প্রাচীন যুগে খুবই স্পষ্ট। প্রাচীন বাংলার 'ব্যক্তিত্বে' নীহাররঞ্জন রায় মানবতাবোধের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ও অতীব শ্রদ্ধা লক্ষ্য করে বলেছেন যে, "এই উদার সাম্যভাবনা ও মানবতার আদর্শই মধ্যপর্বের হাতে আদিপর্বের শ্রেষ্ঠতম, মহত্তম উত্তরাধিকার।"[১৭]

প্রাচীন পর্বে এই মানবতার মনোভাব ও আদর্শের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নীহাররঞ্জন রায় আর্য-পূর্ব যুগের উত্তরাধিকার, বাংলার জনগোষ্ঠিতে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ এবং দুর্বল আর্য-প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৮] আর্য-পূর্ব যুগে উন্নত সভ্যতার আবিষ্কার হওয়ার ফলে এই মতবাদ এখন আর গ্রহণযোগ্য নয় যে আর্যরাই বাংলায় সভ্যতার স্রষ্টা, বরঞ্চ এখন স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আর্যদের আগমনের বহু পূর্বেই বাংলার আদি জনগোষ্ঠি সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রা ও সভ্যতা-সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তবে এই আদি জনগোষ্ঠির নৃতাত্ত্বিক ও জাতিগত বিশ্লেষণে তেমন কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আর্য-পূর্ব জনগোষ্ঠিকে অস্ট্রিক বা অস্ট্রো-এশিয়াটিক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীকালে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দ্রাবিড় ও তিব্বতী-বর্মী ভাষাগোষ্ঠি।[১৯] খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ থেকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলায় আর্য প্রভাব বিস্তারলাভ করেছে এবং পরবর্তী দুই শতাব্দীব্যাপী গুপ্ত শাসনকালে তা দৃঢ় হয়েছে। এই অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে বাংলায় আর্য সভ্যতার আগমন বাংলা ও আর্য সভ্যতা উভয়ের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ ছিল: দীর্ঘ পূর্বমুখী বিস্তারকালে আর্য সভ্যতা স্বভাবতই ক্ষীণ হয়ে পড়েছে এবং ইত্যবসরে বাংলার আর্য-পূর্ব ঐতিহ্য দৃঢ় হবার ও বাংলার ব্যক্তিত্বে নিগূঢ়ভাবে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ পেয়েছে। এই কারণেই বাংলায় আর্য-বৈশিষ্ট্যের শিথিলতা ও পরিমিতি লক্ষ্য করা যায় এবং আর্য ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিতে এমন অনেক উপাদান লক্ষ্য করা যায় যা বাংলার নিজস্ব। প্রত্ন-বাংলা লিপির উদ্ভব, বাংলার বিশেষ উত্তরাধিকার-আইন (জীমূতবাহন কর্তৃক নিবন্ধীকৃত), দুর্গা দেবীর প্রতি বাংলার বিশেষ আকর্ষণ, তান্ত্রিক মতবাদের বিকাশ প্রভৃতির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে এসব বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতি বাংলার স্বকীয়তার কথাই ঘোষণা করে।[২০] এ সবই আর্য-পূর্ব উত্তরাধিকারের প্রভাব এবং আর্য-পূর্ব উপাদানের সঙ্গে আর্য-উপাদানের সংমিশ্রণের ফল বলে অভিহিত করা যায়।

---

১৬. দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার বৌদ্ধ রাজা লড়হ চন্দ্র ও গোবিন্দ চন্দ্র বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করেছিলেন বলে মত প্রকাশ করেছেন R. K. Sarma, *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, XVII, 25 ff.

১৭. নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', আদি পর্ব (কলিকাতা, ১৩৫৬), পৃ. ৮৬৩।

১৮. ঐ, পৃ. ৮৬০-৬৩।

১৯. আর. সি. মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭ থেকে; নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-৭১।

২০. আর. সি. মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৮; অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের জন্য পৃ. ৪১৩ থেকে : নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৩ থেকে, পৃ. ৮৩৩ থেকে এবং পৃ. ৮৫০ থেকে।

www.pathagar.com

ধর্মীয় জীবনে আর্য-পূর্ব উত্তরাধিকার আরও গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। যদিও যুগে যুগে বৈষ্ণব, শৈব, বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মের জনপ্রিয়তার তারতম্য হয়েছে, তবে একথা বলা যায় যে বাংলায় সামগ্রিকভাবে বৈষ্ণব মতবাদের জনপ্রিয়তা অধিক ছিল। ব্যারি মরিসন পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর লিপিসমূহ বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, উত্তর, মধ্য ও পূর্ব বাংলায় বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ভূমিদানের মধ্যে বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠানই সর্বাধিক দান লাভ করেছে। ব্যারি মরিসন এই সিদ্ধান্ত করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি যে, প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় মতবাদ ছিল বৈষ্ণব মতবাদ, শৈব এমনকি বৌদ্ধ মতবাদ নয়।[২১] হিন্দুধর্মের এই বিশেষ মতবাদের প্রতি বাংলার অগ্রাধিকার বাংলার ব্যক্তিত্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্যেরই পরিচায়ক—যে বৈশিষ্ট্যকে নীহাররঞ্জন রায় উদার সাম্যভাবনা ও মানবতার আদর্শ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সামগ্রিকভাবে একথা বলা যায় যে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে বাংলা নিজের মতো করে গড়ে তুলেছিল, আগত বৈদিক ধর্মবিশ্বাসকে নিজের আর্য-পূর্ব মানসিকতা দিয়ে ও স্থানীয় উদারতা দিয়ে সিক্ত করেছিল—যার মধ্যে মানবতা ও উদারতা প্রাধান্য লাভ করেছিল।

অন্যদিকে উদার মনোভাবাপন্ন বৌদ্ধধর্মকেও বাংলা মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিল। বাংলার উদার মানবতাবোধের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মৌলিক চিন্তাধারা একই তরঙ্গে প্রবাহিত হয়েছিল বলেই হয়তো বৌদ্ধধর্ম উপমহাদেশের এই পূর্বাঞ্চলীয় ভূভাগেই অধিক অনুসারী লাভ করেছিল। অবশ্য দীর্ঘকাল পাশাপাশি অবস্থানের ফলে এবং বাংলায় বিশেষ একাত্মকরণের প্রক্রিয়ার ফলে বৌদ্ধধর্মের আদিরূপও বাংলায় টিকে থাকে নি। ব্রাহ্মণ্য মতবাদ ও বৌদ্ধ মতবাদের মধ্যে যে বিরোধ ছিল, ধীরে ধীরে তা শিথিল হয়ে উঠেছে, বিরোধের উগ্রতা প্রশমিত হয়েছে এবং সংমিশ্রণ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধ সৃষ্টি হয়েছে।[২২] তারনাথের বিবরণে কালচক্রযান ও তন্ত্রযানসহ পাঁচ তন্ত্রের উল্লেখ এবং যেসব কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে, তা স্পষ্টতই বৌদ্ধধর্মের অবনতির পরিচয় বহন করে। তারনাথের বক্তব্য থেকে দেবীপ্রাসাদ চট্টোপাধ্যায় এই মন্তব্য করেছেন যে, যেসব বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে এবং যা প্রত্যাখ্যান করে বুদ্ধ নিজে তাঁর ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্ম তারই কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। সব রকমের দেব-দেবীর (কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন নাম দিয়ে, আবার অনেক ক্ষেত্রে নাম পরিবর্তন না করেই) পূজা ও আচার-অনুষ্ঠান বৌদ্ধধর্মে অনুপ্রবেশ করে এমন এক রূপ পরিগ্রহ করেছিল যে, লৌকিক হিন্দুধর্ম থেকে তা খুব একটা ভিন্ন ছিল না।[২৩] এই পরিবর্তনকেই বাংলার বৌদ্ধধর্মের বজ্রযান ও তন্ত্রযান বা সহজযান ও কালচক্রযানে রূপান্তর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[২৪] বাংলার বৌদ্ধধর্মের এই লোকজ সংস্কৃতি হয়তো-বা বাংলার আর্যপূর্ব উত্তরাধিকারের কারণেই ঘটেছিল। নিজের মানসিক পরিমণ্ডলে নিজের করে গ্রহণ করার প্রবণতা ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম উভয়ের ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়।

২১. Barrie M. Morrison, *Political Centers and Cultural Regions in Early Bengal* (Tucson, 1970), p 154 ; লিপিবিশ্লেষণ পৃ. ৮৪ থেকে এবং সারণী ৬-১২।

২২. পি. নিয়োগী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮।

২৩. Lama, Chimpa and D. Chattopadhyaya (tr.), *Taranatha's History of Buddhism in India* (Simla, 1970), Preface, pp xii-xiii.

২৪. আর. সি. মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৭।

www.pathagar.com

দাক্ষিণাত্য থেকে আগত গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুসারী সেন রাজবংশের ক্ষমতা-অধিকার বাংলার ধর্ম-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এক নতুন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। উদারতা ও সহিষ্ণুতাপূর্ণ ধর্ম-সামাজিক ক্ষেত্রে সেনদের গোঁড়া মতবাদ আঘাত হেনেছিল। সামাজিক বর্ণবিন্যাসের কঠোরতা সেন-যুগে প্রবল হয়ে উঠেছিল। সৃষ্টি হয়েছিল রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র, যাদের প্রাধান্য একাধারে কৃষক সম্প্রদায় ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রাধান্যকে খর্ব করেছিল। গোঁড়া মতাবলম্বী সেনদের আবির্ভাবকে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তির জন্য দায়ী করে মত পোষণ করেছেন ট্রেভর লিং। তিনি যথার্থই বলেছেন যে, দাক্ষিণাত্যের গোঁড়ামি নিয়ে সেন বংশ বাংলায় বৌদ্ধ শাসনামলে পরিপুষ্ট সামাজিক উদারতাকে যে প্রশ্রয় দেবে, একথা আশা করা যায় না। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি এই যুক্তি উত্থাপন করেছেন যে বৌদ্ধধর্ম শ্রীলঙ্কা, বার্মা, শ্যাম বা চীনে বিলুপ্ত হয়নি। কিন্তু বৌদ্ধ সমাজের উপর হিন্দু প্রভাব প্রাধান্য বিস্তার করার পর সুমাত্রা, জাভা এবং মালয়ে বৌদ্ধধর্মের জন্য সংকট এসেছিল। পরবর্তীকালে এইসব দেশেই ইসলাম প্রাধান্য পেয়েছিল। বার্মা বা শ্যামে যেখানে থেরবাদী বৌদ্ধমত প্রভাবশালী ছিল, ইসলাম সেখানে খুব একট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। তাই বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তিতে হাত ছিল তার নিকট-আত্মীয়েরই, বহুদূর থেকে আগত ইসলামের নয়।[২৫]

সেনযুগে গোঁড়া হিন্দুধর্মের প্রভাব পুনর্বিস্তারের ফলে সমাজে দৃঢ়ভাবে এসেছিল জাতিভেদ, যার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জন্ম নিয়েছিল 'মিস্টিসিজম' বা মরমীবাদ (হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় প্রকারেরই)। এই প্রতিক্রিয়াই ধরা পড়েছে সরোজবজ্রের 'দোহাকোষে'। এর থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি বাংলার উদার-যুক্তিবাদের পরিচয় দেবে: (ক) হোমাগ্নি মুক্তি প্রদান করে কিনা, কেউ জানে না; তবে তার ধোঁয়া চোখকে নিশ্চিতভাবে পীড়িত করে; (খ) যদি নগ্নতা (বৌদ্ধ ও জৈন ক্ষপণক সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রচলিত) মুক্তি প্রদান করতে পারে, তাহলে কুকুর ও শৃগাল তা পাবে সবার আগে; (গ) বলা হয়ে থাকে যে ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণদের জন্ম হয়। কিন্তু তাতে কি? আজকাল তাদের জন্ম হয় অন্য সবার মতই—তাহলে তাদের উচ্চতর অবস্থানের কারণ রয়েছে কি? (ঘ) যদি একথা স্বীকার করা হয় যে ব্রাহ্মণরা বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে উচ্চতর স্থান অর্জন করে, তাহলে চণ্ডালদের ঐসব 'সংস্কার' পালন করতে দেওয়া হোক যাতে তারা ব্রাহ্মণ হতে পারে। যদি তোমরা বলো যে বেদের জ্ঞানই তাদের ব্রাহ্মণ করে, তাহলে চণ্ডালকে বেদ পড়তে দাও।[২৬] 'দোহা'সমূহে সমাজচিন্তা ও মনোভাবের যে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাতে সেনযুগের গোঁড়ামির প্রতি বাংলার ব্যক্তিত্বের উদার মনোভাবের প্রতিক্রিয়াই প্রতিফলিত হয়েছে। আর এই মানসিকতাকে যদি যুগের প্রতিনিধিত্বমূলক বলে গণ্য করা যায়, তাহলে সেখানে যে-কোন নতুন মতবাদ বা ধর্মমতের সহজ বিস্তার খুবই স্বাভাবিক। নিপীড়িত বৌদ্ধদের ইসলামগ্রহণের তথ্য 'শূন্যপুরাণে'র "নিরঞ্জনের রুষ্মা"য়[২৭] বিবৃত

২৫. Trevor Ling, "Buddhist Bengal and After", D. Chattopadhyaya (ed.), *History and Society* (Calcutta, 1976), pp 320-323.

২৬. আর. সি. মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৩৪-৫৩৬।

২৭. চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'শূন্যপুরাণ' (কলিকাতা, ১৩৩৬); এ. করিম, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৩-১৪৪।

www.pathagar.com

রয়েছে এবং এই কাহিনীকে বৌদ্ধ-হিন্দু সংঘাতের ফলে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠি কর্তৃক ইসলাম-গ্রহণের দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।[২৮]

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে মমতাজুর রহমান তরফদার[২৯] বাংলায় ইসলামে ধর্মান্তরের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণীভুক্ত জনগোষ্ঠির ইসলামধর্ম-গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণদ্বয়ের উপরে ভিত্তি করে তিনি দেখিয়েছেন যে, মুসলমানদের আগমনের পর সমাজের রক্ষণশীল শ্রেণী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় নিজেদের প্রাধান্য রক্ষার্থে বাংলার হিন্দু সমাজে শ্রেণীভেদ-প্রথা নতুন করে ঢেলে সাজাতে প্রয়াসী হয়েছিল। তাদের সার্বিক প্রাধান্যরক্ষার উদ্দেশ্যে সমাজের শ্রম-জীবী সম্প্রদায়সমূহকে শূদ্র গোষ্ঠিভুক্ত করা হয়েছিল। তাছাড়া অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য শ্রেণী-ভুক্ত করা হয়েছিল আরো অনেক পেশাজীবী জনগোষ্ঠিকে। এইসব জনগোষ্ঠি বর্ণাশ্রম-ধর্ম থেকে বিতাড়িত হয়ে অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্তির লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, বাংলায় মুসলিম শাসন প্রবর্তনের ফলে এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল; সমাজের উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠি মুসলমান-দের সংস্পর্শে আসতে বাধ্য হচ্ছিল; ফলে তাদেরকে ব্রাহ্মণ-শাসিত হিন্দু সমাজ নিচের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল এবং তাদেরকে ম্লেচ্ছ-অস্পৃশ্য-অন্ত্যজ সমাজভুক্ত করা হয়েছিল। এই প্রক্রিয়া থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যেই তাদের ইসলামগ্রহণ। এছাড়া পুলিন্দ, পুক্কস, খস, কম্বোজ, শবর, খর, কোল, মেচ, তিহার প্রভৃতি আদিবাসী সমাজ, যারা মূলতঃ কৃষিজীবী ছিল, তাঁতি সহজেই সুফিদের প্রচারণায় আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তরফদার একথাও বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেই কারণেই ঐ অঞ্চলে ধর্মান্তর তেমন ব্যাপক হয় নি।

তরফদারের এই শেষের উক্তিটি আমাদের মতের সমর্থন জোগায়। মুসলমানদের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলার যে অংশগুলোতে বৌদ্ধদের অবস্থিতি হিন্দুদের পাশাপাশি ছিল এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সহনশীলতা ও উদারতার ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল সেই অংশগুলোতেই ব্যাপকভাবে ইসলামে ধর্মান্তর হয়েছে। উত্তর বাংলা ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় এই অবস্থা বিরাজমান ছিল, পশ্চিম বাংলায় নয়। তাই সেন-আগমনে যে আঘাত এসেছিল, যার কথা আমরা আগে বলেছি, তা উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বেশি অনুভূত হয়েছিল, তাই এই অংশে ধর্মান্তরও ঘটেছে ব্যাপকভাবে। হিন্দু-বৌদ্ধ সংঘাত এবং এই সংঘাতের ফলে উদ্ভূত ধর্ম-সামাজিক মানসিকতার আন্দোলন ধর্মা-ন্তরের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

অবশ্য তরফদারের বক্তব্যে অন্য যেসব যুক্তি স্থান পেয়েছে, ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে সেগুলোর ভূমিকার কথা অস্বীকার করা যায় না। তরফদারের বক্তব্যে আরেকটি গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয় রয়েছে। পশ্চিম বাংলার বাণিজ্যিক প্রাধান্য অষ্টম শতাব্দীর পর বিলুপ্ত হয়েছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা উপকূলবর্তী হওয়ায় বহির্বাণিজ্যের সুফল বহুদিন

২৮. রমেশচন্দ্র মজুমদার, কমলা বক্তৃতামালা, পৃ. ১৩-১৬।

২৯. M. R. Tarafdar, "The Bengali Muslims in the Pre-Colonial Period : Problems of Conversion, Class Formation and Cultural Evolution", p 93 ff.

www.pathagar.com

পর্যন্ত ভোগ করেছে। অন্য একটি প্রবন্ধে তরফদারই দেখিয়েছেন [৩০] যে, অষ্টম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা বাণিজ্যিক অর্থনীতির কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এবং এই কারণেই এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম বাংলায় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। সেনযুগে কৃষিভিত্তিক শ্রেণী ও আমলা শ্রেণীর হাতে অর্থনীতি কুক্ষিগত হওয়ায় বাণিজ্য অবহেলিত হয়েছিল এবং ফলে বৌদ্ধধর্ম পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছিল। মুসলমানদের আগমনের পর বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির সঙ্গে ধর্মান্তরের সম্পর্ক তরফদার অত্যন্ত যুক্তিসংগতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

তরফদার অন্য যেসব যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, তাদের যথার্থতা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন তোলা যায়। হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্য-অন্ত্যজ অংশ মুক্তিলাভের জন্য ধর্মান্তরিত হবে—এটি অতি সহজ ব্যাখ্যা। এই যুক্তির প্রাসংগিকতা নিশ্চয়ই আছে। তবে এই ধরনের অবস্থা হিন্দু সমাজের সব অঞ্চলেই ছিল। উত্তর ভারতে বা দক্ষিণ ভারতে সমাজ-ব্যবস্থায় নিম্নশ্রেণীর প্রতি এই ধরনের মনোভাব নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সেসব অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীভুক্ত হিন্দু সমাজ তো ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত হয় নি। নিশ্চয়ই তার কোন কারণ আছে। একটি ভীতি সব সময়েই ধর্মান্তরের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। ধর্মান্তরের ফলে নিজের অত্যন্ত আপনজনদের সংগে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ হবে। এই মূল্য দিতে অনেকেই সহজে এগিয়ে আসবে না। সামাজিক মুক্তি বড় না আপনজদের সঙ্গে সম্পর্ক বা নিজের প্রিয় পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখার প্রশ্নটি বড়—এই দ্বিধা ধর্মান্তরের প্রতিবন্ধক সূত্র হিসেবে কাজ করেছে। যে সমাজে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমাজব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি প্রশ্নাতীতভাবে গৃহীত, সে সমাজে সামাজিক মুক্তির জন্য ধর্মান্তরে কোন প্রকার আগ্রহ না থাকারই কথা। সমাজের বদ্ধমূল ধ্যান-ধারণা সাধারণ মানুষের কাছে চিরন্তন অপরিবর্তনীয় সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাই উত্তর ভারতে বা দক্ষিণ ভারতে, এমনকি হয়তো পশ্চিম বাংলায়, ধর্মান্তর ব্যাপকভাবে গ্রামীণ সমাজকে আন্দোলিত করতে পারে নি।

কিন্তু যে সমাজ তার উদার মানসিকতা দিয়ে সব ধর্মের অনুশাসনকে নিজের করে নিয়েছে, যেখানে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম তেমন দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলতে পারেনি, আদি উপ-জাতীয় আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস ও অনুশাসন এই ধর্মবিশ্বাসকে স্বকীয় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত করেছে, যেখানে বৌদ্ধধর্ম সহিষ্ণুতার ও মানবতার বাণী ছড়িয়ে দীর্ঘকাল এখানকার 'ব্যক্তিত্বে' এক মানবতাবোধের বীজ রোপণ করেছে, যেখানে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে (হিন্দু ও বৌদ্ধ) সংমিশ্রণ-প্রক্রিয়ার লক্ষণ স্পষ্টভাবে দৃষ্ট, সেখানে নতুন করে গোঁড়ামির প্রবর্তন এবং গোঁড়ামিপ্রসূত সমাজবিন্যাস প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে বাধ্য। তাই বাংলায় ব্যাপক ধর্মান্তর ঘটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া ইসলামের উদারনৈতিক ভ্রাতৃত্ববোধ হয়তো এই আঞ্চলিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অনেকাংশে মিলে গেছে। আলোড়িত ধর্ম-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ইসলাম-বিস্তারের পথ সুগম হয়েছে।

---

৩০. M. R. Tarafdar, "Trade and Society in Early Medieval Bengal", *The Indian Historical Review*, IV, No. 2, 283.

www.pathagar.com

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমদের যুক্তি কিছুটা সমর্থন লাভ করে। শ্রীলংকা, বার্মা, শ্যাম বৌদ্ধপ্রধান অঞ্চল ছিল। ইসলাম এইসব দেশে বাণিজ্যিক সূত্রে প্রায় একই সময়ে বিস্তারলাভ করেছে। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনগণ ধর্মান্তরিত হয়ে এইসব দেশকে মুসলমানপ্রধান দেশে পরিণত করেনি। কিন্তু ইন্দোনেশিয়াতে (অর্থাৎ সুমাত্রা, জাভা ও মালয় দ্বীপে) ইসলাম বিস্তার-লাভ করেছে এবং মুসলমানপ্রধান দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। ইন্দোনেশিয়াতে বাংলার অনুরূপ ধর্ম-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজমান ছিল। সেখানেও আদি সভ্যতার বিকাশ, পরবর্তীকালে হিন্দু-বৌদ্ধ সাম্রাজ্য স্থাপন ও সহ-অবস্থান, হিন্দু প্রভাবে বৌদ্ধধর্মে পরিবর্তন এবং শেষ পর্যায়ে ব্রাহ্মণ্য-প্রাধান্য-সংবলিত শ্রেণীবিভক্ত সমাজ-প্রতিষ্ঠায় হিন্দু সাম্রাজ্য, 'ওয়ালি সংঘ', উলেমা ও 'কিজাজি' সম্প্রদায়ের চেষ্টায় ইসলামের ব্যাপক প্রসার। সেখানেও ইসলাম পূর্ববর্তী অনেক বিশ্বাস, অনেক আচার-অনুষ্ঠানকে স্থান দিতে বাধ্য হয়েছে এবং সেখানকার ইসলামেরও স্থানীয় বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিরাজমান।[৩১]

৩১. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন : A. M. Chowdhury, "Conversion to Islam in Bengal, An Exploration", Rafiuddin Ahmed (ed.), *Islam in Bangladesh* (Dhaka, 1983), pp 22-26.

www.pathagar.com

আলাওলের আত্মকথা : দেশ ও কাল

ওয়াকিল আহমদ*

আলাওলের জীবনের দ্বিতীয় পর্ব আরাকানের রাজধানী রোসাঙ্গে অতিবাহিত হয়। তাঁর কৈশোর-উত্তর জীবনের এটি ছিল সৃষ্টিশীল পর্ব। আলাওলের প্রতিভার উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি এই শহরে ঘটে। এই অর্থে এটি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ পর্ব।

আলাওলের প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ 'পদ্মাবতী' রচিত হয় ১৬৪৮, মতান্তরে ১৬৫১, সালে। রোসাঙ্গের প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের অনুরোধে ও পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি কাব্যখানি রচনা করেন। তখন কবির বয়স অন্যূন পঞ্চাশ বছর। সর্বোর্ধ্ব বিশ বছর বয়সে তিনি 'হার্মাদ দস্যু' কর্তৃক অপহৃত হলে, এই বিশ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত, কবির জীবনের এই ত্রিশ বছরের ইতিহাস কি? তিনি এই অংশ সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে 'পদ্মাবতী' কাব্যে বলেন,

কহিতে বহুল কথা দুঃখ আপনার।
রোসাঙ্গে আসিয়া হৈলুং রাজ আসোয়ার।।
বহু মুসলমান সব রোসাঙ্গে বৈসেন্ত।
সদাচারী কুলীন পণ্ডিত গুণবন্ত।।
সবে কৃপা করেন্ত সম্ভাস বহুতর।
তালিব এলম বুলি করেন্ত আদর।।
মুখ্য পাটেশ্বরীর অমাত্য মহাজন।
সত্যবাদী জীতেন্দ্রিয় ঠাকর মাগন।।
ভাগ্যোদয় হৈল মোর বিধি পরসন।
দুঃখ নাশ হেতু তান সঙ্গেত মিলন।।
অনেক আদর করি বহুল সম্মান।
সতত পোষন্ত আমা অন্ন বস্ত্র দান।।
মধুর আলাপে বশ হৈল মোর মন।
তান গুণ সূত্র হৈল গ্রীবাএ বন্ধন।।
গুণিগণ থাকন্ত তাহার সভা ভরি।
গীত নাট যন্ত্র বাহি রঙ্গ টঙ্গ করি।।
নানান প্রসঙ্গ কথা কহি নানা ছন্দ।
তান সভা মধ্যে থাকোঁ করিআ আনন্দ।।[১]

---

*ওয়াকিল আহমদ, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. শেষ দুই চরণের পাঠান্তর এরূপ :
নানান প্রসঙ্গ কথা কহিয়া সতত।
তান সভা মধ্যে থাকি হৈয়া সভাসদ।।
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (সম্পাদিত), 'পদ্মাবতী' (ঢাকা, ১৯৫০), পৃ ২৫।

www.pathagar.com

আলাওলের শেষ কাব্য 'সিকান্দারনামা'য় (১৬৭৩) কিঞ্চিৎ অধিক তথ্য আছে। তাঁর ভাষায় :

না পাইলুঁ সৎ পদ আছে আঙ্গলেস।
রাজ আসোয়ার হৈনু আসি এই দেশ॥
রোসাঙ্গেত মুসলমান যথেক আছন্ত।
তালিব এলম বুলি আদর করন্ত॥
বহু মহন্তের পুত্র মহা মহা নর।
পাঠ গীত সঙ্গীত শিখাইলুঁ বহুতর॥
বহুত মহন্ত লোকে কৈল গুরুভাব।
সকলের কৃপা হোন্তে ছিল বহু লাভ॥

হার্মাদের সঙ্গে যুদ্ধে আলাওল পিতাকে হারিয়ে নিজে আহত অবস্থায় তাদের দ্বারাই রোসাঙ্গে নীত হন। তিনি তাঁর বন্দীদশার কথা বলেন নি। হার্মাদরা বাংলার যেসব নর-নারীকে বন্দী করে আরাকানে নিয়ে যেত, আরাকানের রাজা প্রয়োজন ও পছন্দমত তাদের শ্রমের কাজে নিয়োগ করতেন, এরূপ বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। আলাওল আঙ্গলেসের কারণে ভাল 'পদ' পান নি, 'রাজ-আসোয়ারে'র পদ পান। এটি অশ্বারোহী সৈন্যের পদ। এর পর তিনি নিজেকে 'তালিব এলম' বলে উল্লেখ করেন। তালিব অর্থ ছাত্র, এলম্ অর্থ জ্ঞান : একত্রে শিক্ষার্থী বা বিদ্যার্থী বোঝায়। রোসাঙ্গের মুসলমান পদস্থ ব্যক্তি 'তালিব এলম' হিসাবে তাঁকে সমাদর করতেন। তাহলে অবস্থা এরূপ দাঁড়ায় যে, আলাওল অশ্বারোহী সৈন্যের পদ ছেড়ে বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। এর পরেই আছে তিনি মহন্তের গৃহে তাঁদের সন্তানদের 'নাট গীত সঙ্গীত' শিক্ষা দেন। এখানে তিনি 'গুরু'র মর্যাদা পান। এ-পেশায় তিনি ভাল অর্থ উপার্জন করেন। এরূপ অবস্থার মধ্যেই তিনি রোসাঙ্গের প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের সুদৃষ্টিতে পড়েন। তিনি আলাওলের অন্ন-বস্ত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং স্বীয় সভায় তাঁকে স্থান দেন। 'তান সভাসদ হৈয়া থাঁকো অনুক্ষণ'। এতে বোঝা যায় তাঁর দায়িত্ব ছিল সার্বক্ষণিক। অমাত্য-সভায় আলাওল কি করতেন? তাঁর ভাষায়—'নানান প্রসঙ্গ কথা কহি নানা ছন্দ' [পাঠান্তর 'নানান প্রসঙ্গ কথা কহিয়া সতত']। আলাওল কবিতার ছন্দে নানা প্রসঙ্গ কথা বলে মাগন ঠাকুরকে সঙ্গ ও আনন্দ দিতেন। নাট-সঙ্গীত-কাব্য-খ্যাতির কারণে তিনি মাগনের সভায় স্থান পান। আর একই কারণে অল্পকাল পরে কাব্যরচনার আদেশ পান। আলাওলের ভাষায় :

একদিন মহাশয় বসিয়া আসনে।
নানা রস প্রসঙ্গ কহেন্ত গুনিগণে॥
কেহ গাহে, কেহ কহে, কেহ খেলে খেলা।
সুধাকর বেড়ি যেন তারাগণ মেলা॥
হেনকালে শুনি পদ্মাবতীর কথন।
পরম হরিষ হৈল পাত্রবর মন॥
কৌতুকে আদেশ কৈলা পরম হরিষে।
পূর্ণ দ্বিজরাজে যেন আসিয়া বরিষে॥...

www.pathagar.com

তাহান আদেশ মাল্য ধরিয়া মস্তকে।
অঙ্গীকার কৈল মুঞি রচিতে পুস্তকে।।

পূর্ব থেকে কবি-খ্যাতি না থাকলে মাগন ঠাকুর আকস্মিকভাবে তাঁকে এরূপ অনুরোধ করতেন না। সাধারণ মানের কবি-খ্যাতি নয়, কেননা হিন্দী কবি মালিক মোহাম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যের অনুবাদ সহজসাধ্য ছিল না। 'পদ্মাবতী' আলাওলের শ্রেষ্ঠ কাব্য; এখানেই তাঁর প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। সুতরাং সহজে অনুমান করা যায় যে, 'পদ্মাবতী'-রচনার পূর্বে আলাওলের কবি-প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশ হয়েছিল। আলাওল পাঁচখানি পূর্ণ কাব্য ছাড়াও একখানি খণ্ড কাব্য, একখানি 'রাগতালনামা' ও বৈষ্ণব পদের আদর্শে কিছু গীতি-কবিতা রচনা করেন। 'রাগতালনামা' ও গীতি-কবিতার রচনাকালের উল্লেখ নেই। 'রাগতালনামা'র পূর্ণ পুঁথি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। আমাদের গভীর বিশ্বাস, পদ ও রাগতালনামা কবির প্রথম দিকের রচনা। বিশেষতঃ তিনি যখন 'নাট-গীত-সঙ্গীতে'র শিক্ষকতা করেন, তখন পেশার কারণে এগুলি রচনা করেন। কোন কোন পদের ভণিতায় মাগন ঠাকুরের নাম আছে।

শ্রীযুত মাগন আরতি কারণ
হীন আলাওলে ভনে।

অথবা

আরতি মাগনে আলাওল ভনে
যদি প্রভু না হএ বামা।

'সিকান্দরনামা'র কয়েকখানি পাণ্ডুলিপিতে 'তালিবি এলম'-এর পাঠান্তর 'তালিমি এলম' আছে।[২] 'তালিম' শব্দের অর্থ শিক্ষাদান। তালিমি এলম-এর অর্থ বিদ্যাশিক্ষা-দাতা। আমাদের ধারণা 'তালিমি এলম' পাঠই অধিক সংগত। রাজ-আসোয়ারের পদ ছেড়ে 'তালিবি এলম' না হয়ে 'তালিমি এলম' হওয়াই স্বাভাবিক। আলাওল বিদ্যা-শিক্ষার পর্ব ফতেহাবাদে সম্পন্ন করেন। রোসাঙ্গের প্রবাস ও নিঃসঙ্গ-জীবনে 'তালিব এলম' হওয়ার সংগতি তাঁর ছিল না। 'তালিমি এলম' হিসাবে তিনি মহন্তের ঘরে ঘরে 'নাট-গীত-সঙ্গীত' শিক্ষা দেন, 'গুরুভাবে' সম্মান পান এবং 'বহু লাভ' দ্বারা আর্থিক অবস্থার উন্নতি করেন। আলাওল ছাত্রের বয়সকালে অপহৃত হন বলে তাঁর জন্মের যে সময় নির্ধারণ করা হয়, এতে তা পরিবর্তনের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা যায়।

আলাওলের পৃষ্ঠপোষক রোসাঙ্গের 'মুখ্য পাত্র' বা প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের পরিচয় কি? তিনি কখন কিভাবে মুখ্যমন্ত্রী হন? আলাওল তার বিবরণ দেন এভাবে:

যখনে আছিল বৃদ্ধ নৃপ অধিকারী।
যশস্বিনী নারী ছিল গৃহে পাটেশ্বরী।।
পরমা সুন্দরী কন্যা অতি সুচরিতা।
বহু স্নেহে পুষিলা নৃপতি নিজ সুতা।।...
কন্যার বৈভব দেখি ভাবে নরনাথে।

২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ক্রমিক সংখ্যা ৫৩১, ৫৩২ ও ৫৩৫ নং পাণ্ডুলিপিতে এরূপ পাঠান্তর আছে। আহম্মদ শরীফ (সম্পাদিত), 'সিকান্দরনামা' (ঢাকা, ১৯৭৭), পৃ ৫৪-৫৬,২৮৭।

www.pathagar.com

এতেক সম্পদ সমর্পিমু কার হাতে।।
এক মহাপুরুষ আছিল সেই দেশে।
মহাসত্য মোসলমান সিদ্দিকের বংশে।।
নানা গুণ পারগ মোহন্ত কুলশীল।
তাহাকে আনিয়া নৃপ কন্যা সমর্পিল।।
বৃদ্ধ নরপতি যদি গেল স্বর্গপুরী।
সেই কন্যাবর হৈল মুখ্য পাটেশ্বরী।।
শৈশবের পাত্র দেখি মনে স্নেহ ভাবি।
মুখ্য পাত্র করিআ রাখিল মহাদেবী।।...
রাজসৈন্য মন্ত্রী ছিল বড়াহি ঠাকুর।
প্রভুত মাগিআ পাইল কুলদীপ সুর।।...
সজীব থাকিতে সৈন্য মন্ত্রী মহাশয়।
নিজ গুণে পাইছিলা বাপের বিষয়।।
অখনে হইল মহাদেবীর মুখ্যমন্ত।
কতেক কহিব রূপগুণের মহন্ত।।

—সংকীর্তি মাগনের প্রশংসা

রোসাঙ্গের অধিপতি নরপতিগী (১৬৩৮-৪৫) বৃদ্ধ বয়সে তাঁর একমাত্র কন্যার অভিভাবকত্বের ভার মাগন ঠাকুরের উপর ন্যস্ত করেন। কারণ তিনি 'নানা গুণ পারগ মোহন্ত কুলশীল' ছিলেন। তিনি 'সিদ্দিক বংশে' জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বড়াহি ঠাকুর 'রাজসৈন্য মন্ত্রী' ছিলেন। পিতার বর্তমানে মাগন ঠাকুর তাঁর পদ লাভ করেন অর্থাৎ তিনি প্রথমে সৈন্যমন্ত্রী হন। নরপতিগীর মৃত্যুর পর রাজকন্যা 'মুখ্য পাটেশ্বরী' হন এবং মাগন ঠাকুর 'মুখ্যপাত্র' হন। তিনি ১৬৪৫ সালে ঐ পদ লাভ করেন এবং ১৬৫৮ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আলাওল মাগন ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি লাভ করে তাঁর সভাসদ হন ১৬৪৫ সালের কিছুকাল পরে। তিনি একে স্বীয় 'ভাগ্যোদয়' ও 'দুঃখনাশে'র হেতু বলে উল্লেখ করেন। 'রাজ-আসোয়ার' ও 'তালিমি এলম' থেকে 'সভাসদ' পদে উন্নীত হওয়ার মাঝে রোসাঙ্গে তাঁর জীবনের অন্যূন ২০-২৫ বছর অতিবাহিত হয়। উপরের সামান্য তথ্যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পুরো ছবি প্রতিফলিত হয় নি। তাঁর বিবাহিত জীবন সম্পূর্ণ অনুচ্চারিত থেকে গেছে। কতক বিষয় হয়েছে অস্পষ্ট।

'রণক্ষতে ভোগযোগে আইলুঁ এথাত' (পদ্মাবতী) বা 'রণক্ষতে রোসাঙ্গেত আইল মহাপাপ' (সিকান্দরনামা) বাক্য দ্বারা আলাওল যে রণক্ষত অবস্থায় রোসাঙ্গে উপস্থিত হন, তা স্পষ্ট হয়। পর্তুগীজ দস্যু জলপথে বঙ্গদেশ থেকে চট্টগ্রামের দিয়াঙ্গা হয়ে আরাকানের রাজধানী রোসাঙ্গে যেত। শাহ শুজা ঢাকা থেকে দিয়াঙ্গা হয়ে রোসাঙ্গে যান—একাধিক বর্ণনায় তার উল্লেখ আছে। মোহাম্মদ কাজিম খানের 'আলমগীরনামা'য় আছে যে, শাহজাদা শুজা ১৬৬০ সালের ১২ মে তারিখে রোসাঙ্গের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। ওলন্দাজদের 'ডাঘ-রেজিস্টারে'র নথিতে আছে, অগ্রবর্তী আরাকানী ও পর্তুগীজ নৌবহরে শাহ শুজা সপরিবারে ১৬৬০ সালের ৩ জুন দিয়াঙ্গায় পৌঁছেন এবং সেখান থেকে

www.pathagar.com

যাত্রা করে ২৬ আগস্ট রোসাঙ্গে উপস্থিত হন।[৩] মোট সময় লাগে সাড়ে তিন মাস। পলাতক শাহজাদা সংক্ষিপ্ত সময়ে যাত্রা শেষ করেন। পর্তুগীজরা বন্দীদের নিয়ে সংক্ষিপ্ত সময়ে রোসাঙ্গে যেত খরচ ও বিড়ম্বনা কমানোর জন্য। আলাওলের ক্ষত মারাত্মক ছিল না, নইলে অশ্বারোহী সৈন্যের চাকুরি তিনি পেতেন না।

আলাওল আঙ্গলেসের কারণে রোসাঙ্গে ভাল পদ পান নি। তাঁর বংশমর্যাদা ও শিক্ষা-দীক্ষার অনুপাতে সাধারণ অশ্বারোহীর পদ তুচ্ছ ছিল। এই আঙ্গলেস কে? অধিকাংশ সমালোচক তাঁকে পর্তুগীজ সর্দার গঞ্জালেস টিবাও বলে মনে করেন। কিন্তু আলাওল কোনভাবেই গঞ্জালেসের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। পর্তুগীজদের প্রধান হিসাবে গঞ্জালেস ১৬১০ থেকে ১৬১৭ সাল পর্যন্ত ক্ষমতার শীর্ষে ছিলেন। আলাওল এর পরে অপহৃত হন। আলাওল যুদ্ধবন্দী অবস্থায় রোসাঙ্গে নীত হন। উপরন্তু গঞ্জালেসের সঙ্গে মগরাজার সম্পর্ক কখনও ভাল, কখনও মন্দ ছিল। আলাওলের চাকুরির ব্যাপারে ঐতিহাসিক ব্যক্তি গঞ্জালেস প্রভাব খাটাবেন এরূপ কল্পনা করা যায় না। হয় আঙ্গলেস কোন সাধারণ ব্যক্তি হবেন, যিনি রোসাঙ্গে চাকুরি করতেন, অথবা এর পাঠান্তর 'আয়ুলেশ' হবে, যা করুণ অবস্থা বা দুর্গতি বোঝাতে আলাওল ব্যবহার করেন। আঙ্গলেস আংকলয়েস (Ancholios) এরূপ পর্তুগীজ নাম পাওয়া যায়। পাণ্ডুলিপিতে ঙ্গ, ঙ্ক-এর মধ্যে তফাৎ সামান্য। ঐ সময়ে পর্তুগীজরা আরাকানের রাজার অধীনে চাকুরি করত, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। সেবাস্টিন মানরিকের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকেও তা জানা যায়। তিনি ১৬২৯ থেকে ১৬৩৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় বছর আরাকানে অতিবাহিত করেন।[৪]

আলাওল । -পি রবারের কথা শুরু করেন সলিম শাহ থেকে। তাঁর বর্ণনাটি এরূপ:

ছলিম শাহার বংশ অদ্যাপি হইল ধ্বংস
নৃপগিরি হৈল রাজ্যপাল।
রাজ সুখ সুখ মূল কি দিব তাহার তুল
রসভোগে গোঁআইল কাল।।
এক পুত্র এক কন্যা সংসারেত ধন্যা ধন্যা
জনমিল নৃপতি সম্ভব।
চলিতে ত্রিদিব স্থান পুত্রে কৈলা রাজ্যদান
যারে দেখি লজ্জিত বাসব।
সাদ উমংদার নাম রূপে গুণে অনুপাম
মহাবুদ্ধি ভাগ্য অতিরেক।

—রোসাঙ্গ-বর্ণনা

আরাকানের দুজন রাজা 'সলিম শাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে একজন মেঙ্ রাজগী (১৫৯৩-১৬১২), অপর জন থিরি ধুধম্মা (১৬২২-৩৮)। থিরি ধুধম্মা বা

৩. মুহম্মদ সিদ্দিক খান, "শাহ শুজার জীবন-সন্ধ্যা", 'সাহিত্য পত্রিকা', শীত সংখ্যা ১৩৭৪, ১৬, ১০৭।

৪. H. Hosten (translated), "Padre Maestro Fray Seb. Manrique in Arakan", *Bengal Past and Present*, Vol. XVII, Serial No. 33-34, July-December 1918.

www.pathagar.com

শ্রীসুধর্মের 'লস্কর উজির' বা সৈন্যমন্ত্রী আশরফ খানের অনুরোধে কাজী দৌলত 'সতীময়না-লোরচন্দ্রানী' কাব্য রচনা করেন। 'নসীরানামা'র কবি মরদনও ঐ সময়ে আবির্ভূত হন; তিনি শ্রীসুধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।[৫] আরাকানের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, শ্রীসুধর্মের পত্নী নাত্‌সিন্‌ নরপতিগীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে স্বামীকে হত্যা করেন। নরপতিগী সিংহাসনে আরোহণ করেন। নরপতিগীর পর রাজা হন থদোমিন্তর (১৬৪৫-৫২); আলাওল তাঁর নাম করেন সাদ উমংদার। থদোমিন্তর নরপতিগীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা ছিলেন। আলাওল তাঁর রাজত্বকালে 'পদ্মাবতী' রচনা করেন। থদোমিন্তরের মৃত্যুর পর তাঁর শিশুপুত্র সান্দোথুধম্মা বা চন্দ্রসুধর্ম (১৬৫২-৮২) আরাকানের অধিপতি হন; রাজকার্যে মুখ্য পাটেশ্বরী হিসাবে তাঁর মাতার প্রাধান্য থেকে যায়। 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল' কাব্যে আলাওল এর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে:

নৃপতিগিরির কন্যা পরমা সুন্দরী।
চান্দ নৃপতির ছিল মুখ্য পাটেশ্বরী॥
চান্দ উমাংদার যদি গেল পরলোকে।
ব্রত ধর্ম আচারি রহিল মনশোকে॥
শ্রীচন্দ্র সুধর্মা নৃপতি শিশু দেখি।
সকল অমাত্যগণ হইল একমুখী॥...
এথেক বিনয় যদি কৈলা পাত্রগণ।
পুত্রতুল্য করে দেবী রাজ্যের পালন॥...
সুবেশ না করে অঙ্গে অলংকারহীন।
সেবা শুল্ক বস্ত্র পিন্ধে কিঞ্চিৎ মলিন॥
বদনে নাহিক শব্দ সদা এনামজপ।
লোক উপচার নিত্য দান ধর্মতাপ॥
হেন মত কোথা আর নাহি দেখি শুনি।
রাজ্যের ঈশ্বরী রাজগৃহে তপস্বিনী॥

—আত্মকথা

মাগন ঠাকুর দীর্ঘকাল তাঁর প্রধান অমাত্য ছিলেন। সুতরাং খুব কাছে থেকে রাজাকে দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছিল।

আলাওল আত্মকথায় বলেন,

বহু মুসলমান সব রোসাঙ্গে বৈসন্ত।
সদাচারী কুলীন পণ্ডিত গুণবন্ত॥

সংকীর্তি মাগনের বর্ণনায় আছে,

তান দেশী যথেক আলিম গুণবন্ত।
মান্য করি আনি নিত্য আদরে পুজন্ত॥

রোসাঙ্গের এই মুসলমান কারা?

৫. মুহম্মদ এনামুল হক, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' (দ্বিতীয় সং; ঢাকা, ১৯৬৫), পৃ. ২৩৯।

www.pathagar.com

আলাওল রোসাঙ্গের বর্ণনায় 'নানা দেশী নানা লোক/শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ/আইসন্ত নৃপ ছায়াতল' বলে আরবী, মিসরী, তুর্কী, হাবশী, রুমী, খোরাসানী, উজবেগী, লাহুরী, মুলতানী, হিন্দী, কাশ্মিরী, দক্ষিণী, সিন্ধী, কামরূপী, বঙ্গদেশী, ভূপালী, কুদংসরী, কাম্মাই, মালাবারী, আচিকোচী, কর্ণাটকবাসী, সৈয়দ, শেখজাদা, মোগল, পাঠান, রাজপুত, হিন্দু, আডাঙ্গি, বর্মা, শাম, ত্রিপুরা, কুকি প্রভৃতির উল্লেখ করেন। রোসাঙ্গের মুসলমান বলতে সবাই 'বঙ্গদেশী' ছিল না; আরবী, তুর্কী, খোরাসানী, উজবেগী, কাশ্মিরী, মুলতানী, সিন্ধী প্রভৃতি নানা অঞ্চলের সৈয়দ, শেখ, মোগল, পাঠানও ছিল। অবশ্য মাগনের সভায় 'তান দেশী আলিম গুণবন্ত' ছিলেন। মাগন চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সুতরাং চট্টগ্রামের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি আহূত হয়ে রোসাঙ্গে গমন করতেন। তার সঙ্গে 'বঙ্গদেশী' 'রোসাঙ্গের ভোগে'র প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গমন করতেন। মগ-অধ্যুষিত আরাকানে এশিয়ার ও ইউরোপের নানা জাতির গমনাগমন এবং কোন কোন জাতির বসবাস সত্ত্বেও কেবল বাংলা সাহিত্যের চর্চা হয়; এমন কি, মঘী ভাষারও কোন চর্চা ছিল না। আরাকানের অমাত্যসভার পাঁচ জন কবিই (কাজী দৌলত, আলাওল, মরদন, মাগন ঠাকুর ও আবদুল করিম খন্দকার) মুসলমান ছিলেন। খোদ বঙ্গদেশে এককভাবে কোন রাজসভায় এরূপ গৌরব ছিল না। আরাকানে রচিত বাংলা কাব্যের উৎস ফারসী ও হিন্দী। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে, রোসাঙ্গে ঐ দুই ভাষায় জ্ঞানী লোক ছিলেন। আলাওল মাগনকে 'আরবী ফারসী আর মগী হিন্দুআনী/নানা গুণে পারগ সংকেত জ্ঞাতা গুণী' বলে উল্লেখ করেন। কাজী দৌলতের মতে, আশরফ খানের রাজসভা ছিল এরূপ:

আরবী ফারসী নানা তত্ত্ব উপদেশ।
বিবিধ প্রসঙ্গ কথা আছিল বিশেষ॥
গুজরাতী গোহারী ঠেট ভাষা বহুতর।
সহজে মহন্ত সভা আনন্দ সায়র॥

—সতীময়না-লোরচন্দ্রানী

আলাওলের পৃষ্ঠপোষক মজলিস নবরাজ "হীন জাতি নানা দুঃখে উপার্জিয়া মাল/মসজিদ পুষ্কর্ণী দেয় কথেক বাঙ্গাল" বলে কটাক্ষ করেন। তাঁর মতে,

মসজিদ পুষ্কর্ণী নাম নিজ দেশে রহে।
গ্রন্থ কথা যথাতথা উক্তিভাবে কহে॥
গ্রন্থ পড়ি সকলের তুষ্ট হয় মন।
নাম স্মরি মহিমা কহএ সর্বজন॥

—সিকান্দরনামা

গ্রন্থের এই উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করে রোসাঙ্গের অমাত্যগণ বাংলা কাব্যরচনায় কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ দান করেন।

রোসাঙ্গ ছাড়াও আরাকানের 'কাণ্ডি' নগরেও শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানের বসবাস ছিল। মরদন বলেন,

সে রাজ্যেতে আছে এক কাণ্ডি নামে পুরী।
মোমিন মুসলমান কত বৈসে সে নগরী॥

www.pathagar.com

আলিম মৌলানা বৈসে, কিতাব কোরান।
কায়স্থ বসয়ে শেখ সৈয়দ পাঠান।।
ব্রাহ্মণ সজ্জন তথা বসয়ে পণ্ডিত।
নানা কাব্য রস-কথা কহএ পুরীত।।
—নসীরানামা

এসব আলিম, মৌলানা, শেখ, সৈয়দ, পাঠান, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ যে 'বঙ্গদেশী' ও বঙ্গ-সংস্কৃতি-অনুরাগী ছিলেন, তা নিশ্চিত বলা যায়। তাঁদের আরাকানে আগমনের হেতু কি? আরাকানবাসীর সঙ্গে গৌড়বাসীর সম্পর্ক স্থাপনের হেতুই বা কি?

আরাকানের রাজা নরমেখলা বা মিঙ্ সাউ মঙ্ ১৪০৬ সালে বার্মার রাজা কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন এবং তৎকালীন গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের (১৩৮৯-১৪১০) আশ্রয় গ্রহণ করেন। ২৪ বছর গৌড়ে নির্বাসিত জীবন যাপন করার পর ১৪০০ সালে তিনি সুলতান জালালউদ্দীন মাহমুদ শাহের (১৪১৮-৩১) সামরিক সহায়তায় হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। এ-সময়ে বাংলার বহু সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তি আরাকানে গমন করেন। তখন থেকে ১৪৮৬ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামের দখল নিয়ে সাময়িক সংঘর্ষ ছাড়া উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক ভাল থাকে। ১৪৮৬ থেকে ১৫৮৬ সাল পর্যন্ত প্রায় এক শ বছর চট্টগ্রাম আরাকান-রাজার দখলে থাকে। এ সময়ে চট্টগ্রামের শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান রাজধানী রোসাঙ্গে ও অন্যান্য শহরে গমন করেন। ১৫৮৬ থেকে ১৬৬৬ সাল পর্যন্ত প্রায় ৮০ বছর চট্টগ্রামের দখল নিয়ে মোগল, ত্রিপুরা, আরাকান ও পর্তুগীজ—এই চতুঃশক্তির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ ছাড়াও অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রবিপ্লব চলছিল। এসব রাষ্ট্র-বিপ্লবের ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের ফলে ঐ অঞ্চলের শান্তিপ্রিয় জ্ঞানী-গুণী-সজ্জন ব্যক্তি আরাকানের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মগ ও পর্তুগীজ দস্যু-তস্করের হাতে বন্দী হয়ে বহুসংখ্যক বাঙালী নরনারী আরাকানে যায় এবং কায়িক শ্রমের কাজে নিযুক্ত হয়ে বসবাস করতে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শী ফরাসী পর্যটক ফ্রান্সিস বার্নিয়ের বলেন, "আরাকানরাজ পৌত্তলিক হলেও সেখানকার জনসাধারণের সঙ্গে মিশে বহু মুসলমানও বাস করে। এদের মধ্যে অনেকেই স্থানীয় অধিবাসীর সঙ্গে জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত করে, অনেকে উপকূল-অঞ্চলের পর্তুগীজ জলদস্যুদের কর্মতৎপরতার সময়ে ধৃত হয়ে দাসরূপে আনীত হয়।"[৬] পর্তুগীজরা ১৫৩৮ সালে দিয়াঙ্গায় প্রথম বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণ করে। তখন থেকে সমুদ্রে আরব বণিকদের প্রভাব হ্রাস পায় এবং পর্তুগীজদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। তারা ষোল শতকের শেষের দিকে বঙ্গের নদী-তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে দস্যুবৃত্তি শুরু করে, সতের শতকের গোড়া থেকে তা তীব্রতর হয়। নরমেখলা স্বীয় নামাঙ্কিত মুদ্রায় মুসলিম উপাধি, কলিমা, আরবী-ফারসী-বাংলা লিপি ইত্যাদি গ্রহণ করে গৌড়ের সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। আরাকানের অনেক রাজা এ-ধারা অনুসরণ করেন। মুসলিম উপাধির একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল:

নরমেখলা	(১৪০০-৩৩)	সাউ মঙ খান
মঙ্ খারি	(১৪৩৩-৫৯)	আলি খান
বাসাউ পিউ	(১৪৫৯-৮২)	কলিম শাহ

৬. Francois Bernier, *Travels in the Mughul Empire (1656-68)* (revised edn; London, 1891), p 109.

www.pathagar.com

মিঙ্ দাউ লিয়া	(১৪৮২-৯৩)	মউকু শাহ
বাসাউ নিও	(১৪৯২-৯৪)	মহামাউক শাহ
মিঙ্ রণঙ্গ	(১৪৯৪)	নূরী শাহ
থিঙ্ গাথ্	(১৪৯৪-১৫০১)	কাউকদৌলা শাহ
মিঙ্ রাজা	(১৫০১-১৩)	ইলিয়াস শাহ
থিরি থ্	(১৫১৫)	জালা শাহ
থাজাতা	(১৫১৫-২১)	অবিল শাহ
মিঙ্ বাজী	(১৫৩১-৫৩)	যৌবক শাহ
মিঙ্ পালঙ্গ	(১৫৭১-৯৩)	সিকান্দর শাহ
মিঙ্ রাজগী	(১৫৯৩-১৬১২)	সলিম শাহ
মিঙ খামঙ্গ	(১৬১২-২২)	হোসেন শাহ
থিরি থুধম্মা	(১৬২২-৩৮)	সলিম শাহ[৭]

রোসাঙ্গ শহরের সান্দি খান মসজিদ মুসলমানের বসতির এবং সংস্কৃতির অস্তিত্ব সুনিশ্চিত করে।[৮] প্রবাসী বঙ্গদেশীর পক্ষে আধা বর্বর, আধা সভ্য মগদের সংস্কৃতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।[৯] এরূপ অবস্থায় আরাকানের অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণীর বঙ্গ-সংস্কৃতির অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। যুগ ও পরিবেশের এরূপ পট-ভূমিতেই রোসাঙ্গে কাজী দৌলত, আলাওল, মাগন প্রমুখ কবির আবির্ভাব হয়।

বঙ্গের সমকালীন ভাষারীতি ও কাব্যধারার সঙ্গে আরাকানের উক্ত শ্রেণীর পরিচয় ছিল। গৌড়, চট্টগ্রাম ইত্যাদি সামন্ত ও পাতি-সামন্তের অনুরূপ রোসাঙ্গের আমাত্যগণ একই সাংস্কৃতিক চেতনা ও প্রেরণা থেকে সাহিত্য-সঙ্গীত-বাদ্য-নৃত্যের চর্চা করতেন। কাজী দৌলত স্বীয় কাব্যরচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন,

ঠেটা চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে।
না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে।।
দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয় সানন্দে।।
তবে কাজী দৌলৎ বুঝিয়া সে আরতী।
পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী।।
—সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী

৭. Abdul Karim, "Was Chittagong ever a Capital City ?", *Journal of the Asiatic Socitety of Bangladesh*, Vol. XXXI, No. 1, June 1986, 12-13.

৮. Bisveswar Bhattacharya, "Bengali influence in Arakan", *Bengal Past and Present*, Vol. XXXIII, January-June 1927, 142.

৯. আরাকানের রাজার ভোজসভায় মহিষের কাঁচা রক্ত পান করার রীতি ছিল। শাহ শুজার এক পুত্র সুলতান বাংক এরূপ এক ভোজসভায় মহিষের কাঁচা রক্ত দেখে ঘৃণায় নাক চেপে ধরেন। মুহম্মদ সিদ্দিক খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০।

www.pathagar.com

আলাওল বলেন,

এহি পদ্মাবতী রসে রচ রসকথা।
হিন্দুস্তানী ভাষে শেখে রচিয়াছে পোথা।।
রোসাঙ্গেত আন লোকে না বুঝে এ ভাষা
পয়ার রচিলে পুরে সভানের আশা।।.....
তাহান আদেশ মাল্য ধরিয়া মস্তকে।
অঙ্গীকার কৈলুঁ মুঞি রচিতে পুস্তকে।।

—পদ্মাবতী

আলাওল অন্যান্য কাব্য সম্পর্কেও অনুরূপ যুক্তি প্রদান করেন। বঙ্গ-ভূখণ্ডের কবি শাহ মোহাম্মদ সগীর, দৌলত উজির বাহরাম খান, মোহাম্মদ কবির, সৈয়দ সুলতান, আবদুল হাকিম প্রমুখ একই যুক্তির কথা বলেন। এমন কি, পার্শ্ববর্তী সামন্ত রাজ্য ত্রিপুরার কবিগণের কণ্ঠেও ঐ যুক্তি শোনা যায়। সুতরাং রোসাঙ্গের ও ত্রিপুরার সামন্ত-সভায় বাংলা কাব্যের চর্চা কোন বিচ্ছিন্ন ও অভিনব ঘটনা ছিল না। সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের ও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার নিয়মে সেখানে বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের চর্চা হয়। সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, হিন্দী, মঘী—কোন ভাষা এ-ধারার গতিরোধ করতে পারে নি।

রোসাঙ্গে রাজসভার পাশে অমাত্যসভা বিরাজ করতো দুটি ভিন্ন ধারার সংস্কৃতির মানুষের কারণে। এছাড়াও আরেকটি বড় কারণ ছিল, অমাত্যগণ বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ইতিহাসকার সান ব' উ লেখেন, "In those times, not only the council of ministers in Arakan were powerful and independent but a strong popular public opinion existed that controlled the officers of the state and curbed the king's power."[১০] আরাকানে এরূপ নিয়ম থাকার কারণে দুজন রাজা জনমতের বিরুদ্ধে যাওয়ায় প্রাণ বিসর্জন দেন। এঁদের একজন রাজা আনন্দ থিরি (১১৬৮ খ্রী) এবং অপরজন রাজা থিরি সুধম্মা (দ্বিতীয় চন্দ্র সুধর্মের পুত্র)।[১১] অমাত্যসভার প্রতি রাষ্ট্রের অনুমোদন ও জনগণের সমর্থন ছিল।

সামন্ত শ্রেণীর চিত্র ও চরিত্র সম্পর্কে আলাওলের স্পষ্ট ধারণা হয়েছিল, 'পদ্মাবতী' কাব্যে তার প্রতিফলন আছে। তিনি মাগনের রাজসভার বর্ণনা দেন এভাবে :

গুণিগণ থাকন্ত তাহান সভা ভরি।
গীত নাট যন্ত্র বাহি রঙ্গ ঢঙ্গ করি।
নানান প্রসঙ্গ কথা কহি নানা ছন্দ।
তান সভা মধ্যে থাকোঁ করিআঁ আনন্দ।।

১০. San Baw U, "My Rambles amongst the ruins of the Golden city of Myauk-U", *Journal of Burma Research Society*, Vol. XXIII, Part 1, 1933, 17.

১১. *Ibid.*, 17.

www.pathagar.com

মাগনের রূপ-গুণ সম্পর্কে তিনি বলেন,

দুর্বাদল শ্যামতনু মুখ পূর্ণচন্দ্র।
দেখিয়া সুহৃদগণ হৃদয় আনন্দ।।
সুন্দর মগদ পাগ মস্তক ভূষিত।
নবঘন জিনি যে চন্দ্রিমা উদিত।। ...
চালনি দোলনি নেত্র নীলোৎপল মোহে।
ঈষৎ কটাক্ষে কুলবধূ-মন মোহে।। ...
দেব গুরু ভক্ত মিত্র বান্ধব পালক।
ইঙ্গিতে বাঞ্ছিত পূরে তোষন্ত যাচক।।
দান কালে শত্রু মিত্র এক নাহি চিন।
সকলেরে দেন্ত নিত্য আপ্ত কিবা ভিন।। ...
ওলামা সৈদ শেখ যত পরদেশী।
পোষন্ত আদর করি বহু স্নেহ বাসী।।
কাহাকে খতিব কাকে করেন্ত ইমাম।
নানাবিধ দানে পুরায়ন্ত মনস্কাম।।
নৃপ ক্রোধে যথ লোক হএ ছত্রাকার।
তাহান শরণে আসি হএন্ত উদ্ধার।।

—সৎকীর্তি মাগনের প্রশংসা

আলাওল সাদ উমংদারের একই রকম পরিচয় দেন :

সাদ উমংদার নাম রূপে গুণে অনুপাম
মহাবুদ্ধি ভাগ্য অতিরেক।
দেখিতে সুচারু মুখ লোকের নয়ানসুখ
জেন পূর্ণচন্দ্র পরতেক।। ...
সতত মধুর ভাষ ক্রোধানলে শত্রুনাশ
পাত্র মিত্র তোষয় অসীম।
ধর্মে জিনি যুধিষ্ঠির দাতা জিনি কর্ণবীর
প্রতাপে সমান নহে ভীম।। ...
হেন মহা মহীরাজা নৃপ সবে করে পূজা
মিত্রপাল দুর্জন ঘাতক।
মর্যাদা কৃপার সিন্ধু অনাথ জনের বন্ধু
ন্যায়বন্ত সংসার রক্ষক।।

—রোসাঙ্গ-বর্ণনা

সামন্ত-প্রধান এবং তাঁর কতিপয় সহযোগী সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণী হিসাবে 'রূপে গুণে অনুপাম' এবং 'মহাবুদ্ধি'র অধিকারী হন। তাঁরা মিত্রের পালক, দুর্জনের ঘাতক, অনাথ জনের বন্ধু এবং ন্যায়ের রক্ষক হন। তাঁরা কর্ণের অধিক দাতা, ভীমের অধিক

www.pathagar.com

বলবান, যুধিষ্ঠিরের অধিক ধার্মিক। তাঁরা দানের সময়ে শত্রু-মিত্র ভেদ করেন না। তাঁরা গুণীজনকে খতিব, ইমাম ইত্যাদি পদ দিয়ে পুরস্কৃত করেন। নৃপতির 'ক্রোধানলে শত্রুনাশ' হয়; মাগনের সুপারিশে অনেক শরণার্থী উদ্ধার পায়। ভোগের জীবন তাঁদের; তাঁরা মহাসমারোহে নৌকাবিহার, বনবিহার করেন। আবার রাজসভাতে পার্ষদ-সমভিব্যাহারে 'গীত-নাট-যন্ত্র' যোগে 'রঙ্গ ঢঙ্গ' করেন এবং 'নানান প্রসঙ্গ কথা' বলে আনন্দোপভোগ ও অবসরযাপন করেন। সামন্ত নৃপতির যে ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য আলাওল বাস্তবে প্রত্যক্ষ করেন, উপরের বর্ণনা ছাড়াও মূল কাব্যের পাত্রপাত্রীর বর্ণনাতে তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সিংহলের রাজা গন্ধর্ব সেনের রাজসভা 'ইন্দ্রসভা'র সমতুল; সেখানে 'কুটুম্ব বন্ধুগণ' অবস্থান করেন। সেখানে বেদ-পুরাণের চর্চা হয়; নানা রাগে নানা ছন্দে গীতচর্চাও হয়। চন্দন কুংকুম চুয়া কস্তুরী কাফুর' দ্বারা সারা দেশই সুরভিত। নৃপগৃহের শোভার কাছে 'চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র সহজে হীনপ্রভা' দেখায়।[১২] কাব্যের নায়িকা 'বত্রিশ লক্ষণ যুতা কুমারী অপরূপ' পদ্মাবতী এরূপ রাজারই কন্যা। কাব্যের নায়ক চিতোরের রাজা রত্নসেন হলেন 'অমূল্য মাণিক', 'অস্ত্রে শাস্ত্রে রূপে গুণে সাহসে' অতুলনীয়, 'মহা ভাগ্যবন্ত বীর', 'চতুর প্রবীণ' ইত্যাদি। তিনি 'এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা' দ্বারা শুকপাখি ক্রয় করেন।[১৩] তিনিই পদ্মাবতীকে পাওয়ার জন্য যোগীর ছদ্মবেশে দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় বহির্গত হন। আলাওল এসব বর্ণনায় সফলভাবে যুগের প্রতিনিধিত্ব করেন।

১৬৫৮ সালে মাগন ঠাকুরের নির্দেশে আলাওল দ্বিতীয় কাব্য 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল' রচনা শুরু করেন। অল্পকাল পরে মাগনের মৃত্যু হলে শোকাভিভূত কবি রচনাকার্যে বিরত হন। সোলায়মান প্রধান অমাত্য হলে আলাওল তাঁর আনুকূল্য লাভ করেন এবং তাঁরই নির্দেশে কাজী দৌলতের অসমাপ্ত কাব্য 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী'র উত্তরাংশ রচনা করেন ১৬৫৯ সালে। এসব তথ্য কবির উক্তিতেই পাওয়া যায়।

শ্রীমন্ত সোলেমান মহা গুণবন্ত।
পরদেশী গুণী পাইলে আদরে পোষন্ত॥
মহা হরষিত হৈল পাইয়া আহ্মারে।
অন্ন বস্ত্র দানে নিত্য পোষন্ত সাদরে॥...
একদিন হরিষে বসিয়া গুণনিধি।
জিজ্ঞাসন্ত কাব্যকথা রসের অবধি॥
প্রসংগ হইল লোর চন্দ্রানীর কথা।
অসাঙ্গ রহিল এই রস কাব্য গাথা॥
সাঙ্গ হইলে পুস্তক সম্পূর্ণ রস হএ।
শ্রোতা পাঠকের মন আরতি পুরাএ॥...
এথেক ভাবিয়া সোলেমান মহামতি।
হরসেতে আদেশ করিলা আহ্মা প্রতি॥...

১২. সৈয়দ আলী আহসান (সম্পাদিত), 'পদ্মাবতী' (ঢাকা, ১৯৬৮), পৃ. ২২৩-২৪।
১৩. ঐ, পৃ. ২৯৪-৯৫।

www.pathagar.com

আদেশ কুসুম তান শিরেত ধরিয়া।
হীন আলাওলে কহে পাঞ্চলি রচিয়া।।

আলাওলের কাব্যরচনার প্রেরণা এক ও অভিন্ন; তাঁর দৃষ্টিতে সামন্ত প্রতিনিধির চিত্র-চরিত্রও এক ও অভিন্ন। প্রধান অমাত্য সোলায়মানের নির্দেশে আলাওল ইউসুফ গদার ফারসী 'তোহফাতুন নেসায়েহ্' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'তোহফা' রচনা করেন ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। তোহফা ধর্মীয় তত্ত্বমূলক ও নৈতিক উপদেশাত্মক কাব্য। আলাওল তখন বার্ধক্যের দ্বার-প্রান্তে পৌঁছে গেছেন—"মই আলাওল হীন/দৈববশ অনুদিন/বিধি বিড়-ম্বিল কাল।" কবি পৃষ্ঠপোষক হিসাবে যে 'শ্রীমন্ত সোলেমানে'র কথা বলেন, রাজ-অমাত্য ব্যতিরেকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অন্য কোন পরিচয় জানা যায় না। তিনি কত কাল স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাও জানা যায় না। তবে ধরে নেওয়া যায় যে, ১৬৬৪ সাল পর্যন্ত সোলায়মান রাজপদে বহাল ছিলেন। সোলায়মানের মত মজলিস নবরাজ, সৈন্যমন্ত্রী সৈয়দ মহম্মদ, সৈয়দ মুসা প্রমুখ অমাত্যের ব্যক্তিগত পরিচয় আরাকানের ইতিহাসেও পাওয়া যায় না।

১৬৫৯-৬৫ সালের মধ্যে 'সৈন্যমন্ত্রী' সৈয়দ মহম্মদের নির্দেশে আলাওল নিজামী গঞ্জভীর ফারসী 'হপ্ত পয়করে'র বাংলা অনুবাদ 'সপ্ত পয়কর' রচনা করেন। 'সপ্ত পয়করে'র রচনাকাল কেউ বলেন ১৬৬৫ সাল, কেউ বলেন ১৬৬০ সাল। 'সপ্ত পয়করে' বিধৃত কবির আত্মকথায় শাহ শুজার প্রসঙ্গ এসেছে এভাবে:

দিল্লীশ্বর বংশ আসি যাহার শরণে পশি
তার সম কাহার মহিমা।

এতে অনুমিত হয় যে, রোসাঙ্গে শাহ শুজার আশ্রয়গ্রহণের পর ও নিহত হওয়ার আগে কাব্যখানি সমাপ্ত হয়। শাহ শুজা কর্তৃক আরাকানের ক্ষমতাদখলের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে আলাওলের সংযোগ ছিল, এরূপ অভিযোগের কারণে কবি পঞ্চাশ দিবস কারাভোগ করেন. এ-ঘটনার বিবরণ 'সিকান্দরনামা'য় আছে। সৈন্যমন্ত্রীর আদেশদান ও কাব্যরচনা সম্পর্কে আলাওল বলেন,

হেন মহা রাজেশ্বর অখণ্ড সম্পদ।
তান মুখ্য সৈন্যমন্ত্রী সৈদ মহাম্মদ।। ...
সভা মধ্যে থাকি সভাসদ হৈয়া।
শাস্ত্রনীতি রসকথা প্রসঙ্গ কহিয়া।।
এক নিশি পণ্ডিত সমাজে মহাশয়ে।
কথা রসে বসিছন্ত আপনা আলএ।।
আমা প্রতি আজ্ঞা দিল হরষিত মন।
উত্তম প্রসঙ্গ এক কহিতে কথন।।
সপ্ত পয়কর কথা অতি মনোহর।
মনোগত প্রকাশিল তাহান গোচর।। ...

www.pathagar.com

তবে মোরে আজ্ঞা দিলা হাসিতে হাসিতে।
যত্ন করি এই কথা পয়ার রচিতে॥ ...
তান আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি কদাচিত।
যদ্যপি পিঞ্জরা জীর্ণ চিন্তাএ পীড়িত॥

শুজার রাষ্ট্রদ্রোহিতার অল্পকাল পরে রচিত বলে তিনি সংক্ষেপে ঐ উক্তি করেন। এ সময়ে আলাওল আরও বৃদ্ধ হয়েছেন, 'পিঞ্জরা জীর্ণ চিন্তাএ পীড়িত' উক্তি থেকে তা বোঝা যায়।

ক্ষমতার লড়াইয়ে আওরঙ্গজেবের কাছে শাহ শুজার (১৬৩৮-৬০) পরাজয় এবং পরিবার-পরিজনসহ রোসাঙ্গে আশ্রয়গ্রহণ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিনি আওরঙ্গজেবের ক্রোধাগ্নি থেকে বাঁচার জন্য এ পথ অনুসরণ করেন। আমরা পূর্বে বলেছি যে, ১৬৬০ সালের ২৬ আগস্ট শাহ শুজা রোসাঙ্গে পেঁাছেন। আরাকান-রাজ তাঁকে আশ্রয় দিলেও তাঁর পরিণাম শুভ হয়নি। আরাকানের মুসলমানদের সহযোগিতায় শাহ শুজা সিংহাসন দখলের ষড়যন্ত্র করেন, এরূপ সন্দেহ করে শ্রীচন্দ্র সুধর্মের নির্দেশে শাহ শুজা সপরিবারে নিহত হন। আলাওল শাহ শুজাকে সাহায্য করেন—মির্জা নামে এক দুষ্টমতি ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির এরূপ মিথ্যা অপবাদে কবি কারাবরণ করেন। পঞ্চাশ দিন কারাগারের দুঃখভোগ করার পর তিনি মুক্তি পান। মির্জা শূলদণ্ডে প্রাণ হারায়। কবি দারা-পুত্রসহ সর্বস্বান্ত হন। ভিক্ষাবৃত্তি-দ্বারা তিনি জীবিকা-নির্বাহ করেন। রোসাঙ্গের কাজী মসউদ শাহ দয়াপরবশ হয়ে আলাওলকে আশ্রয় দেন এবং তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তাঁকে 'কাদেরী খিলাফত' দান করেন। ১৬৬৪ সালে রচিত 'তোহফা'য় কবির আত্মবিবরণী নেই; ১৬৬৯ সালে সমাপ্ত 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল' এবং ১৬৭৩ সালে রচিত 'সিকান্দরনামা' কাব্যে কবির আত্মকথায় শাহ শুজার ভাগ্য-বিপর্যয় এবং কবির মন্দ-ভাগ্যের এরূপ বিবরণ আছে ঃ

তার পাছে শাহ সুজা নৃপকুলেশ্বর।
দৈব পরিপাকে আইল রোসাঙ্গ শহর॥
রোসাঙ্গ নৃপতি সঙ্গে করি বিসম্বাদ।
আপনার দোষ হোস্তে পাইল অবসাদ॥
যথেক মুসলমান তার সঙ্গী হৈল।
নৃপতির শাস্তি পাইয়া বহু লোক মৈল॥
মির্জা নামে এক পাপী সত্যধর্ম ভ্রষ্ট।
নিগ্রহ করিয়া বহু লোক করে নষ্ট॥
যার সঙ্গে ছিল তার তিল মন্দ ভাব।
অপরাধী করি তারে পাইলেক লাভ॥ ...
আন্ধারেহ অপরাধ দিল পাপী ছারে।
না পাইয়া বিচার পড়িলুম কারাগারে॥
বহুল যন্ত্রণা দুঃখ পাইলুম ক্লেশ।
গর্ভবাস আছিলাম পঞ্চাশ দিবস॥

www.pathagar.com

আয়ুলেশ আক্ষা ছিল রাখে বিধাতাএ।
সব ভিক্ষা জীব রক্ষা ক্লেশে দিন যাএ ॥
এহি মতে চলি গেল নবম বৎসর।
খণ্ড ব ক্য আছিল পুস্তক মনোহর ॥
সৈদ মুসা নামে এক পুরুষ মহন্ত।
অভিন্ন বদন রূপ মহা গুণবন্ত ॥

—সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল

শাহা সুজা রৌসাঙ্গে আইলা দৈবগতি।
হতবুদ্ধি পাত্র সবে দিল হতমতি ॥
আপনার দোষ হোন্তে পাইল প্রমাদ।
এক পাপী আক্ষারেহ দিল মিথ্যাবাদ ॥
কারাঘরে পৈ'ল, আক্ষি না পাই বিচার।
যথ ইতি বসতি হৈল ছারখার ॥
শালাসনে মৈল যেই দিল অপবাদ।
অস্থানে পড়িল, বহু পাই অবসাদ ॥
মন্দকৃতি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ।
পুত্রদারা সঙ্গে মুঞি হৈ'ল, পরবশ ॥
গুণহেতু মহাজনে করেন্ত আদর।
ভিক্ষা করি দেএ দারা নিজ রাজকর ॥
সৈয়দ মসউদ শাহা রোসাঙ্গের কাজী।
জ্ঞান অল্প আছে বুলি মোরে হইল রাজি ॥
দয়াল চরিত পীর অতুল মহত্ত্ব।
কৃপা করি দিলেক কাদেরী খিলাফত ॥ ...
এহি মতে দশ বৎসর গঞি গেল।
পুনরপি ভাগ্য রঙ্গ প্রকাশিত ভেল ॥
শ্রীমন্ত নবরাজ অতুল মহত্ত্ব।
মজলিস পাইয়া যদি হৈল মহামাত্য ॥
মধুর বচন মোর শুনিয়া রসদ।
সাদরে আনিয়া আক্ষা কৈল সভাসদ ॥

—সিকান্দরনামা

'নৃপকুলেশ্বর' শাহ শুজার রোসাঙ্গে আগমন, আশ্রয়, অবস্থান, বিবাদ, ধ্বংস ইত্যাদি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য নেই। মুহম্মদ সিদ্দিক খান ইতিহাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত ও অন্যান্য নথিপত্র থেকে উপাদান সংগ্রহ করে "শাহ সুজার জীবন-সন্ধ্যা" শীর্ষক একটি মূল্যবান প্রবন্ধ 'সাহিত্য পত্রিকা'য় (শীত ১৩৭৪, পৃ ৯৩-১৬৬) প্রকাশ করেন। উৎসাহী পাঠক তা পড়তে পারেন। বাটাভিয়ার ডাচ রেজিস্টারে সংরক্ষিত গেরিট ভ্যান ভুরবার্গের পত্রে আছে, "১৬৬১ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী শুজা ও তাঁর দলভুক্ত ব্যক্তিদের হত্যাকাণ্ড

www.pathagar.com

সংঘটিত হয়।"[১৪] ঐ তারিখ সত্য হলে শাহ শুজা রোসাঙ্গে প্রায় ছয় মাস অবস্থান করেন।[১৫] ভাগ্য-বিড়ম্বিত শাহ শুজার সঙ্গে শ্রীচন্দ্র সুধর্মের বিবাদের নানা কারণ বলা হয়। কেউ বলেন, মীর জুমলা কর্তৃক শাহ শুজাকে মুঘলের হাতে প্রত্যর্পণ করার জন্য আরাকান-রাজার উপর চাপ ও সামরিক ভীতি প্রয়োগ; কেউ বলেন, শাহ শুজার ব্যক্তিগত মূল্যবান সম্পদ ও রূপসী শাহজাদী আমেনা বানুর প্রতি শ্রীচন্দ্র সুধর্মের লোভ-লালসা; কেউ বলেন, শাহ শুজা কর্তৃক স্থানীয় মুসলমানের সহায়তায় রাজাকে উৎখাত করে সিংহাসন-দখলের ষড়যন্ত্র।[১৬] আলাওলের প্রথম উক্তির ৩-৬ সংখ্যক চরণে এবং দ্বিতীয় উক্তির ২-৩ সংখ্যক চরণে ক্ষমতাদখলের ষড়যন্ত্রের উল্লেখ আছে। বয়োবৃদ্ধ কবি ক্ষমতার অভ্যন্তরে থেকে প্রকৃত ঘটনা অবলোকন করেন; কাব্যদ্বয়ের রচনাকালে শ্রীচন্দ্র সুধর্ম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকায় কবি এত বড় ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ না দিয়ে অতি সংক্ষেপে তা সমাপ্ত করেন। বিশেষতঃ বিষয়টিতে সাম্প্রদায়িক বর্ণ থাকায় এবং কবি স্বয়ং এর শিকার হওয়ায় তিনি যথেষ্ট সাবধানতা ও সংযমের পরিচয় দেন।

শাহ শুজাকে ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে নিয়ে রোসাঙ্গে পরপর দুটি রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহ হয়—প্রথমটি ১৬৬১ সালের ফেব্রুয়ারীতে, শাহ শুজা এতে নিহত হন; দ্বিতীয়টি ১৬৬৩ সালের জুলাই মাসে, শুজার জীবিত পুত্র-কন্যাসহ পুরো পরিবার ধ্বংস হয়। এমন কি, আমেনা বানুও (শ্রীচন্দ্র সুধর্ম যাকে বিয়ে করেন) অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় নিহত হন। দ্বিতীয় বিদ্রোহ শাহ শুজার ও তাঁর পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল স্থানীয় মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত হয়।[১৭] আলাওল প্রথম বিদ্রোহে সর্বস্বান্ত হন এবং কারাভোগ করেন। এ বিদ্রোহে আরাকানের মুসলমানের একটি অংশের সহানুভূতি ছিল, অপর অংশ রাজার পক্ষে ছিল। নচেৎ সৈন্যমন্ত্রী হিসাবে সৈয়দ মুহম্মদ খান ও সৈয়দ মুসাকে এবং 'মহামাত্য' হিসাবে সোলায়মান ও মজলিস নবরাজকে পাওয়া যেত না। সৈয়দ মসউদ শাহও রোসাঙ্গের কাজী-পদে বহাল ছিলেন। এগুলি সবই গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল।

মির্জা নামে এক ব্যক্তির প্ররোচনায় আলাওল কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। পঞ্চাশ দিন পর তিনি মুক্তি পান; মির্জা মিথ্যা অপবাদের দায়ে শূলদণ্ডে প্রাণ হারায়। কারামুক্তির ব্যাপারে আলাওল উপরতলার সহায়তা পান বলে আমাদের বিশ্বাস। এই মির্জা কে? মির্জা, বেগ প্রভৃতি মুঘলের উপাধি। নিকোলা মনুচী বলেন, "শাহ শুজা আরাকানের বহু মুঘল ও পাঠান বসবাসকারীর সাক্ষাৎ পান। তারা তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল।"[১৮] রোসাঙ্গে 'বহু সৈদ শেখজাদা/ মোগল পাঠান যোদ্ধা'/ বাস করত বলে 'পদ্মাবতী' কাব্যে আলাওল উল্লেখ করেন। শিক্ষা ও ধর্মের কাজে 'সৈয়দ-শেখ-জাদা' এবং সামরিক কাজে 'মোগল-পাঠান যোদ্ধা' সতের শতকের চল্লিশ দশকেও নিয়োজিত

১৪. মুহম্মদ সিদ্দিক খান, পূর্বোক্ত, প. ১৪০।

১৫. ঐ, প. ১৩৪।

১৬. ঐ, প. ১৫১-৫৪।

১৭. ঐ, প. ১৫৪।

১৮. William Irvine (translated), *Storia do Mogor or Moghul India* (1653-1708), by Niccolao Manucci, Vol I (London, 1907), p 374.

www.pathagar.com

ছিল, এই উক্তি থেকে তাই প্রমাণিত হয়। আলাওল অমুঘল ছিলেন—তাঁর পিতার চাকুরিদাতা কুতুব মজলিস মুঘলের হাতে নিগৃহীত হন। রোসাঙ্গে আলাওলের আশ্রয়-দাতা সবাই পাঠান ছিলেন। সুতরাং আলাওল মুঘলের সমর্থক ছিলেন বলা যায় না। শাহ শুজা যখন ঢাকা থেকে রওনা হন তখন জান বেগ, মির্জা বেগ, সৈয়দ কুলি উজবেক, সৈয়দ আলম বাদহ্‌কাশ তাঁর অনুগামী হন; এঁদের মধ্যে জান বেগ ঢাকায় ফিরে যান। শুজার নৃশংস হত্যার পর মীর জুমলা শ্রীচন্দ্র সুধর্মের কবল থেকে তাঁর পরিবারের জীবিত সদস্যকে উদ্ধার করার জন্য ওলন্দাজদের সহায়তায় জনৈক মির্জা আলী বেগকে রোসাঙ্গে প্রেরণ করেন।[১৯] বলা বাহুল্য, ইনি আলাওলের কথিত 'মির্জা' নন, সে মির্জার পরিচয় আলাওল এভাবে দেন:

এজিদ প্রকৃতি সেই দাসীর নন্দন।
মিথ্যা কহি কত লোক করাইল বন্ধন।।

সাময়িকভাবে হলেও রোসাঙ্গের রাজসভায় তার প্রভাব ছিল।

রোসাঙ্গের কাজী সৈয়দ মসউদ শাহ 'পীর' ছিলেন। সম্ভবতঃ কারামুক্তির পর আলাওল তাঁরই কৃপা লাভ করেন। তিনি আলাওলকে 'কাদেরী খিলাফত' উপাধিতে ভূষিত করেন। মসউদ শাহ কাদেরীয়া সুফীমতের অনুসারী ছিলেন, তা সুনিশ্চিত। উক্ত 'খিলাফত' লাভের অর্থ অন্যকে দীক্ষাদানের অধিকার পাওয়া—প্রবীণ আলাওলের পক্ষে তা-ই সঙ্গত ছিল। 'জ্ঞান অল্প আছে' বলে মসউদ শাহ তাঁকে ঐ মর্যাদা দান করেন। এটি আলাওলের বিনয়ভাষণ। 'তোহ্‌ফা' সুফীতত্ত্বের গ্রন্থ। 'পদ্মাবতী' কাব্যে রত্নসেনের যোগীবেশ ধারণ ও যোগসাধনার বর্ণনায় আলাওলের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিচয় আছে। রোসাঙ্গে মুসলিম আইনের ব্যাখ্যা ও বিচার-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য মসউদ শাহ কাজী পদে নিযুক্ত হন।

আলাওল বিবাহিত জীবন যাপন করেন, তাতে সন্দেহ নেই। 'ভিক্ষা করি দেএ দারা নিজ কর' 'পুত্র দারা সঙ্গে মুঞি হৈলুঁ পরবশ' চরণদ্বয় কবির স্ত্রী-পুত্র বর্তমান থাকার প্রমাণ বহন করে। সাময়িক হলেও 'ভিক্ষাবৃত্তি' কবির মর্মপীড়ার কারণ ছিল। কবির বিশ্বাস, 'মন্দকৃতি' ও 'ভিক্ষাবৃত্তি' দু-ই জীবনকে 'কর্কশ' করে তোলে।

সৈয়দ মুসার এবং মজলিস নবরাজের ব্যক্তিগত পরিচয় কোন সূত্রে জানা যায় না। আলাওল নবরাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তাঁর ভাষায়,

রোসাঙ্গ দেশে আছন্ত যথ মুসলমান।
মহাপাত্র মজলিস সবার প্রধান।।

কবি নবরাজের অতিথিসেবা ও বিলাসপ্রিয়তার বর্ণাঢ্য বিবরণ দেন।

একদিন মজলিস করি মেহমানি।
মহা মহা মুসলমান ভুঞ্জাইল আনি।।

১৯. মুহম্মদ সিদ্দিক খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬-০৭, ১৫০।

www.pathagar.com

ষট রসে ভুঞ্জাইলা নানা পাকোন্নান।
চব্য চুষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ বিধান।।
চন্দন কস্তুরী আদি গোলাপ সুগন্ধ।
কর্পূর তাম্বুলে সভা হইল আনন্দ।।
বাদ্য কবিলাস আদি যন্ত্র সুললিত।
কেহ কেহ মধুর সুস্বরে গাহে গীত।।

মুঘল-বিদ্রোহের পর রোসাংগে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। 'মহা মহা মুসলমান' শহরে অবস্থান করতেন। সভার অভ্যাগতরা নবরাজকে 'মুসলমানি দ্বীনে তুহ্মি উজ্জ্বল প্রদীপ' বলে উল্লেখ করেন এবং 'মসজিদ পুষ্করণী আদি কৈলা পুণ্য কাম' বলে প্রশংসা করেন। বলা বাহুল্য, তিনি কবির ভরণপোষণের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং কবিকে 'সিকান্দর-নামা' রচনার অনুরোধ করেন। কবি যথেষ্ট বৃদ্ধ হলেও ('নিরস হইল অঙ্গ না প্রকাশে মতি') রাজাজ্ঞা শিরোধার্য মনে করে কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করেন। এটি আলাওলের শেষ কাব্য।

মজলিস নবরাজ সম্পর্কে অতিরিক্ত একটি তথ্য আছে 'রোসাঙ্গ রাজের অভিষেক' বর্ণনায়। চন্দ্র সুধর্মের পুত্র যুবরাজ উগবালার অভিষেক-অনুষ্ঠানটি তিনিই পরিচালনা করেন। তিনি রাজনীতি সম্পর্কে নিম্নরূপ উপদেশ দেন :

পুত্রবৎ প্রজারে পালিবা নিরন্তর।
না করিবা ছলবল লোকের উপর।।
শাস্ত্রনীতি রাজকার্যে হৈবা ন্যায়বন্ত।
নির্বলীরে না করৌক বলবন্ত।।
দয়াল চরিত্র হৈবা সত্যধর্মবন্ত।
সুজনেরে সম্ভাষিবা নাশিবা দুরন্ত।।
ক্ষেমা ধর্ম আচরিবা চঞ্চল না হৈবা।
পূর্ব অপরাধে কার মন্দ না করিবা।।

যুবরাজ অভিষেক-শেষে নবরাজকে 'সালাম' করেন, শেষে মাতৃকুলের লোকজনকে 'প্রণাম' করেন। এতে রোসাঙ্গে নবরাজের একচ্ছত্র প্রভাব ও নিরংকুশ প্রাধান্য প্রমাণিত হয়।

১৬৭৩ সালে 'সিকান্দরনামা' রচনা সমাপ্ত করার অল্পকাল পরে সম্ভবত আলাওল রোসাঙ্গে পরলোকগমন করেন।

www.pathagar.com

জোনসের ফারসী ভাষার ব্যাকরণের পরিমার্জনা ও মীর্জা শেখ ইতেশামুদ্দীন

আবু তাহের মজুমদার*

বহু ভাষাবিদ হিসেবে স্যার উইলিয়াম জোনসের কথা বিবেচনা করতে গেলে তাঁর লেখা ফারসী ভাষার ব্যাকরণটির কথা সবারই মনে হবে। ব্যাকরণটি লিখে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাচ্য ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করেন। সে সময়ের জন্য এটি ছিল একটি দুঃসাহসের কাজও। কারণ জোনসের সামনে অনুসরণ করার মত প্রাচ্য ভাষার কোন ব্যাকরণই তখন ছিল না। স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই তিনি ব্যাকরণটি লেখেন। দীর্ঘদিন যাবৎ সবারই এ ধারণা ছিল যে, ব্যাকরণটি তাঁর একক প্রচেষ্টার ফল এবং এটি রচনার ক্ষেত্রে আর কারও কোন অবদান নেই। এর যুক্তিসঙ্গত কারণও ছিল। তখন জোনসকে সাহায্য করার মত ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন তেমন কোন পণ্ডিতও ছিলেন না, যিনি সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করে উদারচিত্তে এগিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু বহু পরে এ বিতর্কের সৃষ্টি হয় যে ফারসী ভাষার ব্যাকরণটি জোনসের একক প্রচেষ্টার ফল নয়, এটির রচনায় একজন শিক্ষিত ভারতীয়েরও অবদান রয়েছে। এই শিক্ষিত ভারতীয়ের নাম মীর্জা ইতেশামুদ্দীন।[১]

দুটি অনুসন্ধিৎসা-উদ্দীপক প্রসঙ্গ থেকে বর্তমান নিবন্ধের সূত্রপাত। এর একটি হচ্ছে ইন্ডিয়ান রিভিউতে[২] প্রকাশিত জগমোহন মহাজনের একটি প্রবন্ধ। এটিতে মহাজন

---

*আবু তাহের মজুমদার, অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

১. পূর্ণ নাম মীর্জা শেখ ইতেশামুদ্দীন। মীর জুমলা কর্তৃক আসাম আক্রমণের ইতিহাস *Tarikh-e-Assam* অথবা *Fathia Ibrica*-র প্রণেতা, ইরানের নাগরিক শিহাবুদ্দীন তালিশের দৌহিত্র। ইতেশামুদ্দীন বেশ দ্রুততার সঙ্গেই বাঙালী হয়ে যান। তাঁর রচনায় বাংলাদেশের প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নদীয়া জেলার পাঁচনুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সেখানে আজও তাঁর বংশধরেরা রয়েছেন। ঢাকাতেও রয়েছেন তাঁর কয়েকজন বংশধর। তিনি ইউরোপ-ভ্রমণকারী প্রথম শিক্ষিত ভারতীয়। বক্সার যুদ্ধের পর রাজা তৃতীয় জর্জের নিকট সম্রাট শাহ্ আলমের প্রতিনিধিদলের একজন সদস্য হিসেবে ১৭৬৬ সালে তিনি ইংল্যান্ডে যান এবং প্রায় তিন বৎসর পর দেশে ফেরেন। ১৭৮৪ সালে তিনি তাঁর সফর-অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন (দেখুন এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ, 'বিলায়েতনামা' (ঢাকা, ১৯৮১), পৃ ৬৮)। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ আবু ইমামও আলোচনা-প্রসঙ্গে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে সম্ভবতঃ ইতেশামুদ্দীনই এই ভারতীয় হবেন যাঁর সঙ্গে জোনস তাঁর ব্যাকরণ সম্বন্ধে পর্যালোচনা করেন। কারণ ১৭৬৬ সালে ফারসীতে অভিজ্ঞ অন্য কোন ভারতীয়ের পক্ষে ইংল্যান্ডে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুবই ক্ষীণ। বিভিন্ন গ্রন্থকার যে তাঁর নামের ভিন্ন ভিন্ন বানান লিখেছেন, তার কারণ এই যে, সে সময়ে বাংলা বা ফারসী নামের ইংরেজীতে লিপ্যন্তরের কোন আদর্শ বা স্বীকৃত পদ্ধতি চালু ছিল না।

২. Mahajon, Jagmohan, "Sir William Jones : An Eminent Orientalist", *Indian Review*, Vol. XLVII, Sept. 1946, 479.

www.pathagar.com

লেখেন যে "ইংল্যান্ড সফরকারী সম্ভবতঃ প্রথম শিক্ষিত ভারতীয় ইতেশামুদ্দীনের সহায়তায়" ১৭৭১ সালে জোনস তাঁর ফারসী ভাষার ব্যাকরণ (*A Grammar of the Persian Language*) প্রকাশ করেন, "এটির বেশ কয়েকটি সংস্করণ হয়" এবং এটি "উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইংরাজকে ফেরদৌসী ও হাফিজের ভাষার সংগে পরিচয় করিয়ে দেয়"। অন্যটি হলো সম্প্রতি প্রকাশিত জোনসের একটি চিঠি।[৩] এই চিঠিতে জোনস অভিযোগ করেন যে তিনি একজন ভারতীয়কে তাঁর ব্যাকরণটি পরিমার্জনার (revise) জন্য দেন এবং সে যখন বিশ্বাসভংগ করে জর্জ নিকলকে[৪] ব্যাকরণটি অনুলিপি করতে সাহায্য করছিল তখন হাতে-নাতে ধরা পড়ে। তার উদ্দেশ্য ছিল অশুভ। সে চেয়েছিল পাণ্ডুলিপিটি মুদ্রণের জন্য প্রেসে পাঠাবার আগেই নিকল এর একটি চোরাই সংস্করণ বের করুক। জোনস আরও অভিযোগ করেন যে, এর ফলে তিনি গ্রন্থকার হিসেবে স্বীকৃতি এবং খ্যাতি দুটো থেকেই বঞ্চিত হতেন; সৌভাগ্যক্রমে তাঁর এক বন্ধু[৫] হঠাৎ করে সেখানে উপস্থিত হন এবং নিকলকে ধরে ফেলেন। কিন্তু জোনস কোথাও এই ভারতীয়ের নামোল্লেখ করেন নি। নিম্নের আলোচনা থেকে আমরা এ ধারণা করতে পারি যে সম্ভবতঃ মীর্জা ইতেশামুদ্দীনই ছিলেন এই ভারতীয়।[৬]

উপরি-উল্লিখিত তথ্য দুটি বিবেচনা করলে স্বাভাবিকভাবেই এ রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়ঃ এই ইতেশামুদ্দীন কে ছিলেন? তিনি এবং জোনসের চিঠিতে উল্লিখিত ভারতীয় কি একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি? যদি তাই হয় তবে কি উদ্দেশ্যে তিনি নিকলকে জোনসের ব্যাকরণের অনুলিপি করার সুযোগ দেন? জোনসের অভিযোগের সমর্থনে কি কোন তথ্য বা প্রমাণ উপস্থাপিত করা যায়? বক্ষ্যমান নিবন্ধটিতে এইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তার আগে ফারসী ভাষার ব্যাকরণটি রচনা করতে জোনস কি জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সে সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে।

---

৩. Mojumder, Abu Taher (ed,) "Three New Letters by Sir William Jones", *India Office Library and Records, Report for the year 1981* (London, 1982), Letter No. 2, pp 29-31.

৪. Cotton, Sir Evan, "The Journals of Archibald Swinton", *Bengal Past and Present* Vol. XXXI, January-June 1926.

৫. জোনস কোথাও তাঁর বন্ধুর নাম উল্লেখ করেন নি বা পরিচয় দেন নি।

৬. একজন ভারতীয় কর্তৃক জোনসের ব্যাকরণটি পরিমার্জনার ব্যাপারটি জোনস-সম্পর্কিত পণ্ডিতদের অগোচরেই থেকে যায় এবং তাঁদের কোন রচনাতেই এর কোন উল্লেখ নেই। এসব পণ্ডিতদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেনঃ অধ্যাপক এ. জে. আরবেরী, যিনি জোনসের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং জোনস-সম্পর্কিত বেশ কয়টি জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধের রচয়িতা; অধ্যাপিকা ফাতমা মুসা মাহমুদ, যিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জোনসের উপর পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী করেছেন এবং জোনস-সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ এবং প্রবন্ধের রচয়িতা; অধ্যাপক রিয়াজ হাসান, যিনি ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জোনসের উপর এম. লিট. ডিগ্রী লাভ করেছেন; অধ্যাপক এস. এন. মুখার্জী, যিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জোনসের উপর পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী করেছেন এবং একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থও প্রকাশ করেছেন; সর্বোপরি টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গারল্যান্ড ক্যানন, যিনি জোনসের সর্বাধুনিক জীবনীকার (*Oriental Jones*, 1964)—এ জীবনীটির একটি দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের কাজ প্রায় সম্পন্ন। তিনি জোনসের পত্র-সমগ্রের একটি চমৎকার সটীক সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। জোনসের জীবনের এবং রচনাবলীর বিভিন্ন দিক নিয়ে ক্যানন অসংখ্য নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

www.pathagar.com

জোনস ছিলেন অষ্টাদশ শতকের "সবচেয়ে খ্যাতিমান বৃটিশ প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ"।[৭] "প্রথমবার হাফিজের কবিতা পাঠ করার পর তাঁর জীবন স্থায়ীরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়।"[৮] "অষ্টাদশ শতকে যাঁরা খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের একজন।"[৯] বলাই বাহুল্য যে এ রকম খ্যাতির মূলে ছিল প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর যুগান্তকারী এবং অগ্রণী ভূমিকা। তাঁর রচনাবলীতেই "ইংল্যান্ডে যথার্থ প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার সূত্রপাত পরিলক্ষিত হয়"।[১০] অষ্টাদশ শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে হিব্রু ভাষা অধ্যয়ন করতে করতে তিনি আরবী ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং আরবী ভাষা অধ্যয়ন করার সময়ে আকৃষ্ট হন ফারসীর প্রতি। শেষোক্ত ভাষা অধ্যয়নে তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিল Franciscus Meninski-বিরচিত *Treasaurus Linguarum Orientalium Turcicae Persicae*। Georgious Gentius কর্তৃক অনূদিত সাদীর 'গুলিস্তাঁ' তিনি অভিনিবেশ-সহকারে পাঠ করেন। ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রাচ্য-ভাষা-ব্যাখ্যাতার চাকুরির প্রস্তাব দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য পদটি তিনি গ্রহণ করেন নি। সরকারপক্ষের অনুরোধে তিনি ডেনমার্কের রাজা সপ্তম খ্রীষ্টিয়ানের জন্য মীর্জা মাহদী-বিরচিত নাদির শাহের জীবনী 'তারিখ-ই-নাদিরী' অনুবাদ করে দেন। রাজা তাঁকে রয়েল সোসাইটি অব কোপেনহেগেনের সদস্য করে নেন এবং জোনসের প্রশংসা করে রাজা তৃতীয় জর্জের নিকট একটি চিঠি লেখেন। ফলে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে জোনসের খ্যাতি। হাঙ্গেরীর Count Charles Reviczkiর সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলে তাঁর ফারসী-চর্চা আরও নিবিড় হয়, কারণ Reviczki ফারসীর অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন।

ফারসী ভাষা অধ্যয়ন করার সময়েই তিনি সরকারী কাজে ভারত-গমনেচ্ছু এক বন্ধুর জন্য ফারসী ভাষার একটি প্রাথমিক ব্যাকরণের খসড়া প্রস্তুত করতে শুরু করেন। তখন ভারতে ফারসীই ছিল কূটনীতি, প্রশাসন এবং আইন-আদালতের ভাষা। ১৭৭১ সালে *A Grammar of the Persian Language* এই শিরোনামে চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করার আগে তিনি বেশ কয়েকবার ব্যাকরণটির পরিমার্জনা করেন। কোর্ট অব ডিরেক্টরসকে লিখিত জোনসের উপরি-উল্লিখিত পত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, ব্যাকরণটিকে যতদূর সম্ভব নির্ভুল করার জন্য তিনি এর খসড়াটি একজন ভারতীয়কে পরিমার্জনার জন্য দেন।

---

৭. Arberry, A. J., "The Jones Tradition in British Orientalism", *Indian Art and Letters*, Vol. 23, N. S. No. 1. 1948, 14 ("the most illustrious of all British Orientalists").

৮. Hewitt, R. M., "Harmonious Jones", *Essays and Studies by Members of the English Association*, Vol. 23, 1942, 48 (his "life was permanently changed by his first reading of Hafiz").

৯. Cannon, Garland H., "Freedom of the Press and Sir William Jones". *Journalism Quaterly*, Vol. 33, 1956, 179 (মন্তব্যটি নিম্নরূপ: "One of the greatest reputations of the 18th century").

১০. Yohamnan, John D., "The Persian Poetry Fad in England, 1770-1825", *Comparative Literature*, Vol. 4, 1952, 137 (মূল: in whose work the "true beginnings of Oriental studies are to be found").

www.pathagar.com

পত্রটি লেখা হয় ১৭৭০ সালের নভেম্বরে। এই পত্রে জোনস তাঁর ব্যাকরণটির জন্য বেশ জোরালোভাবে কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতা কামনা করেন। কোম্পানির স্বার্থ, সুবিধা এবং ব্যক্তিগত সুনাম ইত্যাদির কথা মনে রেখেই তিনিই কোর্ট অব ডিরেক্টরসে লিখেছেন বলে জানান। তিনি অনেক বৎসর ধরে আরবী ও ফারসী ভাষা অধ্যয়ন করেছেন এবং এক সময়ে ধীরে ধীরে ভাবতে শুরু করেন যে ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করার উর্ধ্বে উঠে তাঁর পরিশ্রমলব্ধ ফলকে অন্যদের কল্যাণেও নিয়োজিত করা উচিত। এই ভাবনা থেকেই তিনি ব্যাকরণটি সম্পাদনা করেছেন এবং যতদূর সম্ভব স্বচ্ছ এবং বোধগম্যভাবে ফারসী ভাষার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, দৃষ্টান্ত সংযোজন করেছেন অনেক প্রখ্যাত প্রাচীন ফারসী কবির[১১] থেকে। তাঁর সার্বক্ষণিক বাসনা ছিল যে এটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজে ব্যবহৃত হবে এবং কোম্পানিও এটির ব্যাপারে আগ্রহী হবেন। কিন্তু একটি ঘটনা তাঁকে আতঙ্কিত করেছে। তিনি লেখেন: "But I could not believe that any man would be base enough to make such an attempt till a circumstance which lately happened, convinced me that no step can be so mean for those who are merely actuated by a low desire of gain, without any view to reputation, or any abilities to acquire it. *In order to make my grammar as correct as possible, I intrusted it to a native of India,*[১২] *now residing in London, requesting him to examine attentively the Persian part, as the book was to be printed in about a fortnight.*[১৩] While it was with him, a friend of mine received intelligence that a conspiracy was formed to procure a copy of my book before it was made publick, and consequently to deprive me not only of my property, but, by a more malicious cruelty, of my reputation as a man of letters and honour. He went immediately to the Indian's lodgings, where we found a person employed in transcribing my grammar, and so far advanced that he wanted but a few lines of the conclusion. I should have been extremely shocked at so illiberal an attempt in any man; but I was moved with still greater indignation upon finding that the person detected in it was George Nicol, the very man, who in concert with Hamilton[১৪] had advertised a Persian grammar, and dictionary

---

১১. প্রধানতঃ হাফিজ, যাঁর একটি গজলের অনুবাদ, "A Persian song of Hafiz"। এই অনুবাদ তৎকালে বেশ খ্যাতি অর্জন করে এবং জোনসকে কবি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এটির আরও মূল্যবান অবদান হলো সুধীমহলে ফারসী কাব্য ও সাহিত্য সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি করা ও ফারসী-চর্চায় আগ্রহ বাড়িয়ে দেওয়া।

১২. জোনস এ ভারতীয়ের নাম কোথাও উল্লেখ করেন নি। মীর্জা শেখ ইতেশামুদ্দীনই এ ভারতীয় কি-না তাই নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে এই নিবন্ধে।

১৩. বাকী হরফ লেখকের।

১৪. আর্চিবল্ড হ্যামিলটন এবং জর্জ নিকল ছিলেন ছিলেন পুস্তকবিক্রেতা (এখনকার ভাষায় 'প্রকাশক'), আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানিত। ১৭৩৬ সাল থেকে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত হ্যামিলটন ফ্লিট স্ট্রিটের ফলকন কোর্টে একজন মুদ্রাকর ছিলেন। তাঁর জন্ম হয় স্কটল্যান্ডে। উইলিয়াম

www.pathagar.com

under the patronage oi the East India Company.[১৫] On the sudden appearance of my friend, Nicol behaved like a man conscious of guilt; he turned pale, and strove to conceal my grammar, and his copy;[১৬] but they were both seized, are now happily for me in my possession. This fact may be proved by many witnesses[১৭] who are ready to attest it, if indeed and further proof be required than the hand writting of Nicol. I only relate the circumstance as it happened, and leave every honest man to make a comment upon it."

চিঠির উদ্ধৃতাংশ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

১। জোনসের ব্যাকরণটির রচনা যখন সমাপ্ত এবং প্রকাশনা আসন্ন তখন লন্ডনে একজন ভারতীয় অবস্থান করছিলেন।

২। এই ভারতীয়ের, স্পষ্টতই, ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল এবং তাঁর পাণ্ডিত্যের উপর জোনসের আস্থা জন্মেছিল।

৩। জোনস মনোযোগের সংগে তাঁকে ব্যাকরণটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

৪। জোনসের এক বন্ধু জানতে পারেন যে এই ভারতীয় বিশ্বাসভংগ করে জর্জ নিকল নামক একজন লোককে একটি চোরাই সংস্করণ বের করার জন্য ব্যাকরণটি গোপনে নকল করতে দিয়েছেন এবং তিনি তড়িঘড়ি সেই ভারতীয়ের আবাসস্থলে গিয়ে মূল ব্যাকরণটি এবং তার অনুলিপি উদ্ধার করেন।

৫। জর্জ নিকল এবং হ্যামিলটন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় ফারসী ভাষার একটি ব্যাকরণ-প্রকাশনার ব্যাপারে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।

সটহাণ্ডের জন্য তিনি লন্ডনে ম্যানেজার হিসাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৭৫৬ সালে তিনি *Critical Review*এর প্রকাশনা শুরু করেন। তাঁর সবচেয়ে সফল কাজের মধ্যে একটি হলো স্মলেটের *Compleat History of England*এর প্রকাশনা। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। নিকল তাঁর পিতৃব্য ডেভিড উইলসনের অধীনে শিক্ষানবীশ ছিলেন। ১৭৬৯ সাল থেকে ১৮২৯ সাল পর্যন্ত পল মলে তিনি নিজের ব্যবসা পরিচালনা করেন। এখানে তাঁর বহুসংখ্যক প্রখ্যাত গ্রাহক জোটে এবং তাঁকে রাজা তৃতীয় জর্জের পুস্তকবিক্রেতা হিসেবে নিয়োগ করা হয়। ১৮২৯ সালে ৮৮ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। (Plomer, M. R., Bushuele, G, M., এবং Din, E. R. M. C. (eds.), *A dictionary of the printers end booksellers who were at work in England, Scotland and Ireland from 1726 to 1775* (Oxford, 1932), pp 114, 181.)

১৫, আর্চিবল্ড হ্যামিলটন এবং জর্জ নিকলের প্রস্তাবাবলী (এগুলির জন্য পরিশিষ্ট 'ক' দেখুন) কৌতূহলোদ্দীপক, কারণ তাঁরা জোনসকে একজন authority হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এমন ভাব দেখিয়েছেন যেন জোনস তাঁদের নিকট অপরিচিত। কিন্তু জোনসের চিঠি থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে নিকল তাঁর পরিচিত ছিলেন। অন্য যাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে সম্ভবতঃ ক্যাপ্টেন সুইন্টন এবং মীর্জা ইতেশামুদ্দীন ছিলেন। এতে মনে হতে পারে যে জোনসের অভিযোগ সত্য।

১৬. জোনস এটি দিয়ে কি করেছেন তা জানা যায় নি। এ চিঠিতে ছাড়া তাঁর রচনাবলীর কোথাও এটির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

১৭. তাঁদের চেনার ব্যাপারে কোন সূত্র পাওয়া যায় না। মনে হয় যে তাঁদের সংগে যোগাযোগ বা আলোচনা করার কোন তাগিদ কোর্ট অনুভব করেন নি। সুইন্টন (নিচের টীকা দেখুন) হয়ত তাঁদের মধ্যে একজন হতে পারেন।

www.pathagar.com

৬। এই ঘটনার অনেক সাক্ষী আছে এবং সবচেয়ে বড় সাক্ষী হলো নিকলের হাতের লেখা।

এখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে :

১। কে এই ভারতীয় ?

২। জোনস কিভাবে তাঁর সম্পর্কে জানতে পারেন ?

৩। নিকলের সঙ্গে এই ভারতীয়ের যোগাযোগই বা হল কি করে ?

৪। জোনস ও নিকলের মধ্যে কি পরিচয় ছিল ?

৫। জোনসের বন্ধুটি কে এবং চোরাই অনুলিপিটির কি হল ?

৬। জোনসের চিঠি সম্পর্কে কোর্ট অব ডিরেক্টরসের প্রতিক্রিয়া কি ছিল ?

প্রথমেই দেখা যাক, 'কে এই ভারতীয়' ? সম্ভবত মীর্জা ইতেশামুদ্দীনই ছিলেন এই ভারতীয়। সাইয়েদ এ. এস. এম. তাইফুর তাঁর সম্পর্কে "Sheikh Itesamuddin of Nadia. The First Indian to visit London"[১৮] নিবন্ধে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন : "শেখ তাজুদ্দীনের পুত্র শেখ ইতেশামুদ্দীন নদীয়া জেলার অন্তর্গত পাচনুর পরগনার কসবা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময়ে হিন্দুদের নিকট 'কালাপানি'র[১৯] চিন্তামাত্রই ছিল পাপ এবং ভীতির উৎস। সাধারণতঃ ধারণা করা হয়ে থাকে যে রাজা রামমোহন রায়ই[২০] ছিলেন ১৮৩১ সালে ইংল্যান্ড পরিভ্রমণকারী প্রথম শিক্ষিত ভারতীয়। কিন্তু সম্ভবত খুব কম লোকই জানে যে এই মুসলমান ভদ্রলোক রাজার ৬৪ বৎসর পূর্বেই ইংল্যান্ড পরিভ্রমণ করেন। ইউরোপীয় এবং ভারতীয় প্রভুদের অধীনে শেখ চাকুরি করেছেন। একবার লর্ড ক্লাইভ ও অন্যেরা হিন্দুস্থানের বাদশাহ শাহ আলমের নিকট থেকে ইংল্যান্ডের রাজার নিকট একটি চিঠি[২১] পৌঁছে দেওয়ার জন্য ক্যাপ্টেন

---

১৮. Taifoor, Syed A. S. M., "Sheikh Itesamuddin of Nadia, The First Indian to visit London", *Bengal Past and Present*, Vol, XLIX, January—June 1935, 117-120.

১৯. যে সমস্ত সমুদ্র অতিক্রম করে ইংল্যান্ডে যেতে হতো সেগুলিকে মধ্য এবং তৎপরবর্তী যুগে কালাপানি নামে অভিহিত করা হতো। সে সময়ে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া বা অতিক্রম করা বাঙালী হিন্দুদের জন্য ছিল একটি মহাপাপের কাজ। কেউ এ কাজ করলে তাকে সমাজচ্যুত করা হতো এবং প্রায়শ্চিত্ত না করলে তাকে সমাজে পুনরায় গ্রহণ করা হতো না।

২০. রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২—১৮৩৩) দিল্লীর বাদশাহের দূত হিসেবে ইংল্যান্ডের রাজার নিকট প্রেরিত হন। ৮-৪-১৮৩১ তারিখে লিভারপুলে অবতরণের পর তিনি বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন। তিনি পার্লামেন্টে বৈদেশিক দূতগণের আসনে বসবার অধিকার পান। ১৮৩২ সালে তিনি প্যারিসে গেলে ফরাসী সম্রাট লুই ফিলিপ কর্তৃক সংবর্ধিত হন। ইংল্যান্ডে ফিরে তিনি ব্রিস্টল শহরে বাস করেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

২১. তাইফুরের নিবন্ধ থেকে জানা যায় যে এই চিঠিটি জাল ছিল (Taifoor, A. S. M ১(8-119)। সুইন্টনের উদ্ধৃতি দিয়ে কটন ব্রিটেনের রাজার নিকট থেকে সাহায্য চে... শাহ আলমের লেখা চিঠিটি খাঁটি বলে মত প্রকাশ করেছেন (Cotton, Sir Evan, "The Journals of Archibald Swinton", *Beagal Past and Present*, Vol. XXXI, January-June 1926, 34)। তাঁর ভ্রমণ-কাহিনী *Shigurf Namah-i-Belayet*এ ইতেশামুদ্দীন জানিয়েছেন যে ভারত-সম্রাট শাহ আলমের পক্ষে ক্লাইভ এবং অন্যেরা চিঠিটি লেখেন (ইতেশামুদ্দীন, পৃ ৫-৭, ৩০ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য)। ১৯৩৯ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের এক সম্মেলনে ডঃ এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ ফারসী ভাষায় লিখিত মূল চিঠিটির ইংরাজী তরজমা পাঠ করেন। তিনি অবশ্য এ চিঠিটির

www.pathagar.com

আর্চিবল্ড সুইন্টনকে[২২] দায়িত্ব দেন। ফারসীতে লেখা চিঠিটি ব্যাখ্যা করার জন্য ক্যাপ্টেনের সংগে একজন মুনশীকে[২৩] পাঠানোর প্রয়োজন হয়। শেখ এ কাজের জন্য নির্বাচিত হন। ক্যাপ্টেন সুইন্টনের সমভিব্যাহারে শেখ সাহেব সমুদ্রপথে জাহাজে করে ইংল্যান্ডের পথে পাড়ি দেন। কিন্তু সেখানে পেঁছার পর তিনি বুঝতে পারলেন যে ইংল্যান্ডে অবস্থান করার কোন প্রয়োজন তাঁর নেই এবং তিনি দেশে ফিরতে মনস্থ করেন। ভারতে চাকরি করার জন্য এবং ফারসী ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য নির্বাচিত তরুণ ইংরেজদের জন্য উচ্চ সম্মানীতে ফারসী ভাষায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করার ব্যাপারে অনেক ইংরাজ বন্ধু তাঁকে ইংল্যান্ডে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় সেখানে থাকার ব্যাপারে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। ক্যাপ্টেন সুইন্টন এবং অন্যদের সঙ্গে লন্ডনের সুপ্রিম কোর্টে কোম্পানির কতিপয় কাউন্সিলরের যে বিচার[২৪] হয় তিনি তা প্রত্যক্ষ করেন এবং তাঁদেরকে ফারসী ভাষায় লেখা চিঠি পাঠে সহায়তা করেন। "প্রথাসিদ্ধ ঢিলেঢালা পোশাক", "রকমারি চেহারা" এবং "সর্বব্যাপী গুড়গুড়ি" "হুক্কা", যা লন্ডনের সুপ্রিম কোর্টের অঙ্গনেও প্রবলভাবে দেদীপ্যমান ছিল, তা নিয়ে তিনি বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। লন্ডন-জীবন আনন্দদায়ক মনে না হওয়ায় তিনি ১৭৬৯ সালে বাড়ির পথে রওনা হন। তিনি এক বৎসর সাত মাস ইংল্যান্ডে অবস্থান করেন। দেশে ফিরতে তাঁর লাগে এক বৎসর এবং তিনি মাদ্রাজে অবস্থান করেন দু মাস। অক্সফোর্ড পরিদর্শনকালে তিনি সুইন্টনের জন্য 'ফারহাং-ই-জাহাঙ্গীরী'র[২৫] (ফারসী ভাষার একটি

বিতর্ক নিয়ে কোন আলোকপাত করেননি (দেখুন Habibullah, A. B. M., *Bilayetnama* (Dhaka, 1981), p 6)।

২২. ক্যাপ্টেন আর্চিবল্ড সুইন্টন এডিনবরায় জন্মগ্রহণ করেন। ইংল্যান্ডের একটি স্কুলে তিনি অ্যানাটমি, মেডিসিন এবং সার্জারিতে পাঠ নেন এবং বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে মালয় উপদ্বীপে এবং পেগুতে শল্যবিদ হিসেবে চাকুরি করেন। পরে মাদ্রাজে এসে তিনি লর্ড ক্লাইভের সংগী হন এবং অন্যদের মধ্যে মেজর অ্যাডাম এবং জেনারেল কর্নাকের অধীনে চাকুরি করেন। সামরিক বাহিনীতে তিনি বেশ মর্যাদাসম্পন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ফারসী ভাষার পণ্ডিত হিসেবে তাঁর বেশ সুখ্যাতি ছিল। দেশে ফেরার পর তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। তাঁকে Freedom, of the city of Glasgow, the Edinburgh Fortrose and the town of Invernesse' খেতাবে ভূষিত করা হয় (Taifoor. 128-129)।

২৩. "At this time there were only eight Moonshees in the Service of (English) gentlemen" (Itesamodeen, টীকা ৩০, 4)। কিন্তু ১৭৯০ সাল নাগাদ একজন মুনশী নিয়োগ করা একটি নিয়মিত রেওয়াজে পরিণত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে কর্নওয়ালিস কোম্পানির প্রত্যেক 'writer'কে ফারসী লেখানোর জন্য একজন মুনশী নিয়োগের ব্যাপারে মাসে ৩০ টাকা অতিরিক্ত ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন (Kopf, David, *British Orientalism and the Bengal Renaissance* (California, 1969), p 18)।

২৪. এ সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনেক কর্মচারীই ভারতে কোম্পানির স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যক্তিগত ব্যবসার মাধ্যমে ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। এ ধরনের দুর্নীতির ব্যাপারে পার্লামেন্টারী তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। ১৭৬৬ সালে কমিটি কোম্পানির কয়েকজন কর্মকর্তার কার্যকলাপের ব্যাপারে তদন্ত করেন। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়।

২৫. আধুনিক ইংরেজী বানান *Farhang-i-Jahangiri*। এটি বিশুদ্ধ ফারসী শব্দের একটি সুপরিচিত কোষ। এটি জামালুদ্দীন হোসাইন বিন ফখরুদ্দীন হাসান ইঞ্জু কর্তৃক সংকলিত হয়। তিনি সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে তাঁরই ইচ্ছানুসারে এই সংকলনের কাজ শুরু করেন এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ১৬৮০ সালে তা সমাপ্ত করেন। এই শব্দকোষটি সংকলনের কাজ প্রায় ৩০ বৎসরব্যাপী

www.pathagar.com

অভিধান) শেষাংশের অনুলিপি করেন। কলকাতা কোর্টের (পরবর্তীতে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা যশস্বী স্যার উইলিয়াম জোনস) জোনসের সঙ্গে সেখানেই তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

সুইন্টন এবং জোনসের অনুরোধে তিনি ইংল্যান্ডের রাজার নিকট বাহরাইনের (?) সুলতানের তুর্কী ভাষায় লেখা তিনটি চিঠির পাঠোদ্ধার করে দেন। ভারত থেকে আসার সময়ে ক্যাপ্টেন সুইন্টন জাহাজে বসে শেখ ইতেশামুদ্দীনের সঙ্গে 'কালিলা দিমনা'[২৬] গ্রন্থটির সবটাই পড়ে ফেলেন এবং 'ফারহাং-ই-জাহাঙ্গীরী'র ১২টি অধ্যায়ের অনুবাদ করেন। এই অনুবাদের সাহায্যে জোনস "শেকেরিস্তাঁ"[২৭] (সম্ভবত এটি শেখ সাদীর গুলিস্তাঁর টীকাভাষ্য) নামক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেন এবং এটির মুদ্রিত সংখ্যা উচ্চমূল্যে ইংল্যান্ডের ধনী লোকদের নিকট বিক্রয় করেন।

"The Journals of Archibald Swinton" নিবন্ধে Sir Evan Cotton[২৮] জানাচ্ছেন যে, ভারতে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে চাকুরি করার পর ক্যাপ্টেন সুইন্টন ১৭৬৫ সালে কোম্পানির চাকুরি থেকে ইস্তফা দেন। একই বৎসরে ডিসেম্বরে তিনি সমুদ্রপথে ইউরোপে যাত্রা করেন। লর্ড ক্লাইভের সম্মতিক্রমে তিনি সম্রাট শাহ আলমের নিকট থেকে গ্রেট ব্রিটেনের রাজার নিকট একটি চিঠি নিয়ে যান। ফারসী ভাষায় চিঠিটির একটি উত্তর পাঠানো হয়তো সমীচীন হবে এই কথা ভেবে ক্লাইভ তাঁকে সঙ্গে করে

চলে (Habibullah, A, B. M., *Descriptive Catalague of the Persian, Urdu and Arabic Manuscripts in the Dhaka University Library* (Dhaka, 1966), Vol. I, pp 195-196)।

২৬. Kalela Dimna : মূলে ভারতীয় লেখক বিদপা'য়ীর "জীবজন্তু বিষয়ক গল্প"। গল্পটি প্রথমে সংস্কৃত থেকে পাহ্লবীতে এবং সেখান থেকে আরবীতে অনূদিত হয় এবং মুসলমান ও খ্রীষ্টান সাহিত্যজগতে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। আরবী ভাষার গল্পটি উক্ত ভাষার সবচেয়ে পুরাতন গদ্যকর্মের একটি। এই গল্পগ্রন্থটির উদ্দেশ্য ছিল জীবজন্তুর কাহিনীর মাধ্যমে রাজপুত্রদের শাসনকার্য বিষয়ক আইন-কানুন শিক্ষা দেওয়া। এইগুলি পরে পারস্যের মাধ্যমে পুনরায় ভারতে প্রচলিত হয় (দেখুন : *The Encyclopaedia of Islam*, Vol. IV (New edn.; Leiden, 1978), pp 303-386, এবং R. A. Nicholson, *A Literary History of the Arabs* (Cambridge, 1866), p 346)। এই গ্রন্থটি গোলাম সামদানী কোরায়শী কর্তৃক বাংলায় অনূদিত হয়েছে ও বাংলা একাডেমী কর্তৃক ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

২৭. Shekeristan : এই নামে জোনসের কোন গ্রন্থ বা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নেই। কানানের (Garland Cannon, *Sir William Jones, Orientalist : a bibliography* (Honolulu, 1952) অথবা *Sir William Jones, A Bibliography of Primary and Secondary Sources* (Amsterdam, 1979) গ্রন্থদ্বয়ে এটির কোন উল্লেখ নেই। হবিবুল্লাহ-কৃত *Shigurf Namah-i-Belayet*-এর অনুবাদ থেকে জানা যায় ইতেশামুদ্দীন *Farhang-i-Jahangiri*র *'Doazdah Ain'* শিরোনামের অধ্যায়টি ক্যাপ্টেন সুইন্টনের জন্য অনুবাদ করে দেন যাতে তিনি এটি ইংরেজীতে অনুবাদ করতে পারেন। জোনস লন্ডনে এটি দেখেন এবং ক্যাপ্টেন সুইন্টনের অনুমতি নিয়ে এটি সংকলিত করেন। তিনি এটির উপর ভিত্তি করে 'শেকেরিস্তাঁ' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং এটি বিক্রি করে প্রচুর অর্থোপার্জন করেন। ইংরাজরা এখনও শেকেরিস্তাঁ পাঠ করে (দেখুন Habibullah, *op. cit.*, p 69)। জোনস-বিষয়ক কোন পণ্ডিতও (দেখুন ৬ সংখ্যক টীকা) জোনসের এরূপ কোন গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেন নি। ইতেশামুদ্দীন সম্ভবতঃ অন্য কোন গ্রন্থকারকে জোনসের সাথে গুলিয়ে ফেলেছেন।

২৮. Cotton, Sir Evan, *Op. cit.*, pp 34-35.

www.pathagar.com

ইউরোপে একজন মুনশী নিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। সুইন্টন সংগে নেওয়ার জন্য একজন মুনশীকে ঠিক করেন। কটনের মতে, সুইন্টন ১৭৬৬ সালের জানুয়ারীর মাঝামাঝির পূর্বে ভারত ত্যাগ করেন নি, কারণ জানুয়ারীর ১৯ তারিখে তিনি কর্নাকের অনুরোধে একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ করেন। তিনি শুধু মুনশীটিকেই সংগে নেন নি, অন্য অনেক জিনিসই নেন, যেগুলোর মধ্যে ছিল ফারসী ভাষায় রচিত পুস্তক। লন্ডনে তিনমাস অতিবাহিত করার পর সুইন্টন অক্সফোর্ডে যান এবং সেখানে তিনি ও মুনশী দুজনে মিলে স্যার উইলিয়াম জোনসকে (যিনি সবেমাত্র ইউনিভার্সিটি কলেজে একজন ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন)[২৯] ভারতীয় এবং ফারসী ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপির ব্যাপারে সাহায্য করেন।

অক্সফোর্ড ভ্রমণ এবং সেখানে জোনসের সংগে সাক্ষাতের ব্যাপারে মীর্জা ইতেশামুদ্দীন তাঁর ভ্রমণকাহিনী *Shigurf Namah-i-Belayet*[৩০]-এ লিখেছেন :

"কলেজগুলির (অক্সফোর্ডের) একটিতে ডঃ হান্ট[৩১] নামে একজন অধ্যাপক ছিলেন, যিনি আমাকে ফারসী ভাষায় রচিত অনেক গ্রন্থ দেখান। আমি *'Kuleelah and Dumnah'*এর একটি অনুবাদ দেখলাম, এবং আমি ক্যাপ্টেন এস-এর (সুইন্টন) জন্য 'Furhung Jehangeree'র এপিলগটির অনুলিপি করি। এখানে অবস্থানকালে আমি জনাব জোনসের সংগে সাক্ষাৎ করি। এই ভদ্রলোক এখন কলিকাতার কোর্টে চাকুরিরত। ক্যাপ্টেন এস এবং জনাব জোনস আমাকে সংগে করে বিভিন্ন লাইব্রেরীতে নিয়ে যান। এসব লাইব্রেরীতে ফারসী এবং আরবী ভাষায় লিখিত অনেক গ্রন্থ আমি দেখতে পাই। এগুলির মধ্যে ছিল ফারসী এবং তুর্কী ভাষায় লিখিত তিনটি চিঠি। এগুলি জনৈক 'Mulekool Joosea' ইংল্যান্ডের রাজার নিকট পাঠিয়েছেন। সে সময়ে ইংল্যান্ডে (স্বচ্ছন্দে)

---

২৯. ১৭৬৬ সালের ৭ই আগস্ট জোনস অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিভার্সিটি কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন।

৩০. Itesamodeen, Mirza, *Shigurf Namah-i-Belayet, or Excellent Intelligence Concerning Europe, being the travels of Mirza Itesa Modeen, in Great Britain and France, translated from the original Persian Manuscript into Hindostanee, with an English version and notes*, James Edward Alexander, Esq., with a portrait of the Mirza, London : Printed for Parbury, Allen and Co., Leadenhall Street, MDCCCXXVII (1827), pp 64-65। ১৯৮১ সালের জুন মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির ভূতপূর্ব অধ্যাপক মরহুম ডঃ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ মীর্জা শেখ ইতেশামুদ্দীনের *Shigurf Namah-i-Belayet*এর 'বিলায়েতনামা' শিরোনামে একটি বঙ্গানুবাদ (ঢাকা) প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ মিউজিয়মে এবং ভারতের পাটনায় অবস্থিত বাঁকিপুর খোদাবখ্শ লাইব্রেরিতে রক্ষিত মূল ফারসী পাণ্ডুলিপি থেকে এই অনুবাদটি করেছেন বলে তিনি জানিয়েছেন। তাঁর মতে আলেকজান্ডারের অনুবাদ 'arbitrary' এবং ত্রুটিপূর্ণ।

৩১. Dr Thomas Hunt (১৬৯৬-১৭৭৪)। তাঁর জীবনের প্রথম পর্যায় কাটে প্রধানতঃ ওল্ড টেস্টামেন্টের পঠন-পাঠনে। ১৭০৮ সালে তাঁকে অক্সফোর্ডে আরবীর লডিয়ান (Laudian) অধ্যাপক পদে নিয়োগ করা হয়। প্রাচ্য-বিষয়ে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। ১৭৬২ সালে Duperron তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে কটূক্তি করে মন্তব্য করেন। কিন্তু ১৭৭১ সালে জোনস বেশ জোরের সংগে তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসেন এবং বলেন যে তিনি হান্টকে চেনেন এবং হান্টকে সম্মান দেখানো উচিত (*D. N. B.*, Vol. 10, p 279)।

www.pathagar.com

ফারসী ভাষা পড়ার মত কেউ ছিল না। সেজন্য এ তিনটি চিঠির সঠিক উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য কারও বোধগম্য হয়নি এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিল সন্দেহের আভাস। তাঁরা আমাকে এ চিঠিগুলি দেখান এবং আমি সেগুলি স্বচ্ছন্দে পাঠ করে দিই। আমাকে পরীক্ষা করার জন্য এবং আমার সামর্থ্য যাচাই করার জন্য তাঁরা একইভাবে আমার হাতে বিভিন্ন পুস্তক তুলে দেন এবং সামর্থ্য-অনুযায়ী আমি সেগুলির ভাব এবং তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দিই।"

উপরি-উক্ত তথ্যের আলোকে একথা বলা যায় যে মীর্জা শেখ ইতেশামুদ্দীনই জোনসের পত্রে উল্লিখিত ভারতীয় এবং তিনি ফারসী ভাষার একজন স্বীকৃত পণ্ডিত ছিলেন। কাজেই ফারসী ভাষা পঠন-পাঠনে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা যে তাঁর এবং সুইন্টনের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবেন, তা বিচিত্র কিছু নয়। সুইন্টন নিজেও ছিলেন ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত।[৩২] তাইফুরের নিবন্ধ থেকে এটা ধারণা করা যায় যে সুইন্টন তৎকালীন সুধীমহলে পরিচিত ছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই ইতেশামুদ্দীন ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন এবং তাঁদের মধ্যে পণ্ডিতসুলভ সম্পর্কও গড়ে ওঠে। স্যার ইভান কটনও জোনসের সঙ্গে সুইন্টন ও ইতেশামুদ্দীনের পণ্ডিতসুলভ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে ইতেশামুদ্দীনও জোনসের কথা উল্লেখ করেছেন। কাজেই ইতেশামুদ্দীনের সঙ্গে জোনসের সম্পর্কের কথা মোটামুটিভাবে সন্দেহাতীত বলে ধরা যায়। জোনস ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ পণ্ডিত। আরবী শেখার পর তিনি পূর্ণোদ্যমে এবং উৎসাহের সঙ্গে ফারসী শিখছিলেন। উদ্ধৃত অপ্রীতিকর চিঠিতে তির্যকভাবে ইঙ্গিত দেওয়া ছাড়া যদিও অন্য কোন রচনায় জোনস ইতেশামুদ্দীনের স্পষ্ট কোন উল্লেখ করেন নি, ফারসী ভাষার প্রতি তাঁর অপরিমিত উৎসাহের পরিপ্রেক্ষিতে এটা ধারণা করা অমূলক হবে না যে, অক্সফোর্ডে এই ভারতীয়ের আগমনকে ফারসীতে তাঁর জ্ঞান-উন্নয়নের জন্য একটি বিরাট সুযোগ হিসেবে তিনি নিয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আরবী ভাষা শেখায় সহায়তার জন্য লন্ডন থেকে নিজ খরচে তিনি একজন আরবী ভাষাভাষী লোককে এনে অক্সফোর্ডে রেখেছিলেন। এতে প্রাচ্যভাষা শেখার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। ইতেশামুদ্দীনও ছিলেন ফারসী ভাষাভাষী একজন পণ্ডিত। তাঁর প্রতি যে জোনসের আস্থা ছিল ছিল তা বোঝা যায় এ ঘটনা থেকে যে তিনি তাঁর ফারসী ভাষায় ব্যাকরণটিকে যতদূরসম্ভব বিশুদ্ধ করার মানসে তাঁকে এটির পাণ্ডুলিপি পরিমার্জনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এই ভারতীয়ের পণ্ডিতসুলভ গুণাবলীর, বিশেষ করে, ফারসী ভাষা-সম্পর্কিত জ্ঞানের ব্যাপারে, নিশ্চয়ই তিনি নিঃসন্দেহ হতে পেরেছিলেন। জোনসের চিঠি থেকে এটা স্পষ্ট যে, এই ভারতীয় ফারসী ভাষায় যতটা দক্ষ ছিলেন ততটা সৎ এবং নির্ভরযোগ্য ছিলেন না।[৩৩] চিঠিটির আলোকে তাঁর যে ছবি পাওয়া যায়, তা ন্যক্কার-

---

৩২. ২২ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৩. এতে তাইফুরের মন্তব্যের বিপরীতটাই প্রমাণিত হয়। তাইফুরের মতে ইতেশামুদ্দীন ছিলেন "একজন কঠোরভাবে ধর্মপ্রাণ ও নীতিবান লোক" (দেখুন Taifoor, 123-124)। লন্ডনে তাঁর জীবন-যাপনের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তাতেও মনে হবে যে, ইতেশামুদ্দীন একজন সৎ ও ঋজু প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু জোনসের অভিযোগ থেকে তাঁর সম্পর্কে একটি ভিন্ন ধারণার সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

জনক এবং ক্রোধ-উদ্রেককারী, পাণ্ডিত্যের এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিষয়ক চর্চার প্রতি অপমান-জনক। জোনস যখন জানতে পারলেন যে এই পণ্ডিত ব্যক্তিটি বিশ্বাসঘাতকের মত তাঁর পূর্বেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশের জন্য জর্জ নিকলকে তাঁর ব্যাকরণের পাণ্ডুলিপিটি নকল করতে সাহায্য করছেন এবং তাতে তাঁকে গ্রন্থকারিত্ব ও খ্যাতি উভয় থেকেই বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করছেন, স্বাভাবিকভাবেই তখন তিনি নিরাশ ও মোহমুক্ত হন। প্রায় সম্পূর্ণ চোরাই কপিটিসহ তাঁর বন্ধু কর্তৃক ব্যাকরণটি উদ্ধার করার পূর্বে ব্যাকরণটির কোন অংশের পরিমার্জনা এই ভারতীয় করেছেন কিনা এ ব্যাপারে জোনস কোথাও কোন আলোকপাত করেন নি।

অথবা এটাও কি হতে পারে যে তিনি এতটা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি যে সাহায্য পেয়েছেন—তার পরিমাণ যাই হোক না কেন—কোথাও তা স্বীকার করেন নি? কিন্তু তাঁর উল্লিখিত "ফারসী ভাষার পাণ্ডুলিপিসমূহের" মধ্যে হয়ত এটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। জোনসকে সুইন্টন এবং মুনশী যে সাহায্যপ্রদান করেছেন, তার ধরন এবং পরিমাণ সম্পর্কে তিনি কোন আলোকপাত করেন নি। যে তথ্য তিনি প্রদান করেছেন তা অপর্যাপ্ত এবং নিশ্চিতভাবে সহায়ক নয়। ফারসী ভাষায় লিখিত কোন পাণ্ডুলিপি-সম্পর্কিত কোন তথ্য তাঁর নিবন্ধে নেই। ব্যাকরণটির ব্যাপারে জোনস যে সাহায্য পান, সে সম্পর্কে জগমোহন মহাজন যে উক্তি করেছেন, তা দ্ব্যর্থহীন। কিন্তু তিনি এ তথ্য কোথা থেকে পেয়েছেন, তা জানান নি। উৎস না জানালেও তাঁর উক্তি এ কথা প্রমাণ করে যে জোনস ইতেশামুদ্দীনের কাছ থেকে ব্যাকরণটির ব্যাপারে সাহায্য পেয়েছেন এ কথা অন্ততঃ কারো কারো জানা ছিল। জোনসের উল্লিখিত চিঠি কোনমতেই এ তথ্যের উৎস হতে পারে না। কারণ: (১) চিঠিটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে, (২) তাছাড়া এটিতে জোনস ভারতীয়ের নামোল্লেখ করেন নি। অথচ জগমোহন মহাজন বলেছেন, সম্ভবত ইংল্যান্ড ভ্রমণকারী প্রথম শিক্ষিত ভারতীয় ইতেশামুদ্দীনের সাহায্য জোনস নিয়েছেন। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, ইতেশামুদ্দীন প্রথম শিক্ষিত ভারতীয় কি-না এ ব্যাপারে মহাজনের সংশয় 'সম্ভবত' (probably) শব্দটি প্রমাণ করলেও তাঁর প্রদত্ত সাহায্য সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ। বিশেষ করে সরাসরি ইতেশামুদ্দীনের নামোল্লেখ তাই প্রমাণ করে। এখন দেখা যায় ইতেশামুদ্দীন তাঁর বিলেতের ভ্রমণ কাহিনী *Shigurf Nama-i-Belayet*-এ এ সম্পর্কে কি বলেন। এই ভ্রমণকাহিনীতে জোনসের ব্যাকরণের কোন উল্লেখ নেই। পরিমার্জনার মাধ্যমে পাণ্ডুলিপি-প্রস্তুতিতে সহায়তা করার ব্যাপারেও তিনি কোন দাবি করেন নি। অবশ্য তাঁর পত্রে জোনস যে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তা সত্য হলে ইতেশামুদ্দীন স্বভাবতঃই ব্যাকরণটির পরিমার্জনা-সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য চেপেই যাবেন। নিজ চরিত্রের একটা লজ্জাজনক দিক তিনি নিজে অনাবৃত করবেন, এটা আশা করা যায় না। কিন্তু তিনি, সুইন্টন এবং জোনস ফারসী সাহিত্যের ব্যাপারে পণ্ডিতজনোচিত আলোচনা করেছেন, এটা সত্য বলে মেনে নেওয়া যায়।

ইতেশামুদ্দীন এবং নিকলের কিভাবে পরিচয় হয়েছিল, আলোচ্য নিবন্ধগুলির কোথাও তা উল্লিখিত হয়নি। ভ্রমণকাহিনীতেও ইতেশামুদ্দীন এ ব্যাপারে কোন আলোকপাত করেন নি। কিন্তু নিকল ও হ্যামিল্টনের প্রস্তাবাবলী (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) থেকে এ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তাঁরা কোর্টের পৃষ্ঠপোষকতায় Meninskiর

www.pathagar.com

*Thesaurus Orientalis*এর একটি সংস্করণ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। তখন প্রাচ্য ভাষা-সম্পর্কিত যে-কোন পুস্তকেরই বেশ চাহিদা ছিল। ভারত থেকে প্রত্যাগত অনেকেই ফারসী ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপি এনেছেন, তা তাঁরা জানতেন। স্পষ্টতই, কে কখন ভারত থেকে আসছেন, তার খবরাখবর তাঁরা রাখতেন। তাঁরা কোর্টকে জানান যে, সে সময়ে ফারসী ভাষায় লেখা অনেক পাণ্ডুলিপি সঙ্গে নিয়ে ভারত থেকে একজন ভদ্রলোক এসেছেন এবং দুজন ভারতীয় তাঁর সঙ্গেই আছেন। তাঁরা এই ভদ্রলোকের নিকট থেকে যথেষ্ট সাহায্য ও পরামর্শ এবং তাঁর বন্ধুত্ব পাওয়ার ব্যাপারে বেশ আশাবাদী। তাঁরা কোর্টকে জানান যে, সে সময়ে অক্সফোর্ডে ফারসী ভাষা-সম্পর্কিত কাজে সাহায্য করার মত অনেক লোক রয়েছেন। তাঁরা কোর্টকে আরও জানান যে জোনস নামক একজন লোকও রয়েছেন, যিনি সম্প্রতি ফারসী থেকে নাদির শাহের ইতিহাস অনুবাদ করে প্রাচ্য-সম্পর্কিত তাঁর জ্ঞানের নমুনা প্রদান করেছেন। ফারসী-ইংরাজী-ফারসী অভিধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা একটি ফারসী ব্যাকরণের কথাও কোর্টকে জানান। কোর্ট অব ডিরেক্টরস ১৭৭০ সালের ৮ই আগস্টের সভায় তাঁদের প্রস্তাবিত অভিধানটির সঙ্গে প্রস্তাবিত ব্যাকরণটির জন্যও চাঁদা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন (এই ব্যাকরণটিই হয়ত জোনসের ব্যাকরণের চোরাই অনুলিপি)। এসব থেকে অনুমান করা যায় যে, (১) ফারসী পাণ্ডুলিপিসহ ভারত থেকে প্রত্যাগত ভদ্রলোক ছিলেন সম্ভবতঃ আর্চিবল্ড সুইন্টন ও তাঁর সঙ্গের দুজন ভারতীয় হলেন মীর্জা শেখ ইতেশামুদ্দীন ও তাঁর সেবক। (২) স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হলেও তাঁরা জোনসের খ্যাতি ও প্রাচ্যবিষয়ক কাজকর্ম সম্পর্কে বেশ অবহিত ছিলেন। (৩) তাঁরা নিজেরা ফারসী ভাষায় ব্যাকরণ প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং এটা খুবই স্বাভাবিক যে ইতেশামুদ্দীনের নিকট থেকে তাঁরা জোনসের ব্যাকরণটির খবর জানতে পেরেছিলেন। (৪) যেহেতু নিজেরা ফারসী ভাষায় দক্ষ ছিলেন না, শ্রম ও খরচ লাঘবের জন্য হয়ত তাঁরা বুঝিয়ে সুঝিয়ে ইতেশামুদ্দীনের নিকট থেকে জোনসের ব্যাকরণটির অনুলিপি করার সুযোগ করে নিয়েছিলেন। (৫) জোনসের পত্র থেকে এটা স্পষ্ট যে নিকল তাঁর বিশেষ পরিচিত ছিলেন। এটা স্বাভাবিক, কারণ নিকল সে সময়কার একজন নামকরা প্রকাশক ছিলেন, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সে সময়কার নামকরা লোকদের, এবং রাজা তৃতীয় জর্জের সঙ্গে সম্পর্কের জন্যও তাঁর বেশ গুরুত্ব ছিল। জোনসের নিকট থেকেও তিনি তাঁর ব্যাকরণটির খবর পেয়ে থাকতে পারেন এবং পরে সুযোগমত ইতেশামুদ্দীনের সঙ্গে অনুলিপির ব্যাপারে ব্যবস্থা করে নেন। (৬) শেষ পর্যন্ত হ্যামিলটন এবং নিকল কোন ব্যাকরণ প্রকাশ করতে পারেন নি। তাতে মনে হয় যে, জোনসের অভিযোগ সত্য। অভিধানটিও তাঁরা প্রকাশ করতে পারেন নি। কোর্ট থেকে অগ্রিম নেওয়া টাকাও তাঁদের ফেরৎ দিতে হয়।[৩৪]

জোনস যে বন্ধুর কথা পত্রে উল্লেখ করেছেন কোথাও তাঁর পরিচয় না দেওয়াতে এবং হস্তগত করা অনুলিপিটি (নিকলের হাতের) সম্পর্কেও অন্যত্র একেবারে নীরব থাকায় বিভ্রাটের সৃষ্টি হয়েছে। অন্ততঃ বন্ধুটির পরিচয় জানলে এবং অনুলিপিটির খোঁজ

৩৪. দ্রষ্টব্য India Office Records: *Court Book B-18*, pp 413, 435, 449, 475.

www.pathagar.com

পেলে ইতেশামুদ্দীন কর্তৃক তাঁর ব্যাকরণটির পরিমার্জনা-সম্পর্কিত প্রশ্নের একটি সিদ্ধান্তে আসা অনেক সহজ হত।

কোর্টের নিকট লেখা জোনসের চিঠিটি ১৭৭০ সালের ২৮শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত কোর্ট অব ডিরেক্টরসের সভায় বিবেচিত হয়। কোর্ট তাঁর প্রস্তাবিত অভিধানটির কোন উল্লেখ না করে শুধু ফারসী ভাষার ব্যাকরণটির ব্যাপারে উৎসাহ দেখান এবং জানান যে প্রকাশিত হবার পর কোর্ট তাঁদের প্রয়োজনানুযায়ী ব্যাকরণটি ক্রয় করবেন। কোর্ট অব ডিরেক্টরসের চিঠিতে উষ্ণতার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। জোনস তখন একজন খ্যাতিমান প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ। ইতিপূর্বে দেখা গেছে যে ডেনমার্কের রাজার জন্য নাদির শাহের ইতিহাস অনুবাদ করে তিনি বেশ খ্যাতি অর্জন করেছেন। কোর্টের উষ্ণতার অভাবের একটা কারণ হয়ত এই হতে পারে যে কোর্ট তখনও জোনসের খ্যাতিকে ততটা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে প্রস্তুত ছিলেন না। অন্তত জোনস নিজের সম্পর্কে যতটুকু উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন, কোর্ট ততটুকু করেন নি।

যশস্বী প্রকাশক হওয়া সত্ত্বেও নিকল যে কেন জোনসের ব্যাকরণটির চোরাই সংস্করণ প্রকাশ করার জন্য উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, তা বলা কঠিন। তবে এ ধারণা করা বোধহয় অমূলক হবে না যে ব্যবসায়ীসুলভ মনোভাবই তাঁকে এ কাজে এগিয়ে যেতে ইন্ধন জুগিয়েছে। তখন প্রাচ্যের ব্যাপারে প্রায় সব শিক্ষিত লোকের মধ্যেই ব্যাপক আগ্রহ ছিল এবং এ জন্য প্রাচ্য-সম্পর্কিত বইয়ের কাটতিও ছিল বেশ। তখনও ভারতের সরকারী ভাষা ছিল ফারসী। এ জন্য ফারসী ভাষার ব্যাকরণের গুরুত্ব অনুধাবনযোগ্য। অনুসরণের জন্য জোনসের হাতে আর কোন ব্যাকরণ ছিল না। নিজের মত করে তিনি ব্যাকরণটি লিখেছিলেন এবং এটিকে নিখুঁত করার আগ্রহেই পরিমার্জনার জন্য ইতেশামুদ্দীনকে দিয়েছিলেন।

উপরের প্রদত্ত তথ্য অবরোহ পদ্ধতিতে বিচার-বিশ্লেষণ করে মোটামুটিভাবে একথা বলা যায় যে, জোনস তাঁর ফারসী ভাষার ব্যাকরণটি পরিমার্জনার জন্য ইতেশামুদ্দীনকে দিয়েছিলেন এবং তাঁর অভিযোগ-অনুযায়ী ইতেশামুদ্দীন বিশ্বাসভঙ্গ করে অর্পিত দায়িত্বের অবমাননা করে জর্জ নিকলকে একটি চোরাই সংস্করণ বের করার ব্যাপারে সহায়তা করেছিলেন। ইতেশামুদ্দীন এবং নিকলের বিরুদ্ধে অকারণে মিথ্যা অভিযোগ করে কোর্টের নিকট জোনস পত্র লিখবেন, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কোর্টের ধারণা যাই হোক না কেন, জোনসের তৎকালীন খ্যাতি বেশ ব্যাপকই ছিল। কাজেই ইতেশামুদ্দীন ও নিকলের দোহাই দিয়ে কোর্টের মধ্যে নিজের ব্যাকরণের ব্যাপারে তিনি অনুকূল মনোভাব সৃষ্টির প্রয়াস পাবেন, এটা যুক্তি হিসেবে খুবই দুর্বল বলে প্রতিপন্ন হয়।

শেষ পর্যন্ত ১৭৭১ সালে জোনস তাঁর ফারসী ভাষার ব্যাকরণটি প্রকাশ করেন। কোর্ট অব ডিরেক্টরস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবহারের জন্য এটির অনেকগুলি কপি ক্রয় করেন। ডঃ জনসন এটির একটি কপি ওয়ারেন হেস্টিংসকে উপহার হিসেবে পাঠান। ব্যাকরণটি "শতাব্দীর সবচেয়ে বিখ্যাত"[৩৫] ব্যাকরণগুলির একটি হিসেবে পরিগণিত হয়।

৩৫. Cannon, Garland H., "Sir William Jones's Persian Linguistics" (উদ্ধৃতিটি হলো "One of the most famous.....of the Century"), Thomas Seboak (ed.), *Porraits of Linguists* (Bloomiugton, 1967), Vol. I, p 37,

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট 'ক''

হ্যামিলটন ও নিকলের প্রস্তাব

The great demand that has been lately made for Meninkis Thesaurus Orientalis, and the inutility of the book when obtained, to the generality of the purchasers in this Country, first occasioned the present proposers to think of compiling a new and more useful Oriental Dictionary than any yet extant···

The proposers in order to effect this, have been employed for some time past in collecting materials for such a work ; and in searching for people capable to assist in the execution of it—Meninskis Dicty not withstanding all its inconvenience, will undoubtedly afford great assistance in this Undertaking. They have therefore procured a compleat and perfect copy of it···

The proposers are sensible that very great additions may be made to a new Dictionary from the number of Persian Mass/wh (which) have been of late years brought by different Gentlemen from India—All these are in the public libraries at Oxford...

The proposers doubt not likewise of receiving considerable aid and advice from the Friendship of a Gentleman who has lately brought from India a very large and very valuable collection of Persian Mss who brought over (and) kept with him for some time two natives of that country. (বাঁকা হরফ লেখকের)

The proposers think it a very lucky circumstance for this undertaking that they sometime ago in conjunction with others purchased the lease of the Clarendon Press and Oxford Printing Patent as by that means they have access to such materials for executing a work of this Nature as can hardly be equall'd in any part of Europe. They mean, nevertheless, if this undertaking should proceed, to cast an entire new set of Persian types···

Perhaps there never was at Oxford at any one time so many Gentlemen, capable of giving assistance to such a work as at Present...

They have therefore found a very learned and indefatigable Hungarian nam'd J: Uri, who has made Eastern languages his particular Study and who has been for several years past employ'd by the University of Oxford in arranging, collating and examining their Oriental Mss...

www.pathagar.com

There is, besides, a Mr. Jones, who has just now given the World a specimen of his oriental knowledge in his translation of the History of Nadir Shah from the Persian··· (বাঁকা হরফ লেখকের)

But above all the Proposers wish and hope for the Countenance and support of the Directors of the East India Company, without whose protection and Assistance they are sensible the Work cannot proceed. It would indeed be the greatest presumption in the Proposers to attempt pointing out to those Gentlemen, whose judgement is so supiriour to theirs, so competent on the Subject, the Utility of a Persian and English and Persian Dicty and Grammar...And they flatter themselves that their proposal will be esteemed very reasonable as they mean nor wish nothing more than that the Company should subscribe for a certain number of Copies upon the same terms as they will be offered to the Public—They are ready on these conditions, to embark considerable Sum of Money on this hazardous Undertaking...The proposers are indeed sensible, that the success of their work will depend intirely on the Merit of its execution, as the numbers they can expect the India Company to take will go but little way in the expence of so large an undertaking ; And still, without such a Patronage, they dare not attempt it. (British Library Ms Eur 637 box 17 no. 66 [Clive Mss]).

প্রস্তাবটিতে কোন স্বাক্ষর বা তারিখ নেই, তবে তা 'Proposals for prirting a Persian Dictlonary" বলে উল্লিখিত হয়েছে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংস কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ পি. জে. মার্শাল অনুগ্রহ করে ব্রিটিশ লাইব্রেরী থেকে আমার জন্য এই প্রস্তাবের অনুলিপি তৈরি করে দেন। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে, এ প্রস্তাব হ্যামিলটন ও নিকলেরই।

www.pathagar.com

খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন এবং বাংলার রাজনীতি

শওকত আরা হোসেন*

প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যোগদান করে। কিন্তু যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় ঘটে। পরাজয়ের পর যে সন্ধি হয় তাতে মিত্রশক্তি তুরস্কের রাজ্যসীমা ও শক্তি অনেক পরিমাণে হ্রাস করে। যুদ্ধ চলাকালে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় মুসলমানদের সমর্থনলাভের উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তুরস্কের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে, এমন কোন কাজ মিত্রশক্তি করবে না। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে ভারতীয় মুসলমানগণ তুর্কী সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ও খিলাফতের পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে খিলাফত আন্দোলন পরিচালনা করেন।

মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য গান্ধী খিলাফত আন্দোলন সমর্থন করেন এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। এ অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন বা অসহযোগ আন্দোলন খিলাফত ছাড়া আরো অনেক কারণের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাউলাট আইন, পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে ভারতীয়দেরকে শোচনীয়ভাবে হত্যা, ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোতে ভারতবাসীদের ওপর নির্যাতন, সর্বোপরি নতুন সংস্কার বিধির অপ্রতুলতা এবং অধিকতর স্বায়ত্তশাসন লাভের উদ্দেশ্যেই গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন।[১]

খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনই সর্বপ্রথম যে-আন্দোলনে সকল স্তরের ভারতীয় তথা বাঙালী জনতা স্বতস্ফূর্তভাবে যোগদান করে এবং বেশ কিছুদিনের জন্য হিন্দু এবং মুসলমান এ দুই সম্প্রদায়কে একত্র করে। খিলাফত আন্দোলন সকল স্তরের মুসলমানদের ব্যাপক হারে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আনয়ন করে এবং রাজনৈতিক চেতনা সম্প্রসারণ করে স্বাধিকার অর্জনের জন্য তৎকালীন শাসকদের বিরুদ্ধাচরণ করতে শিক্ষা দেয়। এ প্রবন্ধে খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে :

(ক) খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে সর্বস্তরের জনসাধারণের যোগদানের কারণ,
(খ) বাংলায় এই আন্দোলনের প্রধান প্রধান ঘটনার বিশ্লেষণ.
(গ) খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা,
(ঘ) বাংলার রাজনীতিতে এ আন্দোলনের গুরুত্ব।

খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে সর্বস্তরের জনসাধারণের যোগদানের কারণ

প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে ভারতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়।

---

*শওকত আরা হোসেন, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১. অসহযোগ আন্দোলনের জন্য দেখুন B.M. Taunk, *Non Co-operation Movement in Indian Politics (1919-1924). A Historical Study* (Delhi. 1978)।

www.pathagar.com

মহাযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ভারতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সরকার জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দেন এবং বাইরে থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করেন।[২] কিন্তু এতে করে অবস্থার বিশেষ একটা পরিবর্তন হয় নি। অধিকন্তু, যুদ্ধের শেষে বাংলার পাটচাষীরা খুবই শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়। পাটের সরবরাহ বেশি, কিন্তু বাজারে পাটের দাম কমে যাওয়াতে, পাট-চাষীরা ভীষণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন।[৩] বাংলার গ্রামবাসীদের দুর্দশা চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। স্বাস্থ্য পরিচালকের দফতর থেকে প্রকাশিত তথ্যে বলা হয়েছিল, তারা যে খাবার খেত, সে একই খাবারে একটি ইঁদুর পাঁচ সপ্তাহের বেশি বাঁচে না।[৪]

কলকারখানার শ্রমিকদের অবস্থাও খুব একটা ভাল ছিল না। যুদ্ধের সময়ে ভারতের কলকারখানা, বিশেষ করে, বাংলার পাটশিল্প এবং আহ্‌মেদাবাদের বস্ত্রশিল্পের কারখানা-গুলো প্রচুর পরিমাণে লাভ করে। কিন্তু শ্রমিকদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি। কাজেই আমরা দেখতে পাই শ্রমিক ও কৃষক উভয়েরই আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়।

এ সকল কারণে শ্রমিকদের মধ্যে আত্মসচেতনতার সৃষ্টি হয়। ফলে দেখা যায়, যুদ্ধের পরের বছরগুলোতেই শ্রমিক-অসন্তোষ তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়।[৫] কৃষক এবং কলকারখানার শ্রমিকেরা কিভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে এ অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে তা নির্ণয় করতে পারছিল না। ঠিক ঐ মুহূর্তেই মুসলমান নেতারা খিলাফত আন্দোলন শুরু করেন এবং বিশেষ করে বাংলার মুসলমান কৃষকেরা খিলাফত আন্দোলনের মধ্যে নিজেদের মুক্তির পথ খুঁজে পায়।

এ সময়ে কংগ্রেস-নেতৃত্বের পুরোধা ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি শুধু শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে জাতীয় আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখতে চাইলেন না। তিনি স্পষ্টই বুঝলেন, এ সংগ্রাম শ্রমিকদের জন্যও।[৬] শ্রমিকরাও গান্ধীর প্রতিশ্রুতিমত এক বছরের মধ্যে স্বরাজলাভ করে ভাগ্য-পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ভারতের জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করে।

স্বরাজ আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে সফল করার জন্য গান্ধী মুসলমানদের সহ-যোগিতা লাভ করতে চাইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মুসলমান-পরিচালিত খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করেন, যদিও খিলাফত আন্দোলন ভারতের কোন স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপার ছিল না। কিন্তু নেতৃস্থানীয় হিন্দু এবং হিন্দু সাধারণেরা খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিতে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। 'মডার্ন রিভিউ'র সম্পাদক ব্যঙ্গ করে তাঁর পত্রিকায় লিখেছিলেন, "মাওলানা মোহম্মদ আলী ও মহাত্মা গান্ধী—এ দুজনের বক্তৃতা বিশ্লেষণ করলে এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, তাঁদের একজনের নিকট সুদূর তুরস্কের খিলাফতের দুরবস্থার কথাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়, কিন্তু অন্যজনের নিকট ভারতের

---

২. *Report on the Administration of Bengal*, 1920-21 p vi

৩. ঐ।

৪. Satyabrata Rai Chowdhuri, *Leftist Movements in India: 1917-1947* (Calcutta, 1976), p 18.

৫. R. Palme Dutta, *Moddern India* (London, 1927), p 16.

৬. ঐ।

www.pathagar.com

স্বরাজ লাভই প্রধান লক্ষ্য।"[৭] হিন্দু নেতাগণ ভেবেছিলেন, মুসলমানদের বাদ দিয়েও তাঁরা স্বরাজ আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু গান্ধী ছিলেন দূরদর্শী নেতা, কাজেই তিনি বুঝেছিলেন, ভারতের দুটো প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি স্বরাজ আন্দোলনকে সার্থক করতে পারবে না।[৮] কাজেই গান্ধী খিলাফত আন্দোলন সমর্থন করলেন এবং একই সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

আন্দোলনের প্রধান প্রধান ঘটনা বিশ্লেষণ

খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনকে সফল করার জন্য নেতৃবৃন্দ কিছু কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেন। সরকার-প্রদত্ত উপাধি-বর্জন; সরকারী অথবা সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল-কলেজ-বর্জন এবং জাতীয় স্কুল-কলেজ-প্রতিষ্ঠা; সরকারী আদালত-বর্জন এবং সে জায়গায় বেসরকারী সালিশী আদালতের প্রতিষ্ঠা; দেশের আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য বিদেশী দ্রব্য-বর্জন এবং স্বদেশী দ্রব্য-উৎপাদন; আইনসভা-বর্জন।[৯] দিল্লীতে জামিয়াত-উল-উলেমা, মুত্তাফিকা ফাতওয়া দ্বারা মুসলমানদের এ পর্যায়ে কি করণীয় এবং কি করণীয় নয়, তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেন। এ ফাতওয়া দ্বারা মুসলমান নেতাগণ ঘোষণা করেন, আইনসভা, আদালত, স্কুল-কলেজ, সরকারী খেতাব, সরকারী চাকুরি—সবই বর্জন করা একজন মুসলমানের পক্ষে হালাল, অন্যথায় এগুলো সবকিছুই তার জন্য হারাম।[১০] অবশ্য এর আগেই মুসলিম লীগ ঘোষণা করেছিল, "যে সকল মুসলমান অসহযোগ কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করবেন না, অন্যান্য মুসলমান তাদেরকে সামাজিকভাবে বর্জন করবেন।"[১১]

খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সহযোগিতা-বর্জনের আন্দোলন ব্যাপকভাবে শুরু হয়। প্রথমে বঙ্গবাসী কলেজের

---

৭. বিমলানন্দ শাসমল, 'ভারত কি করে ভাগ হলো' (কলকাতা, ১৯৮১), পৃ. ২৯।

৮. ঐ, পৃ. ২৮।

৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাঙলা দেশের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড (১৯০৫-১৯৪৭), (কলিকাতা, ১৯২৫), পৃ. ১৮৮, ২০৪; Taunk, p 45 ; 'ঢাকা প্রকাশ', ২ জানুয়ারী ১৯২১।

১০. Shan Muhammad (ed.), *The Indian Muslims, A Documentary Record* (Meerut, 1983), p 97-98. ফাতওয়ার কিছু অংশ এখানে দেওয়া হলো :

The Fatwa :

In the name of God the most compassionate and merciful. What do the learned in Theology (Ulemaidin) and the lawgivers of the great shariat say about the following religious propositions :

1. What is meant by "Mavalat" (co-operation ?) and according to the religion what kind of "Mavalat" is haram (forbidden) with the enemies of Muslim religion, and what kind of "tark-i-Mavalat" (non-cooperation) is obligatory ? What is the religious decision about a man who continues to co-operate after knowing the religious commandment on the subject ? ; please auswer and you will be rewarded...

১১. Taunk, p 47.

www.pathagar.com

ছাত্ররা কলেজ পরিত্যাগ করা শুরু করে। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় রিপন কলেজ ও সিটি কলেজের ছাত্ররা।[১২] ঢাকাতেও স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষাঙ্গন-বর্জন-নীতি শুরু হয়। ১৬ জানুয়ারী বিকালবেলা ছাত্রদের এক মিছিলে ঠিক করা হয় যে তারা শিক্ষাঙ্গন ত্যাগ করবে। পরের দিন ছাত্ররা জগন্নাথ কলেজকে জাতীয় কলেজে পরিণত করার দাবী করলে কলেজের অধ্যক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ ছুটির নোটিশ দেন।[১৩] আন্দোলনের প্রথম পর্যায়েই বাংলায় প্রায় আট হাজার ছাত্র স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে।[১৪] আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে ৫০,০০০ শিক্ষার্থী স্কুল-কলেজ বর্জন করে। এদের মধ্যে কলেজের ছাত্র সংখ্যা ২০০০। কলেজের আট জন ও স্কুলের ৯৮ জন শিক্ষক চাকরি ছাড়েন। অন্যদিকে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীনে প্রায় ১৫০টি স্কুল স্থাপন করা হয় এবং অনেক ছাত্র জাতীয় স্কুলে ভর্তি হয়।

কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষার্থীগণের স্কুল-কলেজ-বর্জন সমর্থন করেন নি। শিক্ষাঙ্গন-বর্জনের প্রতিবাদে কলকাতায় এবং ঢাকায় প্রতিবাদ-সভা হয়। ঢাকার নবাব এই শেষোক্ত সভা আহ্বান করেন। সভাশেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি পাশ করা হয়: "সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার্থে প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই অধিবেশনে সমবেত হইয়া এই নির্দ্ধারণ করিতেছেন যে, ইংল্যান্ড ও তাহার মিত্রশক্তিবর্গ খিলাফত প্রশ্নের মীমাংসা দ্বারা মুসলমান ধর্মের যে অবমাননা করিয়াছেন, তাহার প্রতিবিধানের জন্য যে কোন বৈধ উপায় অবলম্বিত হইবে তাহা এই সম্মেলন সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিলেও, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে বিদ্যার্থী বালকবর্গকে বহিষ্করণের জন্য যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন।"

সভায় এ. কে. ফজলুল হক বলেন, "এই আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে কয়েকজন আমাকে সরলভাবে বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য বিদ্যালয় ত্যাগ দ্বারা দেশে অরাজকতার সৃষ্টি করিয়া ভারতে ঘোরতর বিপ্লবের পথ সুগম করিয়া তোলা। যাঁহারা এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্ম করিতেছেন তাঁহাদিগকে আমরা সমর্থন করিতে পারি না।"[১৫]

এই প্রস্তাব বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, বাংলার মুসলমানগণ পবিত্র খিলাফতের সম্মানের জন্যে সংগ্রাম করলেও নিজেদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে বিসর্জন দিতে রাজি হন নি। প্রকৃতপক্ষে সুদূর তুরস্কের খিলাফতের সমস্যা এ আন্দোলনে যতটুকু না প্রতিফলিত হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি প্রতীয়মান ছিল সাধারণ ঘুমন্ত মুসলমানদের এক নতুন জীবনে প্রবেশের সংগ্রাম।

অন্যান্য ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে বাংলায় প্রায় ৩৫০ জন উকিল তাঁদের ব্যবসায় পরিত্যাগ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ২০০

---

১২. 'ঢাকা প্রকাশ', ২৩ জানুয়ারী ১৯২১।

১৩. ঐ, ২৩ জানুয়ারী ১৯২১।

১৪. ঐ, ৩০ জানুয়ারী ১৯২১।

১৫. ঐ, ১১ ডিসেম্বর ১৯২০।

www.pathagar.com

জন মাত্র তিন মাসের জন্য ওকালতি ছেড়েছিলেন। অবশিষ্ট ১৫০ জনের মধ্যে ১০০ জন কংগ্রেসকর্মী ছিলেন।[১৬] চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরু ওকালতি করে অনেক উপার্জন করতেন, কিন্তু তাঁরা এই আন্দোলনের জন্য আইনব্যবসা পরিত্যাগ করেন। তবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, সমগ্র বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত-বর্জন আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল। ইংরেজ আদালতের কাজকর্ম আগের মতই চলেছিল। বাঙালী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সালিশী আদালত প্রথম প্রথম কয়েক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু কিছু দিন পরেই ওগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়।[১৭]

১৯২১এর প্রথম ভাগ থেকেই মদের দোকানে পিকেটিং আরম্ভ হয়। এই অনাবশ্যক দ্রব্যটি এই দেশে প্রচলন করে বিদেশী শাসক অনেক টাকা তাঁদের দেশে নিয়ে যেতেন। কাজেই মাদকদ্রব্য-বর্জনের জন্য বাংলার রাজধানীসহ অন্যান্য এলাকায়ও মদ-গাঁজা-আফিম ইত্যাদি দোকানের সামনে পিকেটিং শুরু হয়। পিকেটিং করায় মদ বিক্রয় কমে গেলেও পিকেটিং বন্ধ হলেই আবার আগের মতই বিক্রয় চলে।[১৮] বিলেতী বস্ত্রের দোকানেও পিকেটিং শুরু হয়। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী খদ্দর-বিক্রয় শুরু করে। বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস এ সময়ে দেশে প্রায় এক লক্ষেরও বেশী চরখা বিতরণ করেন।[১৯] কিন্তু চাহিদার তুলনায় খদ্দরের উৎপাদন পর্যাপ্ত ছিল না।

কেবল একটি বিষয়ে বর্জন-নীতি অনেকটা সফল হয়েছিল। ১৭ নভেম্বর ১৯২১এ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যুবরাজ শুভেচ্ছা-ভ্রমণে ভারতের বোম্বাইয়ে পদার্পণ করলে ভারতের সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। খিলাফত কমিটি ও কংগ্রেসের উদ্যোগে কলকাতায় পূর্ণ হরতাল অনুষ্ঠিত হয়। হরতালের সাফল্য এবং জনসাধারণের উপর খিলাফত কমিটি ও কংগ্রেসের প্রভাব দেখে সরকার স্বেচ্ছাসেবক সংঘগুলোকে বেআইনী বলে ঘোষণা করেন এবং শত শত স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেফতার করেন। শুধু বাংলাতেই প্রায় ৭৯৮৭ জন অসহযোগী জেল খেটেছিলেন।[২০]

আসামের চা-বাগানের কুলিদের ধর্মঘট অসহযোগ আন্দোলনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চা-বাগানের কুলিদের মজুরি ছিল খুবই কম, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করতো তারা। চা-বাগানের মালিকেরা অমানবিক ব্যবহার করতো তাদের সঙ্গে। অসহযোগ-কর্মীরা তাদেরকে বোঝাতে সমর্থ হলো যে, এইসকল বিদেশী মালিকের অধীনে চাকরি করা উচিত নয়। চা-বাগানের কুলিরা নিজেদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজীকে ভগবানের অবতার মনে করে এবং তারা ভাবে যে তাঁর দ্বারাই তাদের সকল দুঃখ দুর্দশা দূরীভূত হবে।[২১] কাজেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রায় বার হাজার কুলি ধর্মঘট করে নিজেদের বাসভূমিতে যাবার উদ্দেশ্যে চাঁদপুরে উপস্থিত হয়।

---

১৬. ঐ, ২৬ নভেম্বর ১৯২২।

১৭. মজুমদার, পৃ. ২০৬।

১৮. মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ্, 'যুগ বিচিত্রা' (ঢাকা, ১৯৬৭), পৃ. ১৪৩।

১৯. ঐ, পৃ. ১৪২।

২০. 'ঢাকা প্রকাশ', ২৬ নভেম্বর ১৯২২।

২১. Taunk, p 100.

www.pathagar.com

প্রাথমিক পর্যায়ে চাঁদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সিন্‌হা প্রায় ২০০০ টাকা খরচ করেন কুলিদের গন্তব্যস্থলে যাবার জন্য। কিন্তু পরে চা-বাগান কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা কুলিদেরকে আবার চা-বাগানে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। এতে করে কুলিদের মধ্যে একটা ভয়-ভীতির সৃষ্টি হয়। তারা তাড়াহুড়ো করে বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু কুলিরা যাতে দেশে ফিরে যেতে না পারে সেজন্য ওখানকার এস. ডি. ও.র আদেশে ঘাট থেকে দূরে স্টীমার রাখা হয়। ফলে কিছু সংখ্যক কুলী স্টীমার ঘাটে নদীতে পড়ে যায়। অন্যদিকে কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ২০ মের রাতে ঢাকা থেকে ৫০ জন গুর্খা সৈন্য স্টেশন থেকে কুলিদের তাড়িয়ে দেবার জন্য চাঁদপুরে আগমন করে। তারা গভীর রাতে কুলিদের উপর অত্যাচার চালায়।[২২] গুর্খাদের এই অত্যাচারে বাংলার সর্বত্র হরতাল পালন করা হয়। একই কারণে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে এবং স্টীমার কোম্পানির কর্মচারীগণ ধর্মঘট করে। অসহযোগ কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত এই ধর্মঘটের ফলে স্টীমার এবং রেলওয়ের যাতায়াত কয়েকমাস পর্যন্ত বন্ধ ছিল।[২৩]

বঙ্গীয় আইনসভা এবং খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন

১৯১৯ সালের আইনের অধীনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সর্বপ্রথম নির্বাচন হয় ১৯২০এ। শুধু মধ্যপন্থীরা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। চরমপন্থী এবং কংগ্রেস-পন্থীরা নির্বাচন বর্জন করেন। নির্বাচন-বর্জনের প্রথম পর্যায়ে চিত্তরঞ্জন দাশ এবং আসন্ন নির্বাচনে আরও ২৪ জন কংগ্রেস-প্রার্থী এক যুক্ত ইশ্‌তেহারে ঘোষণা করেন যে কংগ্রেসের প্রস্তাবানুযায়ী তাঁরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না।[২৪] অন্যদিকে নির্বাচনকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য অসহযোগীরা বিভিন্ন জেলা থেকে অযোগ্য প্রার্থীকে দাঁড় করান। ফলে তৎকালীন সমাজের মাপকাঠিতে ছয়জন অযোগ্য প্রার্থী বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। এর মধ্যে নোয়াখালী থেকে মোকাররম মুন্সী, এক গরুর গাড়ি-চালক, এবং রসিকচন্দ্র কর্মকার, এক মুচি, বিপুল ভোটে তাদের প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে নির্বাচনে জয়ী হন।

প্রকৃতপক্ষে খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছিল; তবে তা কংগ্রেস-নেতাদের আশানুরূপ ব্যাপকতা লাভ করেনি। এর প্রমাণ এই যে, ১১৩টি আসনের জন্য প্রতিযোগিতা করেছিলেন ৩২২ জন।[২৫] সকল রাজা, মহারাজা, নওয়াব এবং জমিদার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হতে উদগ্রীব ছিলেন। অন্যদিকে ভোটাধিকারপ্রাপ্ত জনসাধারণের মধ্যে তুলনামূলকভাবে মুসলমানরাই অধিকসংখ্যক ভোটদানে বিরত ছিলেন।[২৬]

---

২২. 'ঢাকা প্রকাশ', ২২ মে ১৯২১।

২৩. P.N. Chopra, *India's Major Non-Violent Movements 1919-1934* (Delhi, 1979), p 78.

২৪. *Report on the Working of the Reformed Constitution in Bengal, 1921-27* (Calcutta, 1929) [এরপর *RWRCB*], p 98.

২৫. ঐ।

২৬. *Report on the Administration of Bengal, 1922-23* (Calcutta, published annually) p xx.

www.pathagar.com

১৯২১এর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ মূলত ছিলেন মধ্যপন্থী। অসহযোগ আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন না এঁরা। কাজেই যে-সমস্ত প্রশ্ন মন্ত্রী অথবা গভর্নরের নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের করা হতো, তার উদ্দেশ্য ছিল অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে তথ্য জানা। প্রশ্নগুলো সাধারণতঃ এরূপ হতো: বাংলায় কতজন অসহযোগ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে? কোন্ কোন্ স্কুল-কলেজ জাতীয় স্কুল-কলেজে পরিণত হয়েছে? অসহযোগ কর্মীদের প্ররোচনায় জনগণ সরকারকে ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করেছে, সরকার এ সম্পর্কে কতটুকু অবহিত? অথবা জমিদারদের স্বার্থরক্ষায় সরকার কতটুকু সচেতন ইত্যাদি।[২৭]

তবে চাঁদপুরে খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন-সম্পর্কিত গুর্খা সৈন্যদের অত্যাচার, ১৭ নভেম্বর ১৯২১এ হরতালের সময়ে নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর পুলিশবাহিনীর নির্যাতন এবং মেদিনীপুরে জমিদার কর্তৃক সাধারণ প্রজাদের উপর অত্যাচার—এসব বিষয়ে সদস্যগণ অতি জোরালো ভাষায় নিন্দা করে ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব এনেছিলেন।

১৯২১এর ২০ মে চাঁদপুরে আসামের চা-বাগানের কুলিদের উপর যে গুলিবর্ষণ করা হয়, তার প্রতিবাদে ব্যবস্থাপক সভা এক তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য সুপারিশ করে। এই কমিটি ব্যবস্থাপক সভার দুজন সরকারী এবং পাঁচজন বেসরকারী সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হওয়ার কথাও সভা ঘোষণা করে। সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, যিনি প্রস্তাবটি ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপন করেন, তিনি বলেন যে, কুলিদের তাড়ানোর জন্য আদতেই চাঁদপুরে গুর্খা সৈন্য ডাকার কোন প্রয়োজন ছিল না। দ্বিতীয়ত, রাতে কুলিদের না তাড়িয়ে সকালেও তাদেরকে স্টেশন থেকে সরিয়ে নেওয়া যেতে পারতো। অন্য সদস্যরা অত্যন্ত জোরালো ভাষায় মহিলা এবং শিশুদের উপর অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করেন। তাঁরা বলেন, গভীর রাতে সকলে যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, তখন চাঁদপুরের সরকারী কর্মচারীগণ সরকারের সহায়তায় এই আশ্রয়হীন নিঃস্ব লোকদের উপর গুর্খা সৈন্যদের লেলিয়ে দেন।[২৮]

এছাড়াও ইন্দ্রনাথ ভূষণ নামে এক সদস্য ব্যবস্থাপক সভায় চাঁদপুরের ঘটনায় বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য ২২টি প্রশ্ন রাখেন যার একটির জবাবও সরকারী সদস্য প্রদান করেন নি। "প্রশ্নগুলো অত্যধিক বড়", এই অজুহাতে এগুলোর জবাব দেওয়া হয়নি।[২৯]

---

২৭. এ ধরনের প্রশ্নের উদাহরণ:

Babu Surendra Narayan Sinha : "Will the Hon'ble Member-in-charge of the Department of Politics be pleased to state whether the government contemplate holding a conference with the Zamindars and others in order to devise ways and means to deal with or to counteract the cult of civil disobedience?"

The Hon'ble Henry Wheeler : "Government is in constant touch with all interests likely to be affected were a general movement of civil disobedience to be inaugurated, and they do not consider that any formal conference needs to be convened at the moment. The action to be taken by government in the event of such a movement clearly depends on its nature and extent." (*Proceedings of the Bengal Legislative Council* [এরপর *PBLC*], Vol 7, No. 2 (Calcutta, 1922), pp 21-22,

২৮. ঐ, প. ৩৮৫।

২৯. ঐ, ১৯২১, খণ্ড ১, নম্বর ৩, প. ৪০১।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিপ্রদানের সময়ে আবারো খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করা হয়। বেসরকারী সদস্যদের অভিমত হলো, সরকার যত কঠোরভাবে সাধারণ জনতার উপর দমননীতি চালাবেন, ঠিক ততখানি তীব্রভাবেই খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন দেশে চলবে। তাঁদের মতে, কংগ্রেস এবং খিলাফত কমিটির স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন-গুলোকে সরকার কর্তৃক বেআইনী ঘোষণা করা উচিত হয় নি। কারণ কোন উপায়ে এই সংগঠন ব্রিটিশ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে না। ১৭ নভেম্বর ১৯২১এ সরকার আরেকটি মারাত্মক ভুল করেছেন।[৩০] সেদিন খিলাফত ও কংগ্রেসী সমর্থক জনতার উপর সরকারের নির্দেশে পুলিশী অত্যাচার চালানো উচিত হয় নি। দুষ্কৃতিকারীদের দমনের জন্য সরকার নানা ধরনের দমননীতিমূলক আইন আবার প্রয়োগ করেছেন। এর ফলে দেশের সাধারণ জনতা সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনকেই সমর্থন জানাবে।[৩১]

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, সদস্যরা সকলেই দমননীতির জন্য সরকারকে দোষারোপ করেন। সব সদস্য স্বীকার করেন যে, এ ধরনের অত্যাচার দ্বারা সরকার ১৯১৯এর আইনকে সফল করতে পারবেন না। কিন্তু সকল সদস্যই ১৯১৯এর আইনকে এবং এর অধীনে গঠিত আইনসভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন।

বাংলার রাজনীতিতে খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্ব

১৯২১এর ডিসেম্বরের শেষের দিকে আহ্‌মেদাবাদে কংগ্রেস, খিলাফত কমিটি ও মুসলিম লীগের এক যুক্ত অধিবেশনে কংগ্রেস জোরের সঙ্গে আইন-অমান্য-আন্দোলন চালানোর প্রস্তাব গ্রহণ করে।[৩২] এই প্রস্তাব-অনুসারে গান্ধী সুরাটের বারদৌলী গ্রামে আইন-অমান্য-আন্দোলন শুরু করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। প্রস্তুতির প্রথম পর্যায়ে গান্ধী ১৯২২এর ১ জানুয়ারী বড়লাটের নিকট পত্র দেন। পত্রে লিখিত ছিল জনগণের প্রতি সরকারের উৎপীড়নের জন্যই গান্ধী এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন। অসহযোগ আন্দোলনে সরকারী অত্যাচার ও উৎপীড়নের এক সুদীর্ঘ তালিকাসহ গান্ধী আবেদন করলেন, সকল রাজবন্দীর মুক্তি দেওয়া হোক এবং অহিংস কর্মের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা থেকে সরকার বিরত থাকুন। যদি সরকার এগুলো মেনে নেন তাহলে গান্ধী বারদৌলীতে আইন-অমান্য-আন্দোলন বন্ধ করার জন্য আদেশ দেবেন। কিন্তু সরকার এ প্রস্তাব মেনে নিলেন না। কাজেই গান্ধী আইন অমান্য করার আন্দোলন শুরু করেন।[৩৩] কিন্তু হঠাৎ করেই ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯২২এ গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। কারণ চৌরীচৌরা গ্রামে উন্মত্ত জনতা বাইশজন পুলিশকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে। এই সংবাদে মর্মাহত গান্ধী কংগ্রেস কমিটির এক বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলন বাতিল ঘোষণা করেন। অন্যদিকে মুস্তফা কামাল

---

৩০. প্রিন্স অব ওয়েলসের শুভেচ্ছা সফরের দিন সারা দেশব্যাপী হরতাল চলেছিল; তার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে।

৩১. *PBLC*, Vol. 7, No. 1, 1922, pp 544-548.

৩২. Gail Minault, *The Khilafat Movement*, (Delhi, 1982), p 181.

৩৩. মজুমদার, পৃ. ২৪০।

www.pathagar.com

পাশার নেতৃত্বে খিলাফত প্রথার অবসানের সঙ্গে ভারতেও খিলাফত আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়।

এবার আমরা আলোচনা করবো বাংলার রাজনীতিতে খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্ব কতটুকু। খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে নেতাগণ প্রধানত ত্রি-বর্জন নীতি ঘোষণা করেছিলেন—আইনসভা, আদালত ও সরকারী স্কুল-কলেজ। ১৯২১এ ভারতে শিক্ষিতের হার ছিল নিতান্ত অল্প এবং এদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকই আইনসভা, আদালত ও সরকারী স্কুল-কলেজ বর্জন করেছিলেন।[৩৪] কিন্তু সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের বেলায় এ আন্দোলন অপূর্ব সাফল্য লাভ করেছিল। চা-বাগানের কুলিদের অসহযোগ আন্দোলন এবং তাদের সমর্থনে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কর্মচারীদের ধর্মঘট অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করেছিল। এমনকি রাজশাহী জেলের কয়েদীরাও অসহযোগ আন্দোলন করেছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে কল-কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘট বেশি করে লক্ষ্য করা যায়। তবে বাংলা কৃষিভিত্তিক দেশ হওয়াতে কৃষকের বিদ্রোহই বেশী লক্ষণীয়।

কৃষকেরা গণ-আন্দোলন হিসেবে ইউনিয়ন বোর্ড-বিরোধী আন্দোলন ও চৌকিদারী ট্যাক্স না দেওয়ার আন্দোলন গড়ে তোলে। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং গ্রামবাসীদের চৌকিদারী ট্যাক্স দিতে নিষেধ করেন। তাঁর অপূর্ব সংগঠনশক্তির ফলে তখনকার সরকার সমগ্র মেদিনীপুর থেকে ২২৭টি ইউনিয়ন তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।[৩৫] মেদিনীপুরের সঙ্গে সঙ্গে হুগলি এবং বীরভূমের জনসাধারণও ইউনিয়ন ট্যাক্স দিতে রাজি ছিল না। অন্যদিকে রংপুর, রাজশাহী, নোয়াখালী, ত্রিপুরা এবং ময়মনসিংহে চৌকিদারী ট্যাক্স নিয়েও সরকার বিপদে পড়েছিলেন। শুধু সরকারই নয়, গ্রামবাসী ও কৃষকদের সংগঠন দেখে জমিদারেরাও ভয় পেয়ে যান। কাজেই তাঁরা কাউন্সিলে প্রশ্ন তোলেন, জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন। সরকার এর উত্তরে বলেন, সম্ভাব্য সকল প্রকার সতর্কতা নেওয়া হয়েছে।[৩৬]

খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন কৃষকদের মধ্যে যে চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে তা উপলব্ধি করা যায় ব্যবস্থাপক সভায় আনীত সৈয়দ এরফান আলীর একটি প্রস্তাব থেকে।[৩৭] এরফান আলী কৃষকদের প্রতিনিধি হিসেবে মেদিনীপুরের জমিদারদের অমানুষিক অত্যাচারের বিষয়ে সভায় প্রস্তাব আনেন। তিনি বলেন যে, মেদিনীপুরের কৃষকদের মধ্যে জমিদারদের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা উচিত। তিনি দাবী করেন যে, জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজাদের শত শত অভিযোগ রয়েছে এবং শুধু একটি আবেদনপত্রেই প্রজারা জমিদারের বিরুদ্ধে একাত্তর ধরনের অভিযোগ আনয়ন করেছে। অভিযোগটি যখন পরিষদে তোলা হয়েছিল তখন বাংলার

---

৩৪. শাসমল, প, ৩০।

৩৫. ঐ।

৩৬. পাদটীকা ২৭ দ্রষ্টব্য।

৩৭. *PBLC, Vol, 7. No 1, 1922, p 592.*

www.pathagar.com

অর্থনীতি ছিল বিপর্যস্ত, ফসলের অপর্যাপ্ত ফলন কৃষকের ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষকে করেছিল প্রকট। কিন্তু অভিযোগটি বাংলার আইন পরিষদে তোলার আরেকটি কারণ ছিল, সেটা হলো রাজনৈতিক সচেতনতা-আনয়ন। আর কৃষকদের মধ্যে এই রাজনৈতিক সচেতনতা বয়ে এনেছিলো অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলন। জমিদারদের প্রজা-শোষণ এবং জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজার অভিযোগ, এটা ছিল বাংলার একটা শাশ্বত ঘটনা। কিন্তু এর আগে আর কোনদিন এ ধরনের প্রস্তাব পরিষদে আনা হয়নি।

বাংলার রাজনীতিতে খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের সবচেয়ে বড় গুরুত্ব হচ্ছে শ্রেণীভেদ সম্পর্কে সচেতনতা-আনয়ন। এর আগে কোন আন্দোলনই কৃষক-শ্রমিকদের স্বার্থ সম্পর্কে তাদের এত সচেতন করতে পারেনি। কাজেই আমরা দেখি যে, ব্যবস্থাপক সভায় যখন সৈয়দ এরফান আলী মেদিনীপুরের জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজা-উৎপীড়নের অভিযোগ আনেন, তখন সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপক সভা শ্রেণীগতভাবে দুভাগে বিভক্ত হয়। একদিকে থাকেন সাধারণ সভ্যরা এবং অন্যদিকে জমিদারগণ। এমন কি ১৯২৯এ গঠিত প্রজা পার্টির প্রথম সভাপতি স্যার আবদুর রহিম জমিদারদের পক্ষে ছিলেন এবং আমৃত্যু প্রজা-সমর্থক প্রজাদরদী নেতা এ. কে. ফজলুল হকও সেদিন প্রজাদের পক্ষে ভোটদানে বিরত ছিলেন।[৩৮] জমিদারদের মুখপত্র হিসেবে কাশাউনীশচন্দ্র রায় বাহাদুর চৌধুরী ঘোষণা করেন যে, জমিদার এবং প্রজার সম্পর্ক একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাদের সম্পর্কে মাঝে মাঝে যে ফাটল দেখা যায় এটা কোন নতুন ঘটনা নয়। এর জন্য কোন তদন্ত কমিটির প্রয়োজন হয় না। জমিদারদের বিরুদ্ধে এইসব অসংস্কৃতিবান কৃষকদের উত্তেজিত করার জন্য অসহযোগ-কর্মীরাই দায়ী।

ফলস্বরূপ দেখা যাচ্ছে খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেলেও কৃষক-শ্রমিকদের অসন্তোষ শেষ হয়নি। ১৯২২এ পাবনা ও বাখরগঞ্জে কৃষকদের বিদ্রোহ দেখা যায়। পাবনায় এক জমি থেকে ঘাসকাটা নিয়ে এ অসন্তোষ শুরু। আদালত থেকে বলা হয়েছিল যে, এ জমি জমিদারের। কিন্তু কৃষকরা সেটা মেনে নেয়নি। বাখরগঞ্জের ঘটনাও ঘটে জমিদার ও কৃষকদের মধ্যেই। নকশালবাড়ি, রংপুর ও ত্রিপুরায় কৃষকেরা পুলিশদের আক্রমণ করেছিল।[৪০]

অন্যদিকে শ্রমিক-আন্দোলনও তীব্রতর হতে থাকে। ১৯২৬এ বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের ৩৫ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করে।[৪১] ১৯২৮ হলো বাংলায় শ্রমিক-আন্দোলনের বছর। এ বছর রেল-শ্রমিক এবং পাট ও বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকরা ধর্মঘট করে।[৪২] শিল্পপতিদের নিকট থেকে সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্যই এ সকল ধর্মঘট হতো। কিন্তু সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, আগের তুলনায় তারা সাংগঠনিক দিক দিয়ে অনেক

---

৩৮. ঐ, পৃ. ৬২২।

৩৯. ঐ, পৃ. ৬০৫।

৪০. Shive Kumar, *Peasantry and the Indian National Movement 1919-1933* (Meerut, 1979-80), p 88.

৪১. *RAB*, 1927-28, p 19.

৪২. 'ঢাকা প্রকাশ', ১ জুন, ২৪ জুন, ১৯২৮।

www.pathagar.com

উন্নত ছিল এবং নিজেদের দাবী আদায়ের ব্যাপারেও ছিল অনমনীয়। ফলে ১৯২৮এ কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে দশ হাজার শ্রমিক লাল পতাকা হাতে শ্লোগান দেয় যে, ভারতের সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই তাদের কাম্য, তারা ডোমিনিয়নে বিশ্বাসী নয়। কংগ্রেসে উচ্চবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকদের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে এখানে। শ্রমিকেরা বুঝেছিল ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীন না হলে তাদের ভাগ্য-পরিবর্তন হবে না। কংগ্রেসের দাবী-অনুযায়ী ভারত ডোমিনিয়নের মর্যাদা পেলে শ্রমিকদের কোন লাভই হবে না।[৪৩]

অন্যদিকে খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের চরম ব্যর্থতা হলো মুসলমান-হিন্দুর মিলনকে চিরস্থায়ী করতে না পারা। মূলত খিলাফত আন্দোলন ছিল একশ্রেণীর মুসলমান নেতার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সমাজকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করা। তবে গেইল মিনোর মতে মুসলমান নেতারা এ আন্দোলন দ্বারা মুসলমান জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন, যাতে করে ব্রিটিশরাজ অথবা হিন্দুদের নিকট থেকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য ভালভাবে দর-কষাকষি করা যায়।[৪৪] মুসলমান জনসাধারণকে একত্র করার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থাটিও তাঁরা বেছে নিলেন, তা হলো "ধর্ম আজ বিপর্যস্ত" এই ধ্বনি তোলা। ফলে, সকল শ্রেণীর মুসলমানের প্রাথমিক দায়িত্ব হলো ধর্মকে রক্ষা করা, নেতাদের এই আকুল আহ্বানে মুসলমান জনসাধারণও তাৎক্ষণিক সাড়া দিলেন। খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের মুসলমান নেতারা তাঁদের এ আন্দোলনকে সর্বশ্রেণীর মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে খুব ব্যাপক করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। কংগ্রেস নেতারা আবার এ আন্দোলনকে সর্বস্তরে চালু করতে পারেন নি এবং সে চেষ্টাও করেন নি।[৪৫] ফলে দেখা যায় খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে যতটা তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল হিন্দুদের মধ্যে অতটা নয়। কিন্তু হঠাৎ করে আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাওয়াতে মুসলমানদের অভীষ্ট লক্ষ্য সিদ্ধ হতে পারলো না।

খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন মুসলমানদের রাজনৈতিক দিক দিয়ে এক নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। এর প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, ১৯২১এর ডিসেম্বরে আহ্মেদাবাদে কংগ্রেস, মুসলীম লীগ ও খিলাফত কমিটির যুক্ত অধিবেশনে হাসরত মোহানি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করার প্রস্তাব এনেছিলেন। যদিও এই প্রস্তাব অধিবেশনে পাশ হয় নি, কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায়, এ প্রস্তাব দু সম্প্রদায়ের বিভক্ত হওয়ার পথকে সুগম করেছিল। মাওলানা বারীর অভিমত হলো, এই অধিবেশনেই তিনি বুঝেছিলেন ভারত শীঘ্রই স্বাধীন হচ্ছে না, কারণ হিন্দুরা নিজেদের স্বার্থেই এত তাড়াতাড়ি ব্রিটেনের সঙ্গে একেবারে সম্পর্কচ্ছেদ করতে প্রস্তুত নন।[৪৬]

মুসলমান নেতাগণ মনে করেন হঠাৎ করে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করায় মুলসমানরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হন। আজমীর শরীফে ১৯২২এর ৩ মার্চ জামিয়াত-আল

৪৩. মজুমদার, পৃ. ৩২১।

৪৪. Gail Minault, pp 2-3.

৪৫. শাসমল, পৃ. ৩৩।

৪৬. Minault, p 182.

www.pathagar.com

উলেমার এক সভায় হাসরত মোহানি বলেন, অসহযোগ আন্দোলনে যারা চাকরি ছেড়েছেন তাঁদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনই মুসলমান।[৪৭] বর্তমানে ঐ সমস্ত পদ হিন্দু দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছে। আইন-অমান্য-আন্দোলনে গ্রেফতারকৃত লোকের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনই মুসলমান বলে দাবি করা হয়। কাজেই মুসলমান নেতাগণ ঘোষণা করেন, মুসলমানদের দাবি-দাওয়া পূরণের জন্য এখন থেকে মুসলমানরা একাই সংগ্রাম করবেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে পরিণামে খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন হিন্দু মুসলমান মিলনের পথকে সুগম করে না দিয়ে বরং দুই সম্প্রদায়কে আরো বেশি বিভক্ত করেছে।

বাংলায় দেখা যাচ্ছে, এরপর আর হিন্দু-মুসলিম-মিলন সম্ভবপর হয়নি। ১৯২৩এ হিন্দু-মুসলমান-মিলনের মাধ্যমে বঙ্গীয় আইন পরিষদে দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থাকে অচল করে দেবার জন্য চিত্তরঞ্জন দাশ এ দু সম্প্রদায়ের নেতাদের সমন্বয়ে বেঙ্গল প্যাক্ট[৪৮] নামে একটি চুক্তি করেছিলেন। এ চুক্তি-অনুযায়ী আইন পরিষদে জনপ্রতিনিধির সংখ্যা, চাকুরি এবং অন্যান্য যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, তার প্রায় অধিকাংশই ছিল মুসলমানদের জন্য। ফলে হিন্দুরা এ চুক্তি কার্যকর করতে রাজি হলেন না। অন্যদিকে মুসলমানরাও বেঙ্গল প্যাক্ট কার্যকর করা হল না বলে কংগ্রেসে যোগদান থেকে বিরত হলেন। ১৯১৪য় যেখানে আইন পরিষদে স্বরাজ্য দলের ৪৭ জন সদস্যের মধ্যে ২১ জন মুসলমান ছিলেন, ১৯২৭এ সেখানে মাত্র একজন মুসলমান সদস্য ছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্তৃক বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিল বলে ঘোষিত হবার পর অনেক মুসলমান কংগ্রেস ত্যাগও করেন।[৪৯] এর মধ্যে ১৯২৬-এর এপ্রিলে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানে ভীষণ দাঙ্গা হয়। দাঙ্গায় অনেক লোক মারা যায় এবং প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিভেদ ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে বাংলায় হিন্দু-মুসলমানে যেটুকু মিলন সম্ভব হয়েছিল, সেটা আর পরবর্তীকালে কোন সময়ে গড়ে ওঠেনি, বরং পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে জনসাধারণ নিজেদের সম্পর্কে সচেতন হয়। ফলে পরবর্তী সময়ে দুটো সম্প্রদায়ই নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে অধিকতর সজাগ থাকায় বিভেদের দূরত্ব বেড়ে যায়।

---

৪৭. যেমন ১৯২১এর ১০ জুলাই সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটি ঘোষণা করেছিল যে, ভারতীয় সেনা-বাহিনীতে থাকা বা যোগ দেওয়া ইসলাম-বিরোধী। ফলে অনেক মুসলমানই সেনাবাহিনী থেকে চলে আসে। শামসুল, পৃ ৩০।

৪৮. বেঙ্গল প্যাক্টের জন্য দ্রষ্টব্য Addul Karim, *Letters on Hindu Muslim Pact* (Calcutta, 1924), pp 2-3 এবং Appendix A. এছাড়া দ্রষ্টব্য Ujjal Kanti Das, "The Bengal Pact of 1923 and its Reactions", *Bengal Past and Present*. Vol. XCLX, Part 1, Serial 188. January-June 1980, p 42.

৪৯. কংগ্রেস ১৯১৯ সালের আইনের অধীনে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন বর্জন করেছিল। কিন্তু তাঁর সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ নির্বাচনে যোগদান করেন। নির্বাচনে যোগদানকারীদের দলের নাম হলো স্বরাজ্য দল। বাংলায় দলনেতা হলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র নির্বাচনে যোগদানের প্রশ্নে ছাড়া স্বরাজ্য এবং কংগ্রেস দলের মধ্যে অন্য কোন মতবিরোধ ছিল না।

৫০. যাঁরা দল ত্যাগ করেন, তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন হলেন, মুজীবর রহমান, আশরাফউদ্দীন আহমেদ, আবদুল মতিন চৌধুরী, মাওলানা আবদুল বাকী, মৌলভী আমীরউদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, মৌলভী শাইখ আহমেদ, নুরুল হক চৌধুরী, আমানত খান, হাজী আবদুর রশীদ খান, অসিমউদ্দীন আহমেদ, মুখলেছুর রহমান, আফতাবুল ইসলাম, মহিউদ্দীন খান, আবদুল মজিদ খান ও শামসুদ্দীন আহমেদ। Ujjal Kanti Das, p 42.

www.pathagar.com

জাপানী ভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

কেই শিরাই*

ভূমিকা

কোনো ভাষার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ তেমন সহজ কাজ নয়। কেননা ধ্বনি থেকে আরম্ভ করে বাক্যের আভ্যন্তর কাঠামো পর্যন্ত ভাষার নানা ক্যাটেগরি আছে। আবার ভাষা ভাব-বিনিময়ের এমন একটি পদ্ধতি, যার মধ্যে ভাষাভাষীর সামাজিকতা, মানসিকতা বা সৌন্দর্যের ধারণা ইত্যাদি বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। তাই ভাষাগত উপাদান ছাড়া অন্যান্য উপাদান সম্পর্কেও বিবেচনা করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে, কোনো ভাষার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য নিরূপণ তখনই সম্ভব হয়, যখন পৃথিবীর সমস্ত ভাষার সঙ্গে তার তুলনা করা যায়। অবশ্য ভাষা-সংক্রান্ত গবেষণা আগের চেয়ে অনেক অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু এমন অনেক ভাষাও রয়ে গেছে, যেগুলো সম্পর্কে এখনও তেমন উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয় নি। কোনো ভাষার বৈশিষ্ট্য বলতে আমরা যা বুঝি, পৃথিবীর সব ভাষার মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করা সম্ভব হলে, হয়তো দেখা যাবে যে, একই বৈশিষ্ট্য অন্য ভাষায়ও পরিলক্ষিত হচ্ছে। তখন তাকে আর বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরা যাবে না। তাই কোনো ভাষার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে গেলে প্রথমে তুলনার পরিধিকে স্পষ্টভাবে সীমাবদ্ধ করে নেওয়া উচিত। আবার আলোচ্য ভাষার অপেক্ষাকৃত উপেক্ষণীয় উপাদানগুলোকে যথাসম্ভব এড়িয়ে গিয়ে সুস্পষ্ট পার্থক্য-নির্দেশক উপাদানসমূহকেই গুচ্ছাকারে নেওয়া উচিত।

যা হোক, বর্তমান কাল পর্যন্ত কৃত গবেষণা এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ধারণার উপরে ভিত্তি করে জাপানী ভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টা করা যাক।

১. জাপানী ভাষার বিচ্ছিন্নতা

ভাষাবিষয়ক গবেষণার ইতিহাসে, ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে স্যার উইলিয়াম জোনস সংস্কৃতের সঙ্গে গ্রীক, ল্যাটিন ও জার্মান ভাষার সাদৃশ্য বিশেষভাবে নির্দেশ করেছিলেন। এই বিষয়টি ভাষাতাত্ত্বিকদের আগ্রহকে উদ্দীপ্ত করেছিল এবং তাঁরা এই ভাষাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক-নির্দেশে প্রয়াসী হয়েছিলেন। বপ, রাস্ক, গ্রীম প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিকের সম্মিলিত

*কেই শিরাই, প্রভাষক, জাপানী ভাষা, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

প্রয়াসে একদিকে ভাষাতত্ত্ব হয়ে উঠল নৈর্ব্যক্তিক ও বৈজ্ঞানিক এবং তারই ফলস্বরূপ স্থাপিত হলো আধুনিক ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিমূল। পক্ষান্তরে, এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে দক্ষিণ এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানের আপাতবিচ্ছিন্ন ভাষাগুলিকে সহোদরা ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে—অর্থাৎ এদেরকে একই পরিবারভুক্ত বলে গ্রহণ করা যায়।

ভাষাতাত্ত্বিকদের আগ্রহ কেবল ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠির ভাষাতেই সীমিত থাকেনি, বরং তাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার তুলনার মাধ্যমে সেগুলির বংশগত সম্পর্ক সম্বন্ধে নতুন তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন করেছেন এবং এর ফলে বহু ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক অনেকটাই স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু জাপানী ভাষার বংশপরিচয় এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নি। অর্থাৎ জাপানী ভাষা আজ পর্যন্ত সহোদরাবিহীন, একক এবং বিচ্ছিন্ন।

জাপানী ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে তেমন গবেষণা যে হয়নি, তা নয়। বরং বহু-সংখ্যক পণ্ডিত এই সমস্যার সমাধানের জন্যে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই বিষয়ে গবেষণার সূত্রপাত করেন বিদেশীরা, বিশেষতঃ ইউরোপীয় প্রাচ্যভাষাবিশারদ ও কূটনীতি-বিদ্‌গণ। তাঁরা আলটায়িক ভাষা, কোরীয় ভাষা বা রিয়ুকিয়ু ভাষার সঙ্গে জাপানী ভাষার সম্পর্ক-নির্ধারণের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অত্যল্প ব্যতিক্রমী কিছু কাজ ছাড়া তাঁদের গবেষণাকার্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুধ্যানের অভাব ছিল। 'মেইজি যুগে'র (১৮৬৮—১৯১২) মধ্যবর্তী সময়ে জাপানে যখন ভাষাতত্ত্বের প্রসার ঘটে, তখন জাপানী পণ্ডিতসমাজেও এই বিষয়ে আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে। এরপর থেকে বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে জাপানীর তুলনামূলক বিচার ও তার বংশগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে। যেসব ভাষাকে নিয়ে তুলনামূলক বিচার করা হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে—পূর্বে উল্লিখিত তিনটি ভাষা ছাড়া, চীনা ভাষা, আইনু ভাষা, তিব্বতী-বর্মী ভাষা, মং খেমের ভাষা, মালয়-পলিনেশীয় ভাষা, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ইত্যাদি। হিমালয়-উপত্যকায় বসবাসকারী লেপ্‌চাদের ভাষার সঙ্গে জাপানী ভাষার সম্পর্ক-স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে, আবার বৎসর কয়েক আগে তামিল ভাষার সঙ্গেও তুলনা করার চেষ্টা চালিয়েছেন জনৈক পণ্ডিত। তবে জাপানী ভাষার বংশ-লতিকা এখনও তৈরি করা সম্ভব হয়নি। এ পর্যন্ত যত গবেষণা হয়েছে, তার ফলে সাম্প্রতিক কালে এই সম্পর্কিত গবেষণা দুটি প্রধান ধারায় বিভক্ত। একটি হলো—জাপানীকে কোরীয় বা আলটায়িক ভাষার সহোদরা হিসেবে চিহ্নিত করার গ্রহণযোগ্যতাকে অধিক সম্ভাব্য বলে বিবেচনা করে, সেই লক্ষ্যে গবেষণা চালিয়ে যাওয়া। অন্যটি হলো—জাপানী ভাষায় উপরিউক্ত উত্তরাঞ্চলীয় ভাষা-উপাদান এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশগুলোর ভাষা-উপাদানের যুগপৎ বিদ্যমানতাকে স্বীকার করে নিয়ে, উভয় দিকের ভাষাসমূহের মিশ্রণকে বিশ্লেষিত করে, জাপানী ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের ব্যাখ্যা দেওয়া। যাই হোক, জাপানী ভাষার কুলজি-নিরূপণে আরো অনেক সময় লাগবে বলে মনে হয়।

আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কেন এই কাজ এত দুরূহ এবং সময়সাপেক্ষ? আসলে এই সম্পর্কিত গবেষণার প্রধান প্রতিবন্ধক হচ্ছে, প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব। ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠির ভাষার ক্ষেত্রে খ্রীষ্টপূর্বকালের লিখিত রেকর্ডও দুর্লভ নয়। আবার এই পরিবারের অধিকাংশ ভাষা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেলেও, এখনও স্বকীয়তা নিয়ে বেঁচে আছে। পক্ষান্তরে, যেসব লিখিত রেকর্ডের মধ্যে প্রাচীন জাপানী

www.pathagar.com

ভাষার আদি রূপটি লক্ষ্য করা যায়, সেগুলির—যেমন, 'কোজিকি' 'নিহোনশোকি' 'মানইয়োশু' ইত্যাদির—রচনাকাল হচ্ছে অষ্টম শতক। দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক হচ্ছে, জাপানী ভাষার রূপতাত্ত্বিক প্রকৃতির অস্থিরতা। প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা একটি প্রত্যয়ান্ত (inflectional language), তাই ধাতু, উপসর্গ, প্রত্যয় এমনকি বিভক্তির মতো ব্যাকরণিক উপাদান পর্যন্ত অন্যান্য ভাষার সঙ্গে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনার ক্ষেত্রে টেনে আনা যায়। কিন্তু জাপানীতে যোগবদ্ধ ভাষার (agglutinative language) বৈশিষ্ট্য বেশি বলে তাকে অন্যান্য ভাষার সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

জাপানী ছাড়াও পৃথিবীতে এমন অনেক ভাষা পাওয়া যায়, যাদের বংশগত পরিচয় এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু জাপানীর মতো বংশপরিচয়হীন অথচ বহুলকথিত ভাষা পৃথিবীতে আর একটিও নেই।

২· জাপানী ভাষার অনন্যতা

এইমাত্র বলা হয়েছে যে, জাপানী একটি বহুলকথিত ভাষা। ১৯৮০ সালে প্রকাশিত একটি ভাষাতত্ত্ব-অভিধান-অনুসারে, জাপানী ভাষাভাষীর সংখ্যা হচ্ছে এগার কোটি। ভাষাভাষীর সংখ্যার দিক থেকে বিবেচনা করলে, চীনা, ইংরেজী, রুশ, হিন্দী ও স্পেনীয় ভাষার পরে জাপানী ভাষা ষষ্ঠস্থানে অবস্থান করছিল। গত পাঁচ বৎসরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ভয়াবহভাবে বেড়ে যাওয়ায় জাপানী ভাষা এখন খুব সম্ভব সপ্তম স্থানে রয়েছে।

পৃথিবীর বহুলকথিত ভাষাগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে, জাপানী ভাষার কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ জাপানী ভাষা জাপানের বাইরে খুব সামান্য প্রচলিত। বর্তমানে হাওয়াই, ব্রাজিল এবং উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে, প্রায় বারো লক্ষের মত জাপানী বংশোদ্ভূত লোক বসবাস করেন, আর তাঁদের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক মোটামুটিভাবে জাপানী বলতে সমর্থ। নাগরিকতার দিক থেকে হয়তো এঁরা জাপানী নন, কিন্তু জাতিগত বিচারে তাঁরা জাপানী। অন্যদিকে, কোরিয়া, তাইওয়ান ইত্যাদি দেশে, যেখানে বহুদিন পর্যন্ত জাপানী ঔপনিবেশিক শাসন বহাল ছিল, সেখানে এমন অনেক লোক রয়ে গিয়েছেন, যাঁরা ভালোভাবে জাপানী ভাষা ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু সঙ্গত কারণেই তাঁদেরও অনেকেই দৈনন্দিন কথাবার্তায় জাপানী ব্যবহার করেন না। যদিও শোনা যায়, জাপানী পণ্যের প্রসার বিশ্ববাজারে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে, তবু জাপানী ভাষার প্রচরে-প্রসারের অবস্থাটা তার একেবারেই উলটো।

জাপানী ভাষার এই অপ্রচলনের ব্যাপারটি বিদেশে জাপানী-চর্চাতেও লক্ষিত হয়। ইংরেজীর চর্চা মুক্ত বিশ্বে তো বটেই, এমনকি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেও কমবেশি হচ্ছে। ফরাসী, জার্মান, রুশ, স্পেনীয় ইত্যাদি পৃথিবী-জুড়ে বিদেশী ভাষা হিসেবে ব্যাপকভাবে পঠন-পাঠনের বিষয় হয়েছে। বিশ্বের মুসলমানপ্রধান দেশগুলোতে ধর্মীয় কারণে বহুকাল থেকে আরবী একটি বহুলচর্চিত ভাষা, বর্তমানকালে অর্থনৈতিক কারণে আরবীর চর্চা আরো বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। তুলনামূলকভাবে দেশের বাইরে

www.pathagar.com

জাপানী ভাষা-চর্চার অবস্থা একেবারেই শোচনীয়। এখন যদিও বিদেশে জাপানী ভাষা-শিক্ষায় আগ্রহীদের সংখ্যা বাড়ছে, তবু অন্যান্য ভাষার তুলনায় তা নিতান্তই অল্প। আর জাপানী ভাষায় গবেষণাকর্ম করছেন এমন জাপান-বিশেষজ্ঞের সংখ্যা তো খুবই কম। এই পরিপ্রেক্ষিতে জাপান সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নানা উদ্যোগ গ্রহণ করছেন, তবে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সহযোগিতা ছাড়া জাপানী ভাষার প্রচার কোনোভাবেই সম্ভবপর নয়।

দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীর বহুলকথিত ভাষাগুলোর তুলনায় জাপানীর বৈশিষ্ট্য এখানে যে, জাপানে শুধুমাত্র জাপানী ভাষাই ব্যবহার করা হয়। হোক্কাইদো দ্বীপে বসবাসকারী 'আইনু'দের যদিও নিজস্ব ভাষা রয়েছে, তবু তাদের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে 'আইনু' ভাষা-ব্যবহারকারী লোকের সংখ্যা খুবই কম। কিছুসংখ্যক কোরীয়ও জাপানে বসবাস করেন। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারী-অনুযায়ী তাঁদের সংখ্যা ৬ লক্ষ ১০ হাজার। তবে তাঁদের শতকরা ৭৫·৬ ভাগই হচ্ছেন জন্মগতভাবে জাপানী। অতএব অনুমান করা যায় যে, কোরীয় ভাষায় যাঁরা কথা বলেন, তাঁদের সংখ্যা দেড় লক্ষের চেয়ে কম। আবার জাপানে দৈনন্দিন কথাবার্তায় তো বটেই, সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের সমস্ত কাজকর্ম কেবল জাপানীতেই করা হয়। অর্থাৎ জাপান একটি একক ভাষাভিত্তিক দেশ। বলা যায়, ঐতিহাসিক কারণেই এমনটি ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের কিছু সময় ছাড়া, কখনো কোনো দেশ জাপানকে দখল করতে পারে নি। তার পেছনে ছিল ভৌগোলিক কারণ; অর্থাৎ দ্বীপদেশ জাপানের অবস্থানগত সুবিধা। স্বভাবতঃ একক ভাষাভিত্তিক দেশে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ থাকে না। সাধারণতঃ যে-কোনো দেশের সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষার উল্লেখ একটি সাধারণ শর্ত। কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হলো, জাপানের সংবিধানে এরকম কোনো উল্লেখ নেই। বলা বাহুল্য, বহুভাষাভিত্তিক দেশে ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এ ব্যাপারে ভারতের উদাহরণ প্রায়ই দেওয়া হয়ে থাকে। ভাষা-সমস্যা নিয়ে সেখানকার সরকারকে বহু কঠিন পরিস্থিতির মুকাবেলা করতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। আবার যে-দেশগুলোকে বর্তমানে একক ভাষাভিত্তিক দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, সেগুলোর ইতিহাস আলোচনা করলে ভাষা নিয়ে সংগ্রাম করার উদাহরণও পাওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশের ভাষা-আন্দোলন তার অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। কিন্তু জাপান এমন একটি দেশ, যেখানে ভাষা-সমস্যা কখনো রাজনৈতিক সমস্যাতে পরিণত হয়নি।

যাই হোক, উপরি-উক্ত আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, অত্যল্প ব্যতিক্রম ছাড়া জাপানী ভাষা শুধু জাপানের মধ্যে প্রচলিত এবং জাপানে কেবল জাপানী ভাষা ব্যবহৃত। অর্থাৎ ভাষার ব্যাপ্তি এবং দেশের সীমা প্রায় সমান।

৩. জাপানী ভাষার সমরূপতা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ভাষা ও রাষ্ট্রের দিক থেকে জাপানী ভাষার বৈশিষ্ট্য-নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে। এবার স্বদেশে জাপানীর ভাষাগত পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবেচনা করা

www.pathagar.com

যাক। স্বদেশে জাপানী একক ভাষা হিসেবে প্রচলিত থাকলেও, এর মধ্যে ভাষা-রূপের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। উদাহরণ হিসেবে উপভাষাগত পার্থক্যের কথা বলা যায়। ভৌগোলিক দিক থেকে তুলনামূলকভাবে জাপান বেশ ছোট হলেও, তার উপভাষাগুলোর মধ্যে পার্থক্য কম নয়। এমন উপভাষাও আছে যা অন্য এলাকার লোক সহজে বুঝতে পারে না। ঠিক বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বা সিলেটের উপভাষার মতো। উপভাষার পার্থক্য ছাড়াও, ভাষার ক্ষেত্রে পেশাগত, পদমর্যাদাগত, নারীপুরুষগত ইত্যাদি নানাস্তরীয় পার্থক্য নির্দেশ করা যেতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পারস্পরিক যোগাযোগের ব্যাপারে তেমন কোনো অসুবিধা হয় না। কারণ, জাপানে মান-ভাষা (standard language) এত বেশি প্রচলিত যে, সেখানে পার্থক্যের ব্যাপারটি গৌণ হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, মান-ভাষা হচ্ছে তোকিয়ো ও তার আশেপাশের এলাকার উপভাষার ভিত্তিতে পরিশীলনের মাধ্যমে তৈরি একটি তথাকথিত কৃত্রিম ভাষা। তাই যাঁরা প্রকৃত অর্থে মান-ভাষা ব্যবহার করেন, তাঁদের সংখ্যা হতে পারে খুবই অল্প। কিন্তু তবু প্রায় সব জাপানী সে ভাষা বুঝতে পারেন এবং প্রয়োজনে লিখতেও পারেন।

এবার নিরক্ষরতার প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রকৃতপক্ষে নিরক্ষরতার হার নির্ভর করে, সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রকে আমরা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত বা সংকুচিত করবো, তার উপর। কিন্তু জানা যায় যে, সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রকে সর্বাধিক সংকুচিত করে জরিপ করলেও জাপানে নিরক্ষরতার হার কেবল শতকরা ৬.৭ ভাগ। জরিপের এই ফল অবশ্য ১৯৪৯ সালের। একই জরিপে দেখা গিয়েছে যে, ৫৫-৫১ এবং ৬০-৬৪ বৎসর বয়সসীমার লোকের মধ্যে নিরক্ষরতার হার ছিল বেশি। এঁদের অনেকেই হয়তো এখন বেঁচে নেই। তাই অনুমান করা যাচ্ছে যে, বর্তমানে জাপানে নিরক্ষরতার হার খুব বেশি হলে শতকরা ০.৩ ভাগ। দেখা যাচ্ছে, জাপানীদের মধ্যে লেখাপড়ায় কে কতদূর দক্ষ তা আলোচনার বিষয় হতে পারে, কিন্তু নিরক্ষরতার সমস্যা সেখানে আর আলোচিতব্য বিষয় হবে না বললেই চলে। জাপান কেবল একটি একক ভাষাভিত্তিক দেশই নয়, বরং ভাষার ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের তুলনায় জাপানে সমরূপতা অনেক বেশি। মনে হয়, এটিই জাপানীদের উন্নতির অন্যতম কারণ।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, ভাষার এই সমরূপতা অর্জন করা সম্ভব হলো কিভাবে? কেউ কেউ বলতে পারেন, একক ভাষাভিত্তিক দেশ বলেই জাপানে এই কাজটি সহজে বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশ্যই এটা একটি কারণ। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এই কাজে সরকারী ও বেসরকারী নানা প্রতিষ্ঠান এবং সেই সঙ্গে অসংখ্য মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগ ছিল। এই উদ্যোগকে মোটামুটিভাবে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ অনুবাদ এবং পরিভাষার ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিত কাজ। প্রাচীন কালে জাপানে বিদেশী শব্দ, বাক্যাংশ, এমনকি বাক্য পর্যন্ত ভাষায় সরাসরি গ্রহণ করার প্রবণতা ছিল বেশি। তখন সেগুলো অনুবাদ করার চেষ্টা খুব কম হয়েছে। কিন্তু, 'মুরোমাচি-যুগে'র (১৩৩৮-১৫৭৩) পরে যখন ল্যাটিন, পর্তুগীজ, স্পেনীয় প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে পরিচয় হলো, তখন থেকেই অনুবাদ এবং পরিভাষা তৈরি করার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল। তারপর ওলন্দাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের পর, যখন একে একে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ইত্যাদি দেশের প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়তে শুরু করল তখন ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে প্রচুর বিদেশী শব্দের প্রতিশব্দ তৈরি হতে লাগল। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় বিদেশী বইয়ের অনুবাদ হলো প্রচুর পরিমাণে এবং সেই সঙ্গে পরিভাষা-তৈরির কাজও পাশাপাশি এগিয়ে চলল। পরিভাষা-তৈরির কাজে অবশ্যই

www.pathagar.com

বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হয়েছিল, তবু সবাই একজোট হয়ে কাজটি করেছিলেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা, এই কাজে সরকার নিয়ন্ত্রক ও সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাই এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে জাপানই সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়-পর্যায়ের শিক্ষায় নিজ-ভাষা ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছে।

দ্বিতীয় উদ্যোগ ছিল কথ্য এবং লেখ্য ভাষার পার্থক্য দূর করা। বাংলা সাধু আর চলিত ভাষার মধ্যে যেমন পার্থক্য আছে, ঠিক সেরকম পার্থক্য 'মেইজি যুগে'র আগে জাপানী কথ্য এবং লেখ্য ভাষার মধ্যে ছিল। কিন্তু জাপানীরা যখন থেকে লক্ষ্য করলেন যে, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি উন্নত দেশে কথ্য ও লেখ্য ভাষায় তেমন পার্থক্য নেই, তখন তাঁরা ভাবলেন, এটাই হয়তো ইউরোপীয়দের উন্নতির কারণ। কথ্য ও লেখ্য ভাষার মধ্যে পার্থক্য বিলোপ করার আন্দোলন, জাপানীতে যাকে বলা হয় 'গেনবুন ইচ্চি উন্দো' গড়ে উঠলো এবং তাতে যোগ দিলেন সাহিত্যিক, ভাষাতাত্ত্বিক, সাংবাদিক, বৈজ্ঞানিক, সকলেই আর সরকার এই আন্দোলনকে সমর্থন করে এটিকে নীতিগতভাবে মেনে নিলেন। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে এই আন্দোলন ভাষা-সংস্কারের একটি প্রধান ধারা হয়ে উঠল। তার ফলে বর্তমানে কথ্য ও লেখ্য ভাষায় আগের মতো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না।

তৃতীয় উদ্যোগ ছিল, সকল পর্যায়ে মান-ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। 'মেইজি যুগে' বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষাদান সরকারের অন্যতম নীতি ছিল। তখন কোন্ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান করা হবে, সেটাই প্রধান সমস্যা ছিল। সরকার নীতিগতভাবে মান-ভাষা প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, বরং বানানের নিয়ম, 'কানজি' (জাপানী ভাষায় ব্যবহৃত চীনালিপি)-ব্যবহারের রীতি ইত্যাদি তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন। তার ফলে ভাষাতে যে বিশৃংখলা ছিল, তা দূর হতে থাকল।

এভাবেই অসংখ্য মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাপানী ভাষার সমরূপতা তৈরি হয়েছে। অবশ্যই কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু অসমরূপতা এখনও রয়ে গিয়েছে। যেমন—বানানভেদ, 'কানজি'র ব্যবহার, প্রতিশব্দগুলোর ব্যবহারগত ভুল ইত্যাদি। সরকার অবশ্য ভাষা-সংস্কারের দায়িত্ব নিয়ে নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ের কাজ করে যাচ্ছেন। আবার এই কাজে সরকারকে সমালোচনা করার অধিকার বা স্বাধীনতা প্রত্যেক জাপানীরই আছে এবং তাঁরা সেই অধিকার ব্যবহারও করে থাকেন।

সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে, ভাষার একত্ব ও সমরূপতার কিছু ক্ষতিকর দিকও পরিলক্ষিত হয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে বিদেশী ভাষা-ব্যবহারে জাপানীদের দুর্বলতা। জাপানে অবশ্যই ব্যাপকভাবে বিদেশী ভাষার চর্চা হয়ে থাকে। ইংরেজী তো সপ্তম শ্রেণী থেকেই শেখানো হয়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার হয় না বলে, অর্থাৎ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা কম বলে, জাপানীদের বেশির ভাগ ভালো ইংরেজী বলতে পারেন না। বর্তমানে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক ভাবের বিনিময় খুবই দরকার। এই অবস্থায় এটি একটি গুরুতর সমস্যা।

বাংলাদেশ একটি একক ভাষাভিত্তিক দেশ। সাম্প্রতিককালে এখানে ভাষার সমরূপতা অর্জনের প্রক্রিয়া চলছে। ভাষা-সংস্কার, বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান, পরিভাষা তৈরী ইত্যাদি

www.pathagar.com

নানা ধরনের কাজ হচ্ছে। এক্ষেত্রে জাপানের অভিজ্ঞতা হয়তো কিছুটা কাজে আসতে পারে। সেই সঙ্গে যেসব ভুল জাপানীরা করেছেন, তাও ভালভাবে লক্ষ্য করা হয়তো দরকার।

৪· জাপানী ভাষার ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য

পরিশেষে, জাপানী ভাষার বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে সামাজিকতার ক্ষেত্রে ভাষার প্রয়োগরীতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

এতক্ষণ জাপানী ভাষার বিচ্ছিন্নতা, অনন্যতা, সমরূপতা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। কিন্তু এসব বৈশিষ্ট্য কেবল ভাষাগত নয়, বরং জাপানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হিসেবেই মোটামুটি প্রযোজ্য। এ পর্যন্ত যতদূর জানা গিয়েছে, তাতে একথা স্পষ্ট হয় যে, জাপানীরা সবাই প্রায় একই নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত এবং প্রাচীনকাল থেকে প্রায় একক ও অভিন্ন সংস্কৃতির ধারক। 'এদো যুগে' এসে জাপানের প্রায় সমস্ত অঞ্চল প্রথমবারের মতো একটি একক তথা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আসে। এর ফলে বিচ্ছিন্ন রাজনীতি ও সংস্কৃতি একই সঙ্গে কেন্দ্রীভূত হয়। কেন্দ্রীয় শাসনের ছত্রচ্ছায়ায় সাংস্কৃতিক সমরূপতা দানা বাঁধতে থাকে। ক্রমে ক্রমে এই সাংস্কৃতিক সমরূপতা সামাজিক একত্বে পরিণত হয়। আধুনিক কালে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, যুদ্ধকালীন জাতীয় ঐক্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন নিয়ামকের প্রত্যক্ষ প্রভাবে এই একত্ব আরও সুদৃঢ় হয়েছে।

এই রকম সাংস্কৃতিক-সামাজিক পরিবেশে একত্বের চেতনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই অভিন্ন পরিস্থিতি বা অভিজ্ঞতাকে সমানভাবে অনুমোদন করার প্রবণতা জনসাধারণের মধ্যে খুব বেশি। ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এমন অভিব্যক্তি বেশ পরিলক্ষিত হয়। যেমন, জাপানে সকালবেলায় পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে 'ওহায়ো' বলা হয়। এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'তাড়াতাড়ি'। আর এর ব্যঞ্জনা বা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে 'এখন ভোর' বা 'আপনি খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেছেন'। অবশ্যই এর আভিধানিক অর্থটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, অভিবাদনের বিশেষ অভিব্যক্তি হিসেবে এটি বেশ প্রচলিত। কিন্তু ব্যুৎপত্তির দিক থেকে বিবেচনা করলে মনে হয়, এই প্রকাশভঙ্গিতে পারস্পরিক অভিজ্ঞতাকে উভয়পক্ষ থেকেই অনুমোদন করা হচ্ছে। তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়, অভিবাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশীদের সঙ্গে জাপানীদের তফাৎ এইখানে যে, জাপানে এই ধরনের সামাজিক শিষ্টাচারে ধর্মের প্রভাব খুব কম। পারস্পরিক সাক্ষাতের ক্ষেত্রে এবং পত্র-বিনিময়ের ক্ষেত্রে আবহাওয়া বা ঋতু-সম্পর্কিত আলোচনাও বেশ গুরুত্ব পায়। প্রকৃতির প্রতি জাপানীদের সহজাত অনুরাগ হয়তো এর কারণ। কিন্তু এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, এর মাধ্যমে জাপানীরা একই পরিস্থিতিকে পারস্পরিকভাবে অনুমোদন করে থাকেন। পরিচিতদের মধ্যে যখন দেখা হয়, তখন পূর্ববর্তী সাক্ষাতের কথা স্মরণ করে কথা বলার রীতি বেশ প্রচলিত। এমন যদি হয় যে, বক্তা অতীতে

www.pathagar.com

নিমন্ত্রিত হয়ে শ্রোতার বাড়িতে গিয়েছিলেন, তবে বক্তা প্রথমেই শ্রোতার গতবারের আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ জানাবেন এবং সেদিন অজ্ঞাতসারে দেওয়া কোনো কষ্টের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। শ্রোতাও একইভাবে সমান অভিব্যক্তি প্রকাশ করবেন। কিছুক্ষণ হয়তো এই ব্যাপার নিয়েই কথাবার্তা হবে। এই ক্ষেত্রেও একই অভিজ্ঞতাকে অনুমোদন করা হচ্ছে।

সমাজবদ্ধ জীবনে সহযোগিতার মনোভাব খুবই দরকার। জাপানীরা দলগতভাবে কাজ করতে দক্ষ বলে শোনা যায়। সহযোগিতার মনোভাব আছে বলেই এটা সব সময়ে সম্ভব হয়ে থাকে। ভাষা-প্রয়োগের ক্ষেত্রেও এই ভাবটি লক্ষিত হয়। যেমন জাপানীদের কথাবার্তায় বাংলায় 'তাই না'র মতো শ্রোতার অনুমোদনকারী অব্যয়, বা 'তাই নাকি' 'আচ্ছা', 'জি', 'হুঁ'র মতো শ্রোতার সায় দেবার ভঙ্গি বেশ প্রচলিত। মাঝেমধ্যে এরকমও হয় যে, কয়েক জনের সম্মিলিত প্রয়াসে অসমাপ্ত বাক্য বা বাক্যগুলিকে সম্পূর্ণ করা হয়। জনৈক জাপানী গবেষকের মতে, ইংরেজী কথোপকথন অনেকটা টেনিস খেলার বল আদান প্রদানের মতো। বক্তা যখন বলেন, শ্রোতা তখন চুপ করে থাকেন। যখন বক্তার কথা শেষ হয়, ঠিক তখনই শ্রোতা বলতে শুরু করেন। কিন্তু জাপানী কথোপকথন অনেকটা ভলিবল খেলার মতো। বরং বলা যায়, ভলিবল খেলায় স্বপক্ষীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে বল আদান-প্রদানের মতো একটি ব্যাপার। অর্থাৎ ইংরেজীতে বক্তা ও শ্রোতা দুই ভিন্ন পক্ষ। পক্ষান্তরে জাপানী কথোপকথনে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব বেশি।

নিজের চেয়ে অন্যের কথাকে গুরুত্ব দেওয়াটা এক ধরনের সহযোগিতার মনোভাব। জাপানীতে শ্রোতার পক্ষ অবলম্বন করে কথা বলা বেশ প্রচলিত। একই সঙ্গে নেতিবাচক ও প্রশ্নবোধক বাক্যের জবাবে, ইংরেজী বা বাংলায় যেমন উত্তর ইতিবাচক হলে 'হ্যাঁ' আর না হলে 'না' বলা হয়, কিন্তু জাপানীতে হয় ঠিক উল্টো। জাপানীরা মনে করেন যে, বক্তা নেতিবাচক প্রশ্ন তখনই করেন, যখন 'না' উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা পূর্ব থেকেই তাঁর মনে কাজ করে। এইরকম ক্ষেত্রে যদি উত্তরটি 'না'ই হয়, তাহলে শ্রোতা বক্তার পূর্বলব্ধ ধারণাকে গুরুত্ব দিয়ে 'হ্যাঁ' বলবেন। এইখানে 'আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন' এই অর্থে 'হ্যাঁ' বলা হয়। বিপরীতক্রমে, শ্রোতা 'না' উত্তর দিলে বোঝা যায় যে, তিনি বলতে চাইছেন 'আপনার অনুমান ঠিক হয়নি'। আবার কোনো প্রস্তাব বা অনুরোধের প্রত্যুত্তরে 'না' বলা জাপানীদের জন্যে খুবই অপ্রীতিকর ব্যাপার। কেননা সরাসরি 'না' বললে শ্রোতা হয়তো মনে ব্যথা পেতে পারেন। সেক্ষেত্রে সাধারণতঃ প্রথমে ক্ষমা চাওয়া হয় এবং পরে ইঙ্গিতে 'না'-এর ভাবটা প্রকাশ করা হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে তখন 'দেখা যাক' বা 'চেষ্টা করে দেখি' এইরকম বাক্য ব্যবহার করা হয়। অবশ্যই জাপানীদের ক্ষেত্রে এই ধরনের বাক্য নিতান্ত দায়সারা গোছের বা এড়িয়ে যাওয়ার মতো—তা নয়। বরং আন্তরিকভাবে সত্যিকার অর্থেই কথাটি বলা হয় এবং তার বাস্তবায়নের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টাও করা হয়। এরপরেও যদি প্রস্তাব বা অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব না হয়, তাহলে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ক্ষমাপ্রার্থনা করে অপারগতা জানানো হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, একটি সমাজভাষাতাত্ত্বিক জরিপের ফলে দেখা গিয়েছে যে, জাপানীরা 'না' খুব কম বলেন। যাও বা বলা হয়, তার বেশির ভাগই এই ধরনের ক্ষেত্রে, যেমন—

www.pathagar.com

বক্তা শ্রোতার প্রশংসা করলেন এবং তার জবাবে শ্রোতা সবিনয়ে 'না' 'না' বললেন। অথবা বক্তা যখন নিজের কোনো খারাপ দিক বা দোষের কথা বলেন, তখন শ্রোতার পক্ষ থেকে তার অস্বীকৃতিসূচক 'না' বলা।

জাপানীরা কথায় কথায় কৃতজ্ঞতা জানিয়ে থাকেন বা ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন। কেননা কারো কাছ থেকে কিছু পেলে, বা কাউকে সামান্যতম কষ্টও দিলে, তার পক্ষ অবলম্বন করে কথা বলাটা একটা সাধারণ সৌজন্যের ব্যাপার। জাপানে ছোটবেলা থেকে পরিবার বা স্কুলে কৃতজ্ঞতা জানানোর বা ক্ষমা প্রার্থনা করার শিক্ষা দেওয়া হয়। বলতে গেলে, এটি সামাজিক শিষ্টাচারের একটি প্রধান অংশ এবং জাপানীদের নীতিবোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অবশ্য ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ধরনের শিষ্টাচার সবসময়ে মুখে বলে প্রকাশ করবার ব্যাপার নয়। কিন্তু এমন প্রবাদও আছে, যাতে আপনজনদের মধ্যেও শিষ্টাচার অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই ঘনিষ্ঠদের মধ্যেও উপলক্ষবিশেষে কৃতজ্ঞতা বা ক্ষমার ভাব প্রকাশের উদাহরণ বিরল নয়। জাপানে বিবাহ-অনুষ্ঠানে মা-বাবার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময়ে অশ্রুসিক্ত কন্যার মুখ থেকে প্রায় অস্ফুট দুএক শব্দে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন—এই ধরনের দৃশ্য প্রায়শঃই দেখা যায়। আসলে হয়তো জাপানীরা নিজেদের অজান্তেই ক্ষমা প্রার্থনা বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রত্যাশা করে থাকেন। পক্ষান্তরে, এই উপমহাদেশের মানুষদের মধ্যে এই ধরনের মনোভাবকে মুখে প্রকাশ করার রীতি তেমন প্রচলিত নেই। 'ধন্যবাদ' বা 'মাফ করবেন' অবশ্যই কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলা হয়; কিন্তু সেটা কেবল শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত এবং তাও এই উপমহাদেশের নিজস্ব প্রথা নয়, বরং ইউরোপীয় রীতির অনুকরণ। তারপরেও মনে করা হয়ে থাকে যে, মুখের কথায় ক্ষমা-প্রার্থনা বা কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন করলে ব্যাপারটি হাল্কা হয়ে যায় এবং অধিক আনুষ্ঠানিক হয়ে পড়ে। সাধারণতঃ এখানকার মানুষেরা এ ধরনের কথা খুবই কম বলেন, বরং অন্য অভিব্যক্তির মাধ্যমে আলোচ্য ভাবকে প্রকাশ করেন। তাই এই অঞ্চলে প্রবাসী জাপানীরা, যাঁরা এই ব্যাপারটি সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন না, তাঁরা এখানকার অধিবাসীদের প্রায়ই ভুল বোঝেন। তাঁদের ধারণা, হয়তো এ অঞ্চলের মানুষ তেমন ভদ্র নন। তাঁরা হয়তো ভাবেন, এখানকার মানুষের মধ্যে এই ধরনের মনোভাব অনুপস্থিত, কারণ, তাঁরা সব কিছুকেই সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা বলে মনে করেন। আবার আমেরিকা বা ইউরোপে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষমাপ্রার্থনা করার মানেই হচ্ছে নিজের দোষ স্বীকার করা। যেমন—দুর্ঘটনা ঘটলে জাপানীরা নিজের দোষ না থাকলেও হয়তো বলবেন 'মাফ করবেন'। কিন্তু আমেরিকা বা ইউরোপে 'মাফ করবেন' বলার অর্থ হচ্ছে নিজের দোষ স্বীকার করে নেওয়া। প্রকাশভঙ্গির এই পার্থক্য বোঝা জাপানীদের জন্যে বেশ মুশকিলের ব্যাপার।

শ্রোতার পক্ষ অবলম্বন করার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে ভাষায় সমানুভূতির ব্যাপক ব্যবহার। একে জাপানী ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। বাংলায় যেমন, শিশুকে খাওয়ানোর সময়ে মা হয়তো বলবেন' 'এসো, আম্মু, তোমাকে খাইয়ে দিই'—ঠিক এই রকম ভাষারীতি। শ্রোতার সঙ্গে বক্তা তার নিজের সম্পর্ক প্রথমে নির্ধারণ করে নিয়ে, পরে শ্রোতার অবস্থানে বসিয়ে কথা বলার রীতি অর্থাৎ শ্রোতার সঙ্গে সমানুভবে নিজেকে দেখার ভাষারীতি। অন্য একটি ভাষাতাত্ত্বিক জরিপ-অনুসারে জনৈক চল্লিশ বৎসর বয়স্ক শিক্ষক, যাঁর স্ত্রী এবং একটি বালক পুত্র আছে, তিনি দৈনন্দিন জীবনে সাত রকমের

www.pathagar.com

শব্দ ব্যবহার করে নিজেকে ব্যক্ত করে থাকেন। সন্তানের কাছে 'আব্বা', ছোট ভাইয়ের কাছে ভাইয়া, প্রতিবেশীদের বাচ্চা-কাচ্চার কাছে 'চাচা' বা 'মামা' ইত্যাদি, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কাছে 'স্যার', এবং এমনি করে স্ত্রী, পিতা, স্কুলের অধ্যক্ষ প্রমুখ ব্যক্তির সঙ্গে আলাদা আলাদা উত্তমপুরুষ (জাপানীতে নানা ধরনের উত্তমপুরুষ আছে) ব্যবহার করে থাকেন। মাঝেমধ্যে অবশ্য এই ধরনের ভাষারীতিকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে, জাপানীদের সমালোচনা করা হয়। বলা হয়, জাপানীরা একে অন্যের উপর অনেকটা নির্ভরশীল, অন্যের আচরণ দেখে নিজের আচরণ ঠিক করে নেন, অর্থাৎ তাঁদের ব্যক্তিত্ব এবং অহম্ খুব দুর্বল, ভাষারীতিতেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পরিশেষে জাপানী ভাষার সম্মানসূচক অভিব্যক্তি সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করে বক্তব্য শেষ করা যাক। প্রায় সব ভাষাতেই সম্মানসূচক অভিব্যক্তি আছে। বাংলায়ও অবশ্যই আছে। কিন্তু তার জটিলতার মাত্রা বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন রকম। বলা হয়ে থাকে যে, কোরীয়, চীনা, ভিয়েতনামীয়, থাই, বর্মী, জাভা দ্বীপের ভাষা ইত্যাদির সম্মানসূচক অভিব্যক্তি খুবই জটিল। জাপানী ভাষাকেও এই দলের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে বাংলার সঙ্গে জাপানী ভাষার তফাৎ এইখানে যে, জাপানীতে সম্মানসূচকতা একটি পরিস্থিতিসাপেক্ষ ব্যাপার। পক্ষান্তরে বাংলায় তা অনেকটাই অবস্থা-নিরপেক্ষ। যেমন—বাংলায় নিজের বা অন্যের, যার গুরুজন সম্পর্কেই বলা হোক না কেন, সবক্ষেত্রে সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু জাপানীতে নিজের গুরুজন সম্পর্কে অন্যের কাছে বলতে গেলে সম্মানসূচকতার বদলে বরং বিনয়ের ভাবটাই বেশি প্রকাশ পায়। ব্যাকরণিক দিক থেকে দেখতে গেলে, জাপানীতে একটি ক্রিয়াপদের সাধারণ, সম্মানসূচক ও বিনয়সূচক—এই তিনটি রূপ থাকে। আবার বিশেষ্যের মধ্যেও সম্মানসূচকতা ও বিনয়সূচকতা থাকতে পারে। এমন অন্ত্য-প্রত্যয় ও আদ্য-প্রত্যয়ও আছে যা দিয়ে সম্মান বা বিনয় প্রকাশ করা যায়। এটি অবশ্য একটি কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার। এখানে তার বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই।

যাই হোক, এখানে শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে, জাপানী ভাষার বিনয়সূচকতার রীতি-অনুযায়ী নিজেদের নিয়ে গর্ব করা অনুচিত। এই প্রবন্ধের কোথাও যদি তেমন কোনো গর্ব প্রকাশ পেয়ে থাকে, তাহলে জাপানী ভাষারীতি-অনুযায়ী, আপনাদের কাছ থেকে সবিনয় ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিচ্ছি।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

Haruhiko Kindaichi, *Nippongo* (Tokyo, 1957).

Haruhiko Kindaichi, *Nippongo no tokushitu* (Tokyo, 1981).

Takao Suzuki, *Tozasareta gengo : Nihongo to sekai*. (Tokyo, 1975).

Osamu Mizutani, *Nihongo no seitai* (Tokyo, 1979).

Kikuo Nomoto, *Nihonjin to Nihongo* (Tokyo, 1978).

Takeshi Shibata, "Sekai no naka no Nihongo", Iwanami-Shoten (ed.) *Iwanami-koza Nihongo*. Vol. 1 : *Nihongo to kokugo-gaku* (Tokyo. 1976), pp 1-29.

Masanori Higa, "Nihongo to Nihonjin-shakai", *ibid*, pp 99-138.

Takashi Shibata, "Nihonjin no gengo-seikatsu", Iwanami-Shoten (ed.), *Iwanami-koza Nihongo*, Vol. 2 : *Gengo-Seikatsu* (Tokyo, 1977), pp 33-81.

Takeshi Sakai, "Nihongo no keitoron-shi", Iwanami-Shoten (ed.), *Iwanami-koza Nihongo*, Vol. 12: *Nihongo no keito to rekishi* (Tokyo, 1978), pp 301-46.

Chie Nakane, *Japanese Society* (London, 1970).

www.pathagar.com

গ্রন্থ-সমালোচনা

ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ : বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ২৯৭ ; মূল্য পঞ্চাশ টাকা।

কালের গ্রাসে বিস্মৃত হওয়ার আশংকা থেকে নিস্তারকল্পে বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ্দের জীবন ও কর্মকে জিইয়ে রাখার যে মহৎ উদ্দেশ্য সর্বপ্রথম অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহর সাধনায় প্রতিফলিত হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। কোন কোন লেখক উপমহাদেশীয় আরবী সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় অবতীর্ণ হলেও তাঁদের লেখায় বাংলাদেশের আরবী কবি-সাহিত্যিকদের আলোচনা খুব কমই স্থান পেয়েছে। এম. জি. যুবায়েদ আহমদ রচিত ও ১৮৬৭ সালে লাহোর থেকে প্রকাশিত *Contribution of India to Arabic Literature* শীর্ষক গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের আরবীবিদ্দের আলোচনা দেখা যায় না। মওলানা আবদুল হাই বেরিলবী লখনোবী রচিত ও ১৯৫৮ সালে দামেশ্ক থেকে প্রকাশিত 'আস-সাকাফাতুল-ইস্লামিয়াহ্-ফিল্-হিন্দ্' বইটিতে বাংলার কতক উর্দু-ফারসী লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি রয়েছে বটে, কিন্তু কোন আরবী সাহিত্যিকের আলোচনা তাতে স্থান পায় নি। মওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী তাঁর 'হাদীস তত্ত্ব ও ইতিহাস' গ্রন্থে বাংলাদেশের কতক হাদীসবেত্তা তথা আরবীবিদ্ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। হাদীস বিষয়ের উপর আলোচনা করতে গিয়েই তিনি পরোক্ষভাবে হাদীসে অভিজ্ঞ কতক আরবীবিদের জীবনচরিতও স্পর্শ করেছেন। আরবী সাহিত্য ছিল তাঁর গন্ডিবহির্ভূত। তাই অনেক হাদীসবেত্তা আরবীবিদ্ হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের আরবীচর্চার কথা তাঁর গ্রন্থে স্বভাবতই স্থান লাভ করে নি। মওলানা আবদুল হাই লখনোবী রচিত ও ১৯৭০ সালে হায়দরাবাদে প্রকাশিত 'নুযহাতুল খাওয়াতির' গ্রন্থে মওলানা আবদুল হাই চাটগামী, মওলানা আবদুল আলী চাটগামী, মওলানা আবদুল মুনইম ও মওলানা আবদুল কাদের সিলেটীর ন্যায় কয়েকজন আরবীবিদের আলোচনা স্থান পেয়েছে। তাঁর লেখায়ও বাংলাদেশের অন্যান্য আরবীবিদের আলোচনা ঠাঁই পায় নি।

তের শতকে এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠালাভের পর গড়ে ওঠে ইসলাম-চর্চা তথা আরবী-ফারসী শিক্ষাদীক্ষার সুদূরপ্রসারী ধারা। সেই কাতারে যুগে যুগে শামিল হন আরবী-ফারসীর বহু সেরা মনীষী। মুসলিম শাসনের পর ব্রিটিশ আমলেও বাংলার মুসলিম লেখকগণ ধর্ম ও সাহিত্য-চর্চা করেছেন ফারসী ও আরবী ভাষায়। ঐসব ফারসী ও আরবী লেখকের জীবন ও কর্ম লিপিবদ্ধকরণে কোন লেখক এ যাবৎ এগিয়ে আসেন নি। দীর্ঘ ৪৭ বছর (১৯১৫-১৯৬২) ধরে এদেশে নিউ স্কীম মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকর ছিল। ঐ স্কীমভুক্ত মাদ্রাসাসমূহে ব্যাপক আরবী চর্চা হয়। ফলে বেশ কিছু আধুনিক ভাবাপন্ন আরবীবিদ্ সৃষ্টি হন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের জীবন ও কর্মের পরিচয় দিতে কেউ এগিয়ে আসেন নি। তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা না থাকায় সাধারণ লোকের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল

www.pathagar.com

হয়ে থাকবে যে, এদেশে আরবী চর্চা আদৌ হয়নি। এমতাবস্থায় বিশিষ্ট গবেষক ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ১৮০১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত কালের বাংলাদেশের আরবীবিদের অজানা ও বিস্মৃতপ্রায় কার্যাবলীকে গ্রন্থাকারে সুধী-সমাজের সামনে তুলে ধরে এক মহান জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। যে কর্তব্য বর্তেছিল আরবী শিক্ষাদানরত অনেকের উপর, উর্দু ও ফারসীর অধ্যাপক হওয়া সত্ত্বেও তিনি এ কাজ একাই সম্পন্ন করলেন। এজন্য তাঁকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

তাঁর গ্রন্থে মোট ১২টি অধ্যায় আছে; তদুপরি অবতরণিকা, গ্রন্থপঞ্জি ও নির্ঘণ্টও রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে 'বঙ্গে আরবী শিক্ষার ইতিহাস' শিরোনামে গোটা বঙ্গ তথা উপ মহাদেশের আরবী শিক্ষার চমৎকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রয়েছে। গ্রন্থের পটভূমিরূপে এ অধ্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ। যুগে যুগে উপমহাদেশে কি ধরণের গ্রন্থ পাঠ্যভুক্ত ছিল, তার বিবরণও এতে রয়েছে। লেখকের এই আলোচনা তথ্যবহুল ও যুক্তিপূর্ণ।

দ্বিতীয় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, সিলেট, ফরিদপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, পাবনা, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার আরবীবিদ্দের জীবনালেখ্য ও তাঁদের কর্মকান্ড বিধৃত হয়েছে। লেখক আরবীচর্চার আলোচনা করতে গিয়ে কোন কোন আরবীবিদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডও তুলে ধরেছেন। তিনি মোহাম্মদ আকরম খাঁর আরবীচর্চার কথা বলতে গিয়ে খিলাফত আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত দৈনিক 'যামানা'র আলোচনা করেন (পৃ. ৬৪)। তিনি মুফতী দীন মোহাম্মদ খানের আলোচনায় বলেছেন: "মুসলিম ভারতের খিলাফত-নেতাদের সাথে তিনি একাত্মতা প্রকাশ করে খিলাফত আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ... দেওবন্দ মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি দেওবন্দী আলেমদের কংগ্রেসমুখী ভূমিকাকে কোন সময় সমর্থন করেন নি।" (পৃ. ৯৪)। তিনি আবুল হুফফায মুহাম্মদ ফসীহর জীবনচরিতে খিলাফত আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা-প্রসঙ্গে বলেন: "মুহাম্মদ ফসীহ ছিলেন স্বাধীনচেতা ও স্বাধীনতা-আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ। তিনি সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা ত্যাগ করে সে সময়ে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা নাখোদা মসজিদের আওতাধীন কওমী মাদ্রাসায় পড়াশোনা আরম্ভ করেন।" (পৃ. ১৪৪)। তিনি আনজব আলী 'শওক'-এর সাহিত্য-আলোচনায় বলেন: "আনজব আলী স্বাধীনচেতা ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন লোক। তিনি খিলাফত আন্দোলনে (১৯১৯-২১) সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং এজন্যে কিছুকাল কারাবরণ করেন।" (পৃ. ২২৪)। তিনি আবদুল্লাহেল বাকীর আরবীচর্চা-প্রসঙ্গে আষাদী-আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা বিশ্লেষণে বলেন: "উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে মওলানা বাকীর বিশেষ অবদান রয়েছে। তিনি খিলাফত ও আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং কংগ্রেসী নেতাদের সাথে কারাবরণ করেন"। (পৃ. ২৬১)। আবদুল্লাহেল কাফীর সম্পর্কে লেখক বলেন: "মওলানা কাফী ১৯৩০ সালে কংগ্রেস পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে একাধিকবার কারাবরণ করেন।" (পৃঃ ২৬৪)। কাফী ও বাকীর আরবীচর্চার আলোচনায় সমকালীন আহলে হাদীস আন্দোলনের কতক চিত্রও বইটিতে বিধৃত হয়েছে।

বইটিতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও সিলেট—এই চারটি জেলার আলোচনাই ২২৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত স্থান জুড়ে রেখেছে। বাকি জেলাগুলোর আলোচনা মাত্র ৩৮ পৃষ্ঠার

www.pathagar.com

মধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে। মোট ১১টি জেলায় ৬৬ জন আরবীবিদের আলোচনা স্থান পেয়েছে। আরবীবিদের সংখ্যা অনুসারে সাজালে চট্টগ্রাম ১ম (২৪ জন), ঢাকা ২য় (১৫ জন), সিলেট ৩য় (৮ জন), নোয়াখালী ৪র্থ (৭ জন), ফরিদপুর ৫ম (৪ জন), পাবনা ও দিনাজপুর ৬ষ্ঠ (২ জন), এবং বরিশাল, ময়মনসিংহ কুমিল্লা ও রংপুর ৭ম (প্রত্যেক জেলায় ১জন) স্থানে দাঁড়ায়। আরবীবিদের সংখ্যানুসারে জেলাগুলো সাজানো যেতো; তবে ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী বলে সে জেলার গুরুত্বের নিরিখে হয়তো লেখককে এরূপ করতে হয়েছে। বইটিতে চট্টগ্রাম জেলার আরবীবিদের সংখ্যাই সবচাইতে বেশি হওয়ায় স্বভাবতই মনে হয় যে, চট্টগ্রামে আরবীর চর্চা হয়েছে খুবই বেশি। বাংলার এক সময়কার কাযিউলকুয়াত চট্টগ্রামের কাজী আবদুল বারী চট্টগ্রামের বহুল আরবী-চর্চার বর্ণনা দিয়েছেন (পৃ. ১২৪)। যুগে যুগে চট্টগ্রামে ইসলাম-প্রচারক ওলিআল্লাহর আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের প্রভাবেই সেখানে আরবীচর্চা অধিক হয়ে থাকবে। বইটিতে আলোচিত মোট ৬৬ জন আরবীবিদের মধ্যে কয়েকজন প্রতিভাবান এবং পণ্ডিত ব্যক্তি রয়েছেন। আবদুল আউয়াল জৌনপুরী, উবায়দুল্লাহ উবায়দী সুহরাওয়ার্দী, মোহাম্মদ ইসহাক বর্ধমানী, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, আবদুর রহমান কাশগড়ী, আবদুল্লাহ নাদীব, শায়খ আবদুর রহিম, যফর আহমদ উসমানী, মুফতী মুহাম্মদ আসীমুল ইহসান ও বিলায়াৎ হোসেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

আলোচিত আরবীবিদ্‌দের মধ্যে মওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরীর গ্রন্থসংখ্যা সর্বাধিক (১২১ টি)। লেখকের মতে, তিনি বঙ্গদেশে ঐ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আরবী সাহিত্যিক ও কবি। তিনি অনর্গল আরবী বক্তৃতা দিতে সক্ষম ছিলেন। দক্ষ সাহিত্যিক মওলানা লুৎফুর রহমান মওলানা জৌনপুরীর প্রতিভা সম্পর্কে বলেছিলেন: "আমি জোর গলায় বলছি: খোদার কসম, তাঁর ন্যায় আরবী সাহিত্যিক ভারতে দ্বিতীয় আর নেই।" (পৃ. ১৩৫)।

উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়ার্দী একজন প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, আরবীবিদ্‌, ধর্মনেতা, দার্শনিক ও সমাজকর্মী ছিলেন। আরবী, ফারসী ও উর্দুতে তাঁর সমভাবে দক্ষতা ছিল। মুসলিম-জাগরণেও তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাঁর সম্পর্কে জানার তৃষ্ণা অনেকের ছিল। আবদুল্লাহ সাহেব তাঁর সম্পর্কে লিখে বহুলোকের বহু দিনের তৃষ্ণা মিটিয়েছেন।

মওলানা আকরম খাঁ আরবী, ফারসী ও উর্দুতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। সাংবাদিকতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আজীবন কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য চর্চা করেন। লেখক তাঁকে 'সাংবাদিকতার জনক' বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি আজীবন ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করেন। ঐসব লেখায় তিনি কুরআন, হাদীস ও বড় বড় আরবী গ্রন্থ মন্থন করে সেগুলোর বরাত দিয়েছেন বলে লেখক উল্লেখ করেছেন। তাতে আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়ে যে তাঁর গভীর জ্ঞান রয়েছে, লেখকের আলোচনায় তা ফুটে উঠেছে। লেখক তাঁকে উপমহাদেশের আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম ও মহৎ আরবীবিদ্‌রূপে চিহ্নিত করেন।

আবদুর রহমান কাশগড়ী বিশিষ্ট আলেম, আভিধানিক, ভাষাতত্ত্ববিদ, আরবী কবি ও সমাজসেবক। ১৯৩৮ সালে তিনি নাদওয়া ত্যাগ করে কলিকাতা আলিয়া

www.pathagar.com

মাদ্রাসার শিক্ষক নিযুক্ত হন। দেশবিভাগের পর তিনি ঢাকা মাদ্রাসায় যোগদান করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি এখানে হেড-মওলানা পদে উন্নীত হন। গ্রন্থ-লেখক আবদুল্লাহ তাঁর যোগ্য ছাত্র। লেখক শাগরিদরূপে তাঁর জীবনী ও কর্ম চমৎকারভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পান। তিনি তাঁকে বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও উপমহাদেশের অন্যতম বিশিষ্ট আরবী কবিরূপে আখ্যায়িত করেন (পৃ ৭২)। দামিশ্‌কের তদানীন্তন অন্যতম খ্যাতিমান সাহিত্যিক মাহমুদ খায়রুদ্দীন নাদওয়াতুল ওলামায় আগমন করলে তাঁর সংবর্ধনায় "ইলাশ-শামী" শীর্ষক কবিতায় মওলানা কাশগড়ী যে ভাবাবেগ ব্যক্ত করেন, তাতে তাঁর দেশাত্মবোধ, আযাদীলাভের সুপ্ত অভিলাষ, পাশ্চাত্ত্য শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর রাগরোষ ও মুসলিম জাহানের প্রতি মমত্ববোধ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কবির হৃদয়ে ছিল জাতির প্রতি গভীর মমত্ববোধ। তাই "মাতাম্নিহুল-গুরবাহ" নামক কবিতায় তাঁর মানবদরদী মনের পরিচয় মেলে। আলোচ্য লেখক এসব কবিতা তাঁর গ্রন্থে বিশ্লেষণ করে কাশগড়ীর কাব্যমান নির্ণয় করার চেষ্টা করেন এবং ঐ কবিতাগুলোর ভাবার্থ ব্যক্ত করেন। তাঁর ভাবানুবাদগুলো গদ্য-কবিতার রূপলাভ করেছে।

আবদুল্লাহ নাদবী বিশিষ্ট আরবী কবি ছিলেন। কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় থাকাকালে (১৯৪৫-৪৭) লেখক তাঁর ছাত্র ছিলেন বলে গ্রন্থটিতে উল্লেখ রয়েছে। ছাত্র হিসাবে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর শিক্ষকের পাণ্ডিত্যকে লেখক মর্মে-মর্মে অনুধাবন করে তাঁর জীবন ও কর্মকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পান। লেখকের মতে, কাশগড়ীর পরই আরবী সাহিত্যে তাঁর স্থান। তাঁর কাব্যের মান নির্ণয় করার জন্য গ্রন্থকার তাঁর কয়েকটি কবিতা উপস্থাপন করেন।

যফর আহমদ উসমানী এক সময়ে (১৯৪০-৪৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে হাদীস ও তাফসীরের শিক্ষক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য আরবীবিদ্ ও বিশিষ্ট কবি ছিলেন। লেখক তাঁর একটি কবিতা উল্লেখ করে এর ভাবার্থ উপস্থাপিত করেন। এখানেও তাঁর ভাবার্থগুলো গদ্য-কবিতার রূপ ধারণ করেছে। বংগানুবাদে যে লেখকের দক্ষতা রয়েছে, এতে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। যফর আহম্মদ ধর্মীয় বিষয়াদি রচনা করে থাকলেও সেগুলো সাহিত্যমানসম্পন্ন ছিল বলে লেখক মন্তব্য করেন।

গ্রন্থের আলোকে প্রতিপন্ন হয় যে, সব চাইতে বেশিসংখ্যক বই (১২১) লিখেছেন চট্টগ্রামের খ্যাতনামা আরবীবিদ্ আবদুল আউয়াল জৌনপুরী। গ্রন্থের সংখ্যার দিক থেকে কারামত আলী জৌনপুরী ও মুফতী ফয়যুল্লাহ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে উপনীত হন। আলোচিত ৬৬ জন আরবীবিদের মধ্যে কয়েকজন এমনও রয়েছেন, যাঁরা আরবীবিদ হলেও খ্যাতনামা নন। যেমন, ওয়ারিশ আলী (পৃ ৫০) ও আবদুল বারী (পৃ ১২৩)।

মরহুম মাওলানা ওবায়দুল হক (চট্টগ্রাম)-এর ভাষ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক নোয়াখালীর ইমামুদ্দীন সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন। খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ রচিত 'আন্‌ওয়ারুন্ নাইয়ারাইন্-ফী-আখ্‌বারিল্-খাইয়ারইন' শীর্ষক জীবনচরিতটি লেখক দেখেন নি বলে ঐ প্রসংগে উল্লেখ করেন। ইমামুদ্দীন মওলানা আবদুল আযীযের ছাত্র ছিলেন। মওলানা ইমামুদ্দীন আবদুল আযীযের ভাষ্যাবলম্বনে যে 'তাফসীর-ই-আযীযী' লিখেছেন, সেটাকে বিভিন্ন আলেম মহলে আবদুল আযীযের রচনা বলেই মনে করা হতো। বইটি মূলত

www.pathagar.com

মওলানা ইমামুদ্দীনেরই লেখা, যা তিনি তাঁর উস্তাদ আবদুল আযীযের নামে অভিহিত করেন। লেখক "ইমামুদ্দীন" প্রবন্ধে রহস্যটি উদ্‌ঘাটন করে আলেম সমাজের অনেকের দীর্ঘ-কালীন ভুল ধারণা দূর করেন। কুমিল্লা জেলার মওলানা তাজুল ইসলাম ছিলেন হাদীসবিদ্‌, ধর্মবেত্তা, বিশিষ্ট আরবী কবি-সাহিত্যিক ও প্রখ্যাত তার্কিক। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিতর্কে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। তিনি একবার পাঞ্জাবে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আরবী কবিতার মাধ্যমে বিতর্কে অবতীর্ণ হন বলে লেখক উল্লেখ করেন। তাঁর গ্রন্থে কবিতাগুলোর উদ্ধৃতি থাকলে বিতর্কের বিষয়বস্তু কি ছিল, সে সম্পর্কে পাঠকেরা অবহিত হতেন। পরবর্তী সংস্করণে পাঠক সমাজ ঐ উদ্ধৃতি তাঁর গ্রন্থে দেখতে পাবেন, লেখকের নিকট এটাই প্রত্যাশা।

এ গ্রন্থে আলোচিত মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর কোন কোন প্রবন্ধ মিশরে প্রকাশিত হয় বলে লেখক উল্লেখ করেন (পৃ ১৪৫)। তিনি ঐ সকল প্রবন্ধের কিছুটা উদ্ধৃতি দিতে সক্ষম হলে বইটি আরো বেশী সমৃদ্ধি লাভ করতো।

এ ছোট-খাটো ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও লেখক জাতির সামনে বাংলাদেশের গৌরবময় ঐতিহ্যের একটি অজানা দিক উদ্‌ঘাটিত করেছেন বলে তিনি আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি ও লেখককে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

মুহাম্মদ আবদুল বাকী*

*সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com